বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর পরিকল্পনা মোতাবেক রচিত
ও তৎকর্তৃক অনুমোদিত

ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

গ্রন্থকার

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েতুদ্দীন

মুহাদ্দিস

জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া, তাঁতীবাজার, ঢাকা-১১০০

ইমাম ও খতীব

বায়তুল আতীক জামে মসজিদ, পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

প্রকাশনায়

খানভী লাইব্রেরী

৫৯ চক বাজার ঢাকা-১২১১

৫০ বাংলা বাজার ঢাকা-১২১১

www.iscalibrary.com

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, উস্তাযুল আসাতিযা হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ সাহেব, মুহতামিম ও শাইখুল হাদীছ-জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ-এর

অভিমত

আমি মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদ হেমায়েতুদ্দীন রচিত "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" নামক গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়েছি। লেখকের জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। اللهم زد فزد এরূপ দুরূহ বিষয়কে সুন্দর বাংলায় ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্বের জন্য লেখককে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থখানি আশু প্রকাশের দাবী রাখে। গ্রন্থখানি (দ্বিতীয় খণ্ড) কওমী মাদ্রাসার ফযীলত বা তাখাস্সুস পর্যায়ে পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। এ গ্রন্থখানি পাঠ করা দ্বারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, উলামা ও তালাবা সর্বশ্রেণীর পাঠক অত্যন্ত উপকৃত হবেন বলে মনে করি।

তাং ১৭. ১২. ০৩

আরজ গোযার

মুহতামিম-জামিয়া শারইয়্যাহ
মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭

www.iscalibrary.com

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ-এর আমীর, মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাছান সাহেব, মুহতামিম ও শাইখুল হাদীছ-জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-এর

অভিমত

এই বিশাল পৃথিবীর অগণিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ যাতে করে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রেখে সুশৃঙ্খল আদর্শ জীবন গড়ার মাধ্যমে সৃষ্টিগত উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়, সে উদ্দেশ্যে স্থান, কাল ও পাত্র নির্বিশেষে নিখুঁত বিধি-বিধান প্রদত্ত হয়েছে। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এই বিধি-বিধানকেই ইসলাম নামে অভিহিত করা হয়েছে।

একটি পরিপূর্ণ বিধি-বিধান হিসেবে ইসলামের করণীয় বর্জনীয় বিস্তারিত বিধি-বিধানকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. আকায়েদ, ২. ইবাদাত, ৩. মুআমালাত, ৪. মুআশারাত ও ৫. আখ্‌লাক। এর মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয়টি (আকায়েদ) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আকায়েদের ভিত্তিতেই অবশিষ্ট বিষয়াদির মূল্যায়ন অবমূল্যায়ন হয়ে থাকে। আকায়েদের ঐক্য এবং অনৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম-অমুসলিম, হকপন্থী ও বাতিল পরিচয় নির্ধারিত হয়। ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ আকীদা এবং আমলের ক্ষেত্রে ঐক্যগত অবস্থানে থাকলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে তারা আকীদা ও আমলগত ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম-অমুসলিম বিভক্তিতো বটেই, স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দেয় চরম বিভক্তি- সৃষ্টি হয় বহু ধরনের দল-উপদল। তাদের পারস্পরিক যুক্তি-প্রমাণ ও তর্ক-বিতর্ক কেবল সরলপ্রাণ মুসলমানদের জন্যেই নয় অনেক জ্ঞানীগুণীর জন্যেও সঠিক পথ অনুধাবনে ব্যাঘাত ও বিচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইত্যবসরে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী সুযোগ সন্ধানী মহল স্বীয় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মুসলমান গোমরাহীতে বরং ধর্মহীনতার ছোবলে আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। হচ্ছে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত এবং চরম অপদস্ত। কিন্তু ইসলাম তার স্বীয় অস্তিত্ব নিয়ে সুদৃঢ় ভাবেই এগিয়ে চলেছে এবং চলতে থাকবে। এর মূল কারণ হল আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং ইসলামকে হেফাজতের প্রতিশ্রুতি। এই ইচ্ছা ও প্রতিশ্রুতির প্রতিফলনে ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ মনীষীগণ সর্বযুগেই তাজদীদ তথা পরিশুদ্ধি অভিযানের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত বিষয়াদিকে সুসংরক্ষণ ও সুসম্প্রসারণের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। কেবল বয়ান, বিবৃতি ও প্রতিবাদের মাধ্যমেই নয় বরং রচনা, লেখনী এবং যুক্তি-তর্ক ও অকাট্য প্রমাণাদি পেশ করার মাধ্যমেও তারা সর্বযুগে অব্যাহত অবদান রেখে আসছেন।

আমি আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ইসলামী গবেষক, আহ্‌কামে যিন্দেগীর মুসান্নেফ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েতুদ্দীন রচিত "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি ইসলামের সহীহ আকীদার বিবরণ প্রদান ও এসব আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন ফিরকা ও মতবাদ সম্পর্কে সুবিন্যস্ত ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের সুসংরক্ষণ ও সুসম্প্রসারণের সেই দায়িত্ব পালনের অব্যাহত ধারায় নিজেকে যুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় যথেষ্ট কিতাবাদি রয়েছে এমনকি খণ্ড খণ্ড ভাবে বাংলা ভাষায়ও অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রয়েছে। তবে আমার জানা মতে এ গ্রন্থখানি এ বিষয়ে ব্যাপকতম ও অন্যতম হিসেবে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমি লেখকের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করি।

১৫/৪/২০০৪

ইতি

(মাহমূদুল হাছান)

www.iscalibrary.com

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, উস্তাযুল আসাতিযা হযরত মাওলানা নূর হোছাইন কাছেমী সাহেব, মুহতামিম ও শাইখুল হাদীছ-জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা-এর

অভিমত

আমি মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েতুদ্দীন রচিত "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" শীর্ষক গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি। লেখক দুই খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যুগ চাহিদার আলোকে ইসলামের সহীহ আকায়েদ এবং আকায়েদ শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক শাস্ত্র-ইল্‌মে কালাম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন বাতিল ফির্‌কা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের শেষভাগে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন। আলোচনা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বরাত সহকারে অত্যন্ত তথ্যভিত্তিক হয়েছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ মতবাদ সহ সমাজের অতীত ও বর্তমানের বহুবিধ মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা সম্বলিত এরূপ ব্যাপক কোন গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিতে পড়েনি। গ্রন্থখানি আশু প্রকাশের দাবী রাখে। গ্রন্থখানি পাঠ করা দ্বারা উলামা, তালাবা সহ সমাজের সর্বশ্রেণীর পাঠক প্রভূত উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি।

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ বহু বৎসর যাবত এরূপ একখানি গ্রন্থ তৈরি করা ও তা নেছাবভুক্ত করার পরিকল্পনা লালন করে আসছিল। অবশেষে মাওলানা হেমায়েতুদ্দীন সাহেবকে এর রচনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। সে মোতাবেক তিনি এ গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এ গ্রন্থ পাঠ করা দ্বারা সমাজ নানান রকম ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে সজাগ হতে পেরে তাদের ঈমান-আকীদাকে সংরক্ষণ করতে পারবে এবং হক্ক ও হক্কানিয়াতের উপর অটল থাকতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

ইতিপূর্বে লেখক কর্তৃক রচিত "আহ্‌কামে যিন্দেগী", "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" এবং "বয়ান ও খুতবা" প্রভৃতি গ্রন্থ উলামা ও শিক্ষিত শ্রেণী নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা, স্বীকৃতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আশা করি এ গ্রন্থখানিও অনুরূপ মর্যাদা লাভ করবে। আমি গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

তাং ২৬. ০৩. ২০০৪ ইং

আরজ গোযার

মুহতামিম

জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা

www.iscalibrary.com

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর মহাসচিব হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জব্বার সাহেব-এর

অভিমত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم - اما بعد !

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর নেছাবভুক্ত আকাইদের কিতাব-শরহে আকাইদে নাসাফী (شرح العقائد النسفيه)-এর সঙ্গে বর্তমান যুগের ফেরাকে বাতেলার একটা অধ্যায় যোগ করার নিমিত্তে সহায়ক একখানা পুস্তক রচনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল অনেকদিন পূর্বে অর্থাৎ, ১২/০৬/৯৫ ঈঃ তারিখে। কিন্তু লেখকের অভাবে সিদ্ধান্তটি দীর্ঘদিন যাবত কার্যকর করা যাচ্ছিল না। অবশেষে নবীন ও গবেষক লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েতুদ্দীন-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং ০৮/০৬/২০০০ ঈঃ তারিখে তাঁর সঙ্গে উক্ত পুস্তক লেখার একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

এ ব্যাপারে মাওলানা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং অনেক বই কিতাব ঘাটাঘাটি করে সহায়ক গ্রন্থটির প্রণয়ন কাজ শেষ করে বেফাকুল মাদারিসে কপি জমা দেন। চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনার দায়িত্ব বোর্ডের উপর ন্যাস্ত থাকায় সম্পাদনা করার জন্য দেশের প্রখ্যাত প্রবীণ বিজ্ঞ আলেম হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ ও বিজ্ঞ আলেম মাওলানা নূর হোছাইন কাসেমীকে পাণ্ডুলিপি প্রদান করা হয়। কাজী সাহেব পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত দেখেছেন। সংশোধন ও সংযোজনের কিছু সুপারিশ করেছেন। সুফারিশের আঙ্গিকে পাণ্ডুলিপিটি পুনঃবিন্যস্ত করা হয়েছে। কাজী সাহেব গ্রন্থখানির পক্ষে উৎসাহব্যাঞ্জক বাণী দিয়েছেন এবং গ্রন্থখানিকে মাদরাসার নেছাবভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মাওলানা নূর হোছাইন কাসেমী সাহেবও পাণ্ডুলিপিটি দেখেছেন। তিনিও ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর লেখক বইটি বাজারজাত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আল্লাহ পাকের অসংখ্য শোকরিয়া যে, তিনি দীর্ঘ দিনের একটি অভাব পূরণ করার তাওফীক দান করেছেন। আর লেখককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁর দীর্ঘ হায়াত ও ক্ষুরধার লেখনীর দক্ষতা একান্ত ভাবে কামনা করছি।

আমার ধারণা মতে গ্রন্থখানি ফেরাকে বাতেলা সংক্রান্ত এক বিরাট ভাণ্ডার হিসেবে সমাজের নিকট, বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট সমাদৃত হবে। তবে শিক্ষার্থীদের জন্য বেফাক থেকে উপযোগী পরিমাণ নেছাব নির্ধারণ করে দেয়া যাবে।

তাং ২৯/০৩/০৪ ঈঃ

(মুহাম্মাদ আবদুল জব্বার)
মহাসচিব
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

www.iscalibrary.com

সূচীপত্র

১ম খণ্ড

(ইল্‌মে কালাম ও আকাইদ বিষয়ক)

প্রথম অধ্যায়

(ইল্‌মে কালাম বিষয়ক)

বিষয়বস্তু — পৃষ্ঠা নং

- ❑ ইল্‌মুল-কালাম-এর সংজ্ঞা ১৮
- ❑ নামকরণের রহস্য ১৮
- ❑ "ইল্‌মুল কালাম" পরিভাষাটির সর্ব প্রথম ব্যবহার ২০
- ❑ ইল্‌মুল কালামের আরও বিভিন্ন নাম ২০
- ❑ ইল্‌মুল কালামের বিষয়বস্তু ২০
- ❑ ইল্‌মুল কালামের উদ্দেশ্য ২০
- ❑ ইল্‌মে কালামে ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা ২১
- ❑ ইল্‌মুল কালামের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ২২
- ❑ ইল্‌মুল কালামের সমালোচনা প্রসঙ্গ ও তার নিরসন ২৩
- ❑ ইল্‌মুল কালাম ও ইলাহিয়্যাতের মধ্যে পার্থক্য ২৩
- ❑ ইল্‌মুল কালামের প্রকার ২৪
- ❑ ইল্‌মে কালামের সূচনা ২৫
- ❑ ইল্‌মে কালামের অধিক আলোচ্য বিষয়সমূহ ২৭
- * ইল্‌মে কালামের প্রসিদ্ধ দলসমূহ ২৮
 - ❑ আশাইরা ২৮
 - ❑ মাতুরীদিয়্যা ২৮
- ❑ ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী -এর জীবনী ২৯
- ❑ ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদীর জীবনী ৩১
- ❑ ইল্‌মে কালামের কিছু বিষয়ে আশআরী ও মাতুরীদীদের মধ্যকার মতবিরোধ প্রসঙ্গ ৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ঈমান ও আকাইদ বিষয়ক)

- ❑ ঈমান ও আকাইদ সংক্রান্ত কয়েকটি পরিভাষার ব্যাখ্যা ৩৭
- ❑ আকাইদের প্রকার ও স্তরগত পার্থক্য ৩৯
- ❑ যে সব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয় ৪০

www.iscalibrary.com

❑ ১. "আল্লাহ"-এর উপর ঈমান ৪১
* আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের যুক্তিগত প্রমাণ ৪১
* আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দলীল সম্পর্কে মনীষীদের কয়েকটি উক্তি ৪২
* আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দলীল সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কয়েকটি উক্তি ৪৩
* আল্লাহ্‌র যাত বা সত্তার প্রতি ঈমান/বিশ্বাস রাখার পর্যায়ে কয়েকটি মৌলিক বা বুনিয়াদী বিষয় ৪৮
* আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণ প্রকাশক নাম এবং তৎসঞ্জাত ও তৎসংশ্লিষ্ট আকীদা সমুহ ৪৯
* আল্লাহ্‌র সিফাত সম্পর্কে আরও বিশেষ কিছু আকীদা ৭০
* মুজাস্‌সিমা, মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা ফিরকা প্রসঙ্গ ৭১
❑ ২. ফেরেশতা সম্বন্ধে ঈমান ৭৩
❑ ৩. নবী ও রাসূল সম্বন্ধে ঈমান ৭৬
* সাধারণভাবে সব নবী ও রাসূলদের প্রতি যা ঈমান রাখতে হবে ৭৭
* মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য ৮১
* মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য ৮৩
* আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে আরও বিশেষ যেসব আকীদা রাখতে হবে তা হল ৮৩
❑ রাসূল (সাঃ) সত্য নবী ছিলেন তার প্রমাণ ৮৫
* বাইবেল (ইঞ্জীল) থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি ৮৮
* তাওরাত থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি ৯০
* অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে রাসূল (সাঃ) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ৯৪
* হিন্দুদের ধর্মীয়গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ, পুরাণে ৯৪
* বৌদ্ধ শাস্ত্রে ৯৭
* পার্শী ধর্মশাস্ত্রে ৯৭
❑ ৪, আল্লাহ্‌র কিতাব সম্বন্ধে ঈমান ৯৮
* তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূরের ভূত বর্তমান অবস্থা ৯৯
* বাইবেল ঃ ৯৯
* তাওরাত (تورات) ১০০
* যাবূর (زبور) ১০৬
* ইঞ্জীল (انجيل) ১০৭
* কুরআন সত্য তার প্রমাণ ১১২
❑ ৫. আখেরাত সম্বন্ধে ঈমান ১১৫
* প্রসঙ্গ পুনর্জন্মবাদ ১১৫
(এক) কবরের সওয়াল জওয়াব সত্য ১১৭

www.iscalibrary.com

(দুই) কবরের আযাব সত্য ১১৮
(তিন) পুনরুত্থান ও হাশর ময়দানের অনুষ্ঠান সত্য ১১৯
* পুনরুত্থান শারীরিক, না শারীরিক-আত্মিক উভয়ভাবে? ১২০
* পুনরুত্থান কোন্ দেহের উপর হবে? ১২১
(চার) আল্লাহর বিচার ও হিসাব নিকাশ সত্য ১২১
(পাঁচ) কিয়ামতের দিন আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে সওয়াল করা সত্য ১২২
(ছয়) নেকী ও বদীর ওজন সত্য ১২২
(সাত) শাফায়াত সত্য ১২৩
(আট) আমল নামার প্রাপ্তি সত্য ১২৫
(নয়) হাউযে কাউছার সত্য ১২৫
(দশ) পুলসিরাত সত্য ১২৬
(এগার) আ'রাফ সত্য ১২৭
(বার) জান্নাত বা বেহেশ্‌ত সত্য ১২৭
(তের) জাহান্নাম বা দোযখ সত্য ১২৯
❑ **তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান** ১৩০
❑ মুসলমানদের আরও কতিপয় আকীদা ১৩৪
❑ মে'রাজ সম্বন্ধে আকীদা ১৩৪
* আল্লাহ্‌র দীদার সম্বন্ধে আকীদা ১৩৬
❑ মেরাজে নবী (সাঃ)-এর দীদার ১৩৬
❑ পরকালে আল্লাহ্‌র দীদার ১৩৭
❑ আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা ১৩৮
❑ সাহাবীদের সম্বন্ধে আকীদা ১৩৯
❑ রাসূল (সাঃ)-এর বিবি ও আওলাদগণের সম্বন্ধে আকীদা ১৪২
❑ কিয়ামতের আলামত সম্বন্ধে আকীদা ১৪২
❑ হযরত মাহ্‌দী সম্বন্ধে আকীদা ১৪৪
❑ মিথ্যা মাহ্‌দী দাবীদারদের প্রসঙ্গ ১৪৬
❑ হযরত ঈসা (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে আকীদা ১৪৭
❑ ইয়াজূজ মাজূজ সম্বন্ধে আকীদা ১৪৮
❑ আকাশের এক ধরনের ধোঁয়া সম্বন্ধে আকীদা ১৪৯
❑ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের আকীদা ১৪৯
❑ দাব্বাতুল আর্‌দ সম্বন্ধে আকীদা ১৫০
❑ এক ধরনের আগুনের বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে আকীদা ১৫১
❑ ঈছালে ছওয়াব সম্বন্ধে আকীদা ১৫২
❑ দুআর মধ্যে ওছীলা প্রসঙ্গে আকীদা ১৫৩
❑ জিন সম্বন্ধে আকীদা ১৫৩
❑ কারামত, কাশ্‌ফ, এল্‌হাম ও পীর বুযুর্গ সম্বন্ধে আকীদা ১৫৩

www.iscalibrary.com

- ❑ স্থান/বস্তুর বরকতময় হওয়া প্রসঙ্গে আকীদা ১৫৬
- ❑ কারামত ও ইস্‌তিদ্‌রাজ-এর মধ্যে পার্থক্য ১৫৬
- ❑ আবদাল, গাউছ, কুতুব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা ১৫৬
- ❑ মাজার সম্বন্ধে আকীদা ১৫৭
- ❑ মাজার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সমূহ ১৫৭
- ❑ আস্‌বাব/বস্তুর ক্ষমতা ও প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা ১৫৮
- ❑ রোগ সংক্রমণ সম্বন্ধে আকীদা ১৫৯
- ❑ রোগ সংক্রমণ প্রসঙ্গ এবং এতদসম্পর্কিত হাদীছসমূহের মধ্যকার تعارض (বিরোধ) ও তার حل (সমাধান) ১৬০
- ❑ রাশি ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা ১৬২
- ❑ জ্যোতিঃশাস্ত্র ও ইসলাম ১৬২
- ❑ হস্ত রেখা বিচার সম্বন্ধে আকীদা ১৭১
- ❑ গণক সম্বন্ধে আকীদা ১৭২
- ❑ রত্ন ও পাথরের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা ১৭২
- ❑ তাবীজ ও ঝাড় ফুঁক সম্বন্ধে আকীদা ১৭২
- ❑ নযর ও বাতাস লাগা সম্বন্ধে আকীদা ১৭৪
- ❑ কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ সম্বন্ধে আকীদা ১৭৫
- ❑ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সম্বন্ধে আকীদা ১৭৫
- ❑ দ্বীনের চার বুনিয়াদ সম্বন্ধে আকীদা ১৭৬
- ❑ তাক্‌লীদ ও চার মাযহাব সম্বন্ধে আকীদা ১৭৮
- ❑ ইবাদত ও শরী'আতের বিভিন্ন প্রকার আহকাম সম্বন্ধে আকীদা ১৭৯
- ❑ কিছু আধুনিক ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে আকীদা ১৮০
- ❑ কতিপয় মাসায়েল সম্বন্ধে আকীদা ১৮২
- ❑ ঈমান সম্পর্কিত কয়েকটি আকীদা ১৮৪
- ❑ বিদ'আত সম্বন্ধে আকীদা ১৮৬
- ❑ কতিপয় বিদ'আত ১৮৭
- ❑ কতিপয় রসম বা কুসংস্কার ও কুপ্রথা ১৮৮
- ❑ গোনাহ সম্পর্কে আকীদা ১৮৮
- ❑ কতিপয় শির্‌ক ১৮৯

২য় খণ্ড

(বাতিল ফির্‌কা ও ভ্রান্ত মতবাদ বিষয়ক)

প্রথম অধ্যায়

(হক ও বাতিল সংক্রান্ত কিছু বিষয়)

- ❑ কয়েকটি পরিভাষার পরিচয় ১৯৩
- ❑ হকপন্থীদের পরিচয় ১৯৫

www.iscalibrary.com

❑ কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ উভয়টা সু সমন্বয় জরূরী-এ প্রসঙ্গ ১৯৬
❑ হকপন্থীদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ১৯৭
❑ যেসব বিষয় হক্কানী বা কামেল হওয়ার দলীল নয় ২০৮
❑ কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা-এর নীতি ২১০
❑ যেসব কারণে কেউ কাফের হয়ে যায় ২১২

দ্বিতীয় অধ্যায়
(এ'তেকাদী ফিরকা বিষয়ক)

* প্রাচীন এ'তেকাদী ফিরকা সমূহ ঃ
❑ খাওয়ারেজ ২১৫
❑ শী'আ মতবাদ ২২৫
* ইছনা আশারিয়া ২২৮
* ইসমাঈলিয়া শী'আ ২৬৪
* যায়দিয়া শী'আ ২৬৫
❑ জাব্‌রিয়া ২৬৫
❑ কাদরিয়া সম্প্রদায় ২৬৭
❑ মু'তাযিলা ২৭৬
❑ মুর্‌জিয়া ২৮২
❑ জাহ্‌মিয়্যাহ ২৮৫
❑ কাররামিয়্যাহ ২৮৭
* আধুনিক এ'তেকাদী ফিরকাসমূহ ঃ
❑ বাহায়ী ২৯০
❑ কাদিয়ানী মতবাদ ২৯৭
* কাদিয়ানীদের লাহোরী গ্রুপ সমাচার ৩১২
❑ খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গ ৩১৭
❑ চুন বিশ্ব ইশ্বর ও তার দ্বীনদার আঞ্জুমান ৩২৩
❑ দ্বীনে ইলাহী ৩২৯
❑ আগাখানী ৩৩৪
❑ খাকছার পার্টি ৩৩৫
❑ মুনকিরীনে হাদীছ তথা হাদীছ অস্বীকারকারীদের ফিৎনা ৩৩৬
* হাদীছ অস্বীকারকারীদের চারটি মতবাদ ঃ
❑ পারভেজী মতবাদ ৩৪৭
❑ চকড়ালবী ফিরকা ৩৫৭
❑ মওদূদী মতবাদ ৩৬১
❑ সাহাবায়ে কেরামের আদালত ও সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ ৩৯৪
❑ সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা প্রসঙ্গ ৩৯৯

www.iscalibrary.com

- ❑ সাহাবায়ে কেরামের পরস্পর দ্বন্দ্ব-লড়াই ও তার জবাব ৪০১
- ❑ সাহাবায়ে কেরামের মি'য়ারে হক তথা সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ ৪০২
- ❑ ইস্‌মতে আম্বিয়া প্রসঙ্গ ৪০৪

❑ মাহ্‌দবিয়া সম্প্রদায় ৪০৪
❑ জৌনপুরীর দাবী ও বক্তব্য খন্ডন ৪১১
❑ যিক্‌রী সম্প্রদায় ৪১৩
❑ আহ্‌লে হাদীছ বা গায়রে মুকাল্লিদীন ৪১৬
- ❑ তাক্‌লীদ প্রসঙ্গ ৪১৯

❑ ওয়াহহাবী বা সালাফীগণ ৪৩১
- * দুআর মধ্যে ওসীলা প্রসঙ্গ ৪৩১
- * ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ-কবচ প্রসঙ্গ ৪৩৮
- * বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী-আল্লাহ্‌দের নিদর্শন থেকে বরকত লাভ প্রসঙ্গ ৪৪৩
- * রওযায়ে আতহার যিয়ারতে যাওয়ার নিয়ত প্রসঙ্গ ৪৪৮

❑ ন্যাচারিয়া দল (স্যার সৈয়দ আহমদ ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ) ৪৫০

তৃতীয় অধ্যায়

(দেশীয় বাতিল ফিরকাসমূহ)

❑ সুরেশ্বরী ৪৬১
❑ এনায়েতপুরী ৪৭০
❑ আটরশী ৪৭৫
❑ চন্দ্রপুরী ৪৮০
❑ দেওয়ানবাগী ৪৮৩
❑ রাজারবাগী ৪৯১
❑ মাইজভাণ্ডারী ৪৯৯
❑ রেজবী বা রেজাখানী ৫০৬
❑ বে শরা পীর-ফকীর ৫১৪
❑ বাউল সম্প্রদায় ৫১৯
❑ সর্বেশ্বরবাদ/সর্বখোদাবাদ ৫২৫
❑ এন, জি, ও ৫২৯

চতুর্থ অধ্যায়

(আধ্যাত্মিক মতবাদ ও বিদ'আত সংক্রান্ত বিষয়ক)

❑ বিদ'আত প্রসঙ্গ ৫৩৪
❑ তাসাওউফ বা সুফিবাদ সম্পর্কে ইফরাত/তাফরীত ৫৪৭
❑ ইল্‌হাম, কাশ্‌ফ্‌ ও কারামত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ৫৫০
❑ ওলী, আবদাল, গাউছ, কুতুব ইত্যাদি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ৫৫০
❑ মাযার, কবর যিয়ারত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ৫৫০

www.iscalibrary.com

❑ গান-বাদ্য প্রসঙ্গ ৫৫০
❑ সামা' (ﺳﻤﺎﻉ) প্রসঙ্গ ৫৫৮
❑ মীলাদ মাহফিল প্রসঙ্গ ৫৬১
❑ মীলাদে কেয়াম করা প্রসঙ্গ ৫৬৭
❑ নবী কারীম (সাঃ)-এর গায়েব জানা প্রসঙ্গ ৫৬৯
❑ নবী (সাঃ)-এর হাজির-নাজির হওয়া প্রসঙ্গ ৫৭৬
❑ নবী কারীম (সাঃ)-এর নূর ও বাশার হওয়া প্রসঙ্গ ৫৭৯
❑ নূর ও বাশার প্রসঙ্গে দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে
রেজাখানীদের একটি মিথ্যা অভিযোগ ও তার খণ্ডন ৫৮৫
❑ ওরশ প্রসঙ্গ ৫৮৬
❑ কবরে বাতি জ্বালানো প্রসঙ্গে ৫৯০

পঞ্চম অধ্যায়

(রাজনৈতিক মতবাদ বিষয়ক)

* প্রাচীন রাজনৈতিক মতবাদ সমূহ ঃ
❑ রাজতন্ত্র ৫৯৪
❑ নাৎসীবাদ ৫৯৬
❑ সাম্রাজ্যবাদ ৫৯৮
* আধুনিক রাজনৈতিক মতবাদ সমূহ ঃ
❑ গণতন্ত্র ৫৯৯
❑ ইসলামী গণতন্ত্র ৬০১
❑ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ৬০১
❑ জাতীয়তাবাদ ৬০৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

(অর্থ নৈতিক মতবাদ বিষয়ক)

* প্রাচীন অর্থনৈতিক মতবাদ সমূহ ঃ
❑ সামন্ততন্ত্র ও জায়গীরদারী প্রথা ৬০৭
* আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ সমূহ ঃ
❑ পুঁজিবাদ ৬০৯
❑ সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ ৬১১

সপ্তম অধ্যায়

(দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ বিষয়ক)

❑ গ্রীক দর্শন ৬২৩
❑ বিবর্তনবাদ ৬৩১
❑ হার্বার্ট স্পেন্সারের জড়জগৎ সম্পর্কিত যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ ৬৩২

www.iscalibrary.com

❑ ডারউইনের প্রাণী জগত সম্পর্কিত বিবর্তনবাদ ৬৩৩
❑ ফ্রয়েড ইজম/ যৌনবাদ ৬৩৭

অষ্টম অধ্যায়
(ভ্রান্ত ধর্ম ও তার গ্রন্থ সমূহ)

❑ ইয়াহুদী ধর্ম ৬৪৭
❑ ইয়াহুদীদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত ৬৫০
❑ খৃষ্টীয় ধর্ম ৬৫০
❑ খৃষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ ইঞ্জীল ৬৫৫
❑ বৌদ্ধধর্ম ৬৫৫
* যেন্ বৌদ্ধধর্ম ৬৬৪
❑ বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটক ৬৬৪
❑ জৈনধর্ম ৬৬৫
❑ শিখধর্ম ৬৬৬
❑ হিন্দু ধর্ম ৬৬৭
❑ হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ ৬৭৩
* উপজাতিদের ধর্মকর্ম ও রীতি-নীতি
❑ চাকমা উপজাতি ৬৭৮
❑ মারমা উপজাতি ৬৭৯
❑ ত্রিপুরা উপজাতি ৬৮০
❑ তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি ৬৮০
❑ ম্রো উপজাতি ৬৮০
❑ বম উপজাতি ৬৮১
❑ লুসেই ও পাংখুয়া উপজাতি ৬৮১
❑ খ্যাং উপজাতি ৬৮২
❑ খুমি উপজাতি ৬৮২
❑ চাক উপজাতি ৬৮২
❑ গারো উপজাতি ৬৮৩
❑ খাসি উপজাতি ৬৮৪
❑ হাজং উপজাতি ৬৮৪
❑ রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মণ্যবাদ ৬৮৪
❑ রামকৃষ্ণ পরমহংশের সার্বজনীন ধর্ম ৬৮৭

◀ সূচী সমাপ্ত ▶

www.iscalibrary.com

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামে আকীদা-বিশ্বাস সহীহ করা ও সহীহ রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। যাদের আকীদা-বিশ্বাস সহীহ, তাঁরাই হকপন্থী। পক্ষান্তরে যাদের আকীদা-বিশ্বাস সহীহ নয়, তারা বাতিল বা ভ্রান্ত সম্প্রদায়। আর যারা হকপন্থী, তাঁরা জান্নাতী। পক্ষান্তরে যারা হকপন্থী নয়, তারা জাহান্নামী। রাসূল (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছে হক্কপন্থী ও বাতিলপন্থীদের সম্পর্কে এরূপ তথ্য প্রদান করে বলা হয়েছে ঃ

تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة او اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة وفى رواية كلهم فى النار الا واحدة - قالوا من هى يا رسول الله ؟ قال ما انا عليه واصحابى -

(رواه الترمذى)

অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা একাত্তর/বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। এমনিভাবে নাসারাগণও। আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একদল ব্যতীত আর সকলে জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন (জাহান্নামে না যাওয়া অর্থাৎ, জান্নাতী) সেই দলটি কারা ? রাসূল (সাঃ) জওয়াবে বললেন ঃ তারা হল ঐ দল, যারা আমার ও আমার সাহাবীদের মত ও পথের অনুসারী।

এ হাদীছে হক্কপন্থী তথা মুক্তিপ্রাপ্ত ও জান্নাতী দলের পরিচয়ে বলা হয়েছেঃ ما انا عليه واصحابى অর্থাৎ, "যারা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীদের মত ও পথে থাকবে"। পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় "আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত"। এই "আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত" বহির্ভূত যাবতীয় দল হল বাতিল সম্প্রদায়ভুক্ত।

সূতরাং হকপন্থী ও জান্নাতী দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ও থাকার জন্য যেমন ইসলামের সহীহ আকীদা-বিশ্বাস তথা "আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত"-এর আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবগতি লাভ করা ও তার অনুসারী হওয়া প্রয়োজন, তদ্রূপ বাতিল সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবগতি লাভ পূর্বক তা থেকে বিরত থাকাও প্রয়োজনীয়।

এই প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই "সহীহ আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" নামক বক্ষমান গ্রন্থ রচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে কুরআন-হাদীছের দলীল-প্রমাণ সহ "আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত"-এর সহীহ আকীদা-বিশ্বাস বর্ণনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বাতিল সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাস এবং বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ভ্রান্ত মতবাদের চিন্তাধারাগুলি তুলে ধরে কুরআন-হাদীছের আলোকে সেগুলোর খণ্ডনও পেশ করা হয়েছে।

অত্র গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু কথা

"ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" নামক বক্ষমান গ্রন্থখানা দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে আকাইদ ও তার আনুষঙ্গিক শাস্ত্র-ইল্‌মে কালাম সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বাতিল ফিরকা বা ভ্রান্ত দল ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

www.iscalibrary.com

এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ

১. ইসলামের যাবতীয় সহীহ আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।
২. আধুনিক যুগে সৃষ্ট যে সব বিষয়ের আকীদা সম্বন্ধে প্রাচীন আকাইদের কিতাবে বিবরণ পাওয়া যায় না, অত্র গ্রন্থে সে সব বিষয়ের আকীদার বিবরণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
৩. আকাইদ বিষয়ক আলোচনা ইলমে কালামের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় ইলমে কালাম সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে।
৪. দেশী-বিদেশী ও নতুন-পুরাতন সব ধরণের প্রসিদ্ধ বাতিল ফিরকার আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা পূর্বক কুরআন-হাদীসের আলোকে তার খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।
৫. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক সব ধরণের বাতিল মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
৬. দেশীয় বিভিন্ন বাতিল এবং ভণ্ড পীরের ভ্রান্ত মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।
৭. ইয়াহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, শিখ, প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও তার ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে পর্যালোচনা ও তুলনামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের বর্ণনাভঙ্গি নিম্নরূপ ঃ

১. বর্ণনাভঙ্গি ভাষার সমাহার ও সাহিত্যের চাণক্য হতে মুক্ত সহজ এবং সাবলীল রাখা হয়েছে। যাতে পাঠকদের মেধা ভাষা ও সাহিত্যের বেড়াজালে পড়ে মূল তথ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে না পড়ে।
২. গ্রন্থখানা ছাত্র ও সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেরই উপযোগী করে তোলার স্বার্থে ক্লাসিক্যাল বর্ণনার ধাচও কিছুটা রক্ষা করা হয়েছে। এ জন্য আলোচনাকে রাখা হয়েছে আবেগমুক্ত ও বর্ণনামূলক।
৩. গ্রন্থের কলেবর যেন খুব বেশী বৃদ্ধি না পায় সে জন্য ১ম খণ্ডে বর্ণিত কোন আকীদার বিষয়ে কোন বাতিল ফিরকার ভিন্ন মত থাকলে প্রায়শঃই তা উল্লেখ করা হয়নি। ২য় খণ্ডে সংশ্লিষ্ট বাতিল ফিরকার আলোচনা প্রসঙ্গে তা বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে ১ম খণ্ডে ইবারতে বা টীকায় সেদিকে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানা দেশের বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলিম ও মুহাদ্দিসকে দেখিয়ে যাচাই-বাছাই করানো হয়েছে এবং তাঁদের মাশওয়ারা মোতাবেক বহু স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনা হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ সাহেব, হযরত মাওলানা নূর হোছাইন কাছেমী সাহেব, হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব ও হযরত মাওলানা আবূ সাবের আবদুল্লাহ সাহেব। বন্ধুবর মাওলানা আবূ সাবের গভীর মনোযোগ সহকারে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ পূর্বক বহুস্থানে আমাকে খুটিনাটি অনেক সংশোধনী আনার পরামর্শ দিয়েছেন এবং সেমতে তা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও যদি কোন মুহাক্কিক আলিমের দৃষ্টিতে কোন বিষয়ে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে আমাদেরকে তা অবহিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনী পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে প্রকাশক প্রফেসর মোঃ নূরুল হক মিয়া, মালিক থানভী লাইব্রেরী এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রায়াসকে কবুল করুন এবং এ গ্রন্থখানিকে আমাদের সকলের সঠিক পথ প্রাপ্তির ও নাজাতের ওছীলা করুন। আমীন!

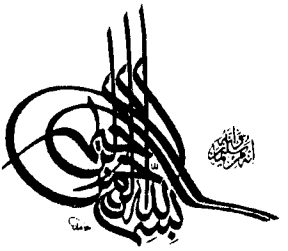
বিনীত

মুহাম্মদ হেমায়েতুদ্দীন

www.iscalibrary.com

১ম খণ্ড

(ইল্‌মে কালাম ও আকাইদ বিষয়ক)



الحمد لله الذى هدانا الى صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، واوضح لنا سبل الضالين والمضلين، والصلاة والسلام على رسوله الذى تركنا على الملة البيضاء وبشر متبعيها بان يكونوا منصورين، وهم الذين لايخافون فى الله لومة لائمين ، وعلى اله واصحابه المتمسكين بسنة النبى الامين، وهم المعروفون بكونهم معيار الحق والدين ـ اما بعد !

প্রথম অধ্যায়

(ইল্‌মে কালাম বিষয়ক)

"ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" গ্রন্থখানি আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস ও এসব আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা পর্যালোচনার জন্য রচিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে আকীদা-বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ঈমান-আকাইদ বিষয়ক আলোচনা মূলতঃ ইল্‌মে কালামের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ঈমান ও আকাইদ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে ইল্‌মে কালাম ও তার আনুসঙ্গিক বিষয়াদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক। সেমতে প্রথম অধ্যায়ে ইল্‌মে কালাম ও তার আনুসঙ্গিক বিষয়াদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

www.iscalibrary.com

ইল্‌মুল-কালাম-এর সংজ্ঞা (تعريف علم الكلام) ঃ

* ইল্‌মুল কালাম ঐ বিদ্যাকে বলে, যার দ্বারা দ্বীনের 'আকীদাসমূহকে যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিতকরণ এবং 'আকীদা সংক্রান্ত বিরোধী মতবাদের প্রতিবাদ ও খণ্ডন করা যায়।[১]

* আল-ফারাবীর বর্ণনা মতে ইল্‌মুল কালাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐ শাখাকে বলে, যা মানুষের মধ্যে শরী'আতে বর্ণিত আকীদাসমূহকে সত্য বলে প্রমাণ করা এবং তার বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারার মত যোগ্যতা প্রদান করে।[২]

* আবদুন্নবী এর সংজ্ঞায় বলেছেন, ইল্‌মে কালাম এমন এক ইল্‌ম, যাতে মাবদা (مبدأ/প্রারম্ভ) ও মাআদ (معاد/প্রত্যাবর্তন) সম্পর্কে ইসলামী বিধানের আলোকে আলোচনা করা হয়।[৩]

* শরহে-আকাইদ গ্রন্থে বর্ণিত আল্লামা তাফ্‌তাযানীর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় ইল্‌মে-কালাম এমন এক ইল্‌ম, যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা আকাইদ-এর পরিচয় প্রদান করে থাকে। তিনি বলেন আহকামে শরইয়্যা দুই প্রকার ঃ

১. যার সম্পর্ক আমলের সাথে। এটাকে ফরইয়্যা (فرعية) এবং আমালিয়্যা (عملية) বলা হয় এবং এ সংক্রান্ত ইল্‌মকে ইল্‌মুশ-শারাইয়ে ওয়াল-আহকাম (علم الشرائع والاحكام) বলা হয়।

২. যার সম্পর্ক আকাইদের সাথে, এটাকে ইল্‌মুত-তাওহীদ ওয়াস্‌সিফাত (علم التوحيد والصفات) বলা হয়। অতঃপর বিস্তারিত দলীল প্রমাণসহ প্রথমোক্ত ইল্‌মের আলোচনা যাতে আছে, তাকে বলা হয় ফিক্‌হ এবং বিস্তারিত দলীল প্রমাণসহ আকাইদ-এর আলোচনা যাতে আছে, তাকে বলা হয় ইল্‌মে কালাম।

এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যে, ইল্‌মে কালাম এ'তেকাদ সম্পর্কিত বিষয়সমূহের সংরক্ষণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, অন্যদিকে ইল্‌মে ফিক্‌হ আ'মল সংক্রান্ত বিষয়সমূহ এবং বাহ্যিক আহকামের জন্য রচিত হয়েছে।[৪]

নামকরণের রহস্য ঃ (وجه التسمية)

ইল্‌মুল-কালামকে "কালাম" নামকরণের অনেক কারণ বা রহস্য বর্ণনা করা হয়। যথাঃ

১. আল্লামা শাহরাসতানী লিখেছেন, এই ইল্‌মকে 'কালাম' বলার উদ্দেশ্য হয়তো এটা ছিল যে, আকীদার বিষয়সমূহের মধ্যে যে বিষয়ের উপর অধিক আলোচনা ও বাক-বিতন্ডা হতে থাকে তা ছিল আল্লাহ্‌র কালাম। অথবা

২. এ কারণে যে, এই ইল্‌ম দর্শনের মুকাবিলায় সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং দর্শনের একটি শাখা মানতিক (منطق/যুক্তিবিদ্যা)-এর যে নাম ছিল, এটারও সেই নাম রাখা হয়েছে

১. المواقف ॥ ২. احصاء العلوم ॥ ৩. دستور العلماء ॥ ৪. دستور العلماء ، عبد النبى ॥

www.iscalibrary.com

(মান্‌তিক ও কালাম হল সমার্থক শব্দ)।[১] এ ছাড়াও উলামায়ে কেরাম "কালাম" নামকরণের আরও বহুবিধ রহস্য বর্ণনা করেছেন।[২]

১. الملل والنحل صـ১৮/ ॥

২. যেমন ঃ

১. ইব্‌নে খাল্লিকান মুহাম্মাদ আল-হুসাইন মু'তাযিলীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু সর্বপ্রথম আকাইদ সম্পর্কিত মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল আল্লাহ্‌র কালামকে নিয়ে, সেহেতু ইল্‌মে আকাইদের নাম " আল-কালাম" হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

২. অন্য এক মতে এই ইল্‌ম শরী'আত সম্পর্কে কালাম বা আলোচনা করার ক্ষমতা প্রদান করে থাকে বলে এটাকে ইল্‌মে কালাম বলা হয়। কালাম শব্দের অর্থ হল কথা বলা। অথবা

৩. এ নামকরণের রহস্য হল- প্রথম প্রথম এই ইল্‌মের রচনাবলীতে অধ্যায় সমূহের শিরোনাম "আল-কালাম ফী কাযা ওয়া কাযা"(الكلام فى كذا وكذا) লিখিত হত বলে পরবর্তীকালে গোটা ইল্‌মকে ইল্‌মুল-কালাম নামে অভিহিত করা হয়। (كشاف اصطلاحات الفنون)

৪. ইব্‌নে খাল্‌দূনের মতে এই ইল্‌মের নাম ইল্‌মুল-কালাম এ কারণে রাখা হয়েছে যে, এতে বিদআত-পন্থীদের সাথে আকাইদ বিষয়ে মুনাজারা (তর্ক-বিতর্ক) স্থান পেয়েছে। এখানে কালাম কথাটি মুনাজারা বা তর্ক-বিতর্ক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্‌ এ নামকরণের রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ইল্‌মে কালামের ভিত্তি হল যুক্তি নির্ভর প্রমাণ। ফলে মুতাকাল্লিম (বক্তা)-এর কথা বলার সময় এটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তাঁর বক্তব্যে তার প্রকাশ ঘটে। বক্তব্যের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ হতে দলীল পেশ করার সুযোগ তেমন মিলে না, বরং যুক্তিনির্ভর প্রমাণাদির মাধ্যমে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলি ইল্‌মুল-কালামে বর্ণিত হয় বলে মানতিক বা যুক্তি বিদ্যা (علم المنطق/علم النطق)-এর সাথে এর সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং এখানে মানতিক-এর পরিবর্তে কালাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকে। (رسالة التوحيد)

৬. উপরোক্ত কারণসমূহ ছাড়া শরহে আকাইদ গ্রন্থে আল্লামা তাফ্‌তাযানী বর্ণিত কারণসমূহের মধ্যে আরও রয়েছেঃ এই ইল্‌মকে কালাম বলার কারণ হল কালাম বা কথার মাধ্যমে যে ইল্‌ম প্রথমেই শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণ করা ওয়াজিব তা হল ইল্‌মে কালাম।

৭. এই ইল্‌মের দলীল সমূহ শক্তিশালী হওয়ার কারণে এই ইল্‌মই যেন কালাম বা কথা, অন্যটা যেন কালাম বা কথাই নয়। যেমন দুটো কথার মধ্যে দলীল প্রমাণে অধিক শক্তিশালী কথা সম্বন্ধে বলা হয় কালাম বা কথাতো এটাই।

৮. এই ইল্‌ম কুরআন হাদীছের দলীলাদি সমর্থিত নিশ্চিত দলীল সমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় মনের উপর এর প্রভাব বেশী হয় বলে এর নামকরণ করা হয়েছে ইল্‌মে কালাম। কারণ "কালাম/كلام" শব্দে প্রভাব থাকার ভাবার্থ রয়েছে। কালাম শব্দের মূল অর্থ হল জখম বা আহত করা। (شرح العقائدالنسفيه) ॥

www.iscalibrary.com

"ইল্‌মুল-কালাম" পরিভাষাটির সর্বপ্রথম ব্যবহার ঃ

আহমাদ আমীন[১]-এর মতে এ নাম সর্বপ্রথম আব্বাসী যুগে, সম্ভবতঃ আল-মামূনের শাসনামলে প্রবর্তিত হয় এবং এ নাম মু'তাযিলীদের সৃষ্ট। এর পূর্বে এ'তেকাদ সংক্রান্ত বিষয় সমূহের কানূনের জন্য আল-ফিক্‌হ ফিদ্‌দীন (الفقه فى الدين) শব্দ ব্যবহার করা হত। যেমন কানূনের জন্য "আল-ফিক্‌হ ফিল-ইল্‌ম" (الفقه فى العلم) প্রচলিত ছিল। আল্লামা শাহরাস্তানী[২] এ বর্ণনার সমর্থন করেছেন। শিবলী নূ'মানী লিখেছেন ঃ "অবশ্য তখন পর্যন্ত (আব্বাসী খলীফা মাহ্‌দীর যুগে) এটা ইল্‌মুল কালাম নামে অভিহিত হয়নি। মামূনুর রশীদের যুগে যখন মু'তাযিলীগণ দর্শনে দক্ষতা লাভ করেন এবং দার্শনিক মনোবৃত্তি নিয়ে এই শাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা করেন, তখন তারা এটার নাম ইল্‌মুল-কালাম রাখেন"[৩]

ইল্‌মুল-কালামের আরও বিভিন্ন নাম ঃ

১. ইল্‌মু উসূলিদ্‌দ্বীন (علم اصول الدين) ।
২. 'ইল্‌মুন-নাজ্‌র ওয়াল-ইস্‌তিদ্‌লাল (علم النظر والاستدلال)।
৩. ইল্‌মুত্‌-তাওহীদ ওয়াস্‌-সিফাত (علم التوحيد والصفات)।

ইল্‌মুল-কালামের বিষয়বস্তু (موضوع علم الكلام) ঃ

* কাজী আরমাবী (ارموى) বলেনঃ ইল্‌মুল-কালামের বিষয়বস্তু হল আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা (ذات), তাঁর যাত সংক্রান্ত বিষয়সমূহ অর্থাৎ, তাঁর গুণাবলী (صفات) এবং তাঁর কার্যাবলী (افعال) যার সম্পর্ক এই জগতের সাথে হোক (যেমন পুনরুত্থান ইত্যাদি), বা ইহকাল ও পরকালে তাঁর আহ্‌কামের সাথে (যেমন রাসূল প্রেরণ এবং পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি)।

* ইল্‌মুল-কালামের বিষয়বস্তুর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, দ্বীনী আকীদা সমূহের প্রমাণ এর সাথে সম্পৃক্ত।[৪]

* এও বলা হয়েছে যে, ইল্‌মে কালামের বিষয়বস্তু হল الموجود من حيث هو موجود - (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বিদ্যমানতা)। দস্‌তূরুল-'উলামা' গ্রন্থের বর্ণনা মতে সৃষ্টির অনিত্বতার প্রমাণ, পুনরুত্থানের সত্যতা, স্রষ্টার একত্ববাদ অথবা এমন সব বিষয় যার উপর আকাইদ নির্ভরশীল, যেমন جواهر مفرده বা মৌলিক পদার্থ সমূহ দ্বারা দেহের গঠন, মহাশূন্য (خلاء)-এর বিদ্যমানতা ইত্যাদি, এগুলো সবই ইল্‌মুল কালামের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

ইল্‌মে কালামের উদ্দেশ্য (غرض علم الكلام) ঃ

* চিন্তাবিদগণ বলেন যে, ইল্‌মুল-কালামের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অস্বীকারকারীকে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে নিরুত্তর করা এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা। বাস্তব সত্য হল- মুতাকাল্লিমদের আকাইদ ও চিন্তার উৎস হল নবূওয়াত অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) হতে প্রাপ্ত ইল্‌ম, অন্য কিছু নয়।[৫]

১. দুহাল-ইসলাম, ৩খ, ৯॥ ২. الملل والنحل صفحه ১৮/॥ ৩. علم الكلام صفحه ৩৫/॥
৪. شرح المواقف ॥ ৫. دستور العلماء لعبد النبى ॥

www.iscalibrary.com

* কেউ কেউ এভাবে বলেছেন যে, ইল্‌মুল-কালামের উদ্দেশ্য হল বিদআত পন্থীদের বিদআতের বিরুদ্ধে আহলুস্-সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার অকৃত্রিমতা রক্ষা করা। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, ইল্‌মে কালামের আলোচনাধীন আকাইদ দ্বারা সেই আকাইদকে বুঝানো হয়েছে যার সম্পর্ক দ্বীনের সাথে। এতে দ্বীন সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাও আলোচিত হয়। সেমতে ইল্‌মে কালামে বাতিল ফিরকা সমূহের আকাইদ সংক্রান্ত আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ইল্‌মে কালামে দ্বীনের সঠিক আকীদাসমূহ প্রমাণ করার সাথে সাথে বাতিল আকীদাসমূহের উল্লেখ এবং তা খণ্ডনও করা হয়ে থাকে।

* আল্লামা তাফতাযানী বলেছেনঃ এই ইল্‌মের উদ্দেশ্য হল উভয় জগতের কল্যাণ অর্জন করা।[১]

এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাধারণতঃ মনে করা হয় মুতাকাল্লিমগণের সকলেই আক্‌ল (বুদ্ধি)-এর প্রাধান্যের প্রবক্তা ছিলেন। এটা ঠিক নয়। তাঁদের মধ্যে কতক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে এরূপ ছিলেন, যেমন মু'তাযিলীদের কোন কোন দল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইল্‌মে কালামের উলামায়ে কেরাম কুরআন এবং হাদীছকে প্রথম স্থান প্রদান করে আকাইদকে যুক্তিনির্ভর দলীল সমূহ দ্বারা প্রম্মাণ করতেন।

ইল্‌মে কালামে ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা

❐ عين/جوهر ঃ (essence, Matter) মূল উপাদান। অর্থাৎ, অনিত্ব যা কিছু স্থান অধিকার করে থাকে এবং যা ইন্দ্রীয়ের সাহায্যে অনুভূত হয়ে থাকে। جوهر আপনা আপনি পাওয়া যায়। যেমন গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, বিভিন্ন প্রাণী, আসমান-যমীন প্রভৃতি। جوهر কে عين ও বলা হয়। جوهر -এর বহুবচন جواهر এবং عين -এর বহুবচন اعيان।

❐ عَرَض ঃ (accident) جوهر -এর বিপরীত। অর্থ আপতন অর্থাৎ, অপ্রধান বিষয়, যা আপনা আপনি স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় না বরং অন্য কিছুর আশ্রয়ে পাওয়া যায়। যেমন সাদা কাল ইত্যাদি রং শরীর বা কাপড়ের আশ্রয়ে পাওয়া যায়।

❐ مادة/هيولى ঃ (Primordial) Matter আদি পদার্থ, মূল পদার্থ, মূল জড়বস্তু ।

❐ جوهر فرد/الجزء الذى لايتجزى ঃ (Atom) অবিভাজ্য অণু, পরমাণু ।

❐ قديم ঃ (everlasting) অনাদি, নিত্ব ।

❐ حادث ঃ قديم -এর বিপরীত, অনিত্ব, পরবর্তীতে সৃষ্ট।

❐ ازلى ঃ (everlasting) অনাদি।

❐ ابدى ঃ (never-ending) অনন্ত।

❐ متكلم ঃ কালাম শাস্ত্রবিদ। এর বহুবচন متكلمون/متكلمين ।

❐ عين ذات ঃ হুবহু সত্তা।

১. شرح العقائد -এর এই ইবারত দ্বারা আল্লামা তাফতাযানী সম্ভবতঃ বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই ইল্‌মের মাধ্যমে সহীহ আকাইদের সংরক্ষণ হবে এবং সহীহ দ্বীনের উপর টিকে থাকা সম্ভব হবে, আর এভাবে উভয় জগতের কল্যাণ অর্জন হবে। ॥

www.iscalibrary.com

❐ غير ذات ঃ সত্তা-ভিন্ন।

❐ مخلوق ঃ সৃষ্ট। আর যা সৃষ্ট তা-ই অনিত্ব।

❐ غير مخلوق ঃ অসৃষ্ট। আর যা অসৃষ্ট তা-ই নিত্ব।

❐ اشاعرة/اشعرية ঃ "আশাইরা" মতবাদটি ইমাম আবূল-হাসান আলী ইব্নে ইসমাঈল আল-আশআরী-র দিকে সম্পৃক্ত। তাঁর মতবাদ আশআরিয়্যা (اشعرية) মতবাদ নামে আখ্যায়িত। আকাইদের ক্ষেত্রে যারা ইমাম আবুল হাসান আশ্আরীর অনুসারী তাদেরকে বলা হয় আশ্আরী, আশআরিয়্যা ও আশাইরা।

❐ ماتريدية ঃ মাতুরীদিয়্যা মতবাদটি ইমাম আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইব্নে আহমাদ আল-মাতুরীদী-এর দিকে সম্পৃক্ত। তাঁর মতবাদ মাতুরীদিয়্যা (ماتريدية) মতবাদ নামে আখ্যায়িত। যারা আকীদাগত বিষয়ে ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী-র অনুসারী, তাদেরকে বলা হয় মাতুরীদী।

❐ اهل السنة والجماعة ঃ ইল্মে কালামের পরিভাষায় "আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত" বলতে আশাইরা ও মাতুরীদিয়্যাদেরকে বোঝানো হয়

ইল্মে কালামের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (ضرورة علم الكلام واهميته) ঃ

ইল্মে কালামের গুরুত্ব থাকা না থাকার ব্যাপারে মধ্যপন্থা ছাড়াও দুটো প্রান্তিক মত দেখা যায়। কেউ কেউ অতিরঞ্জিত এবং বাড়াবাড়ি করে এটাকে হারাম এবং বিদআত বলেছেন, আবার কেউ কেউ এটাকে ফরযে কিফায়া অথবা ফরযে আইন এবং সর্বোত্তম ইবাদত বলে অভিহিত করেছেন। কেননা এটা হল তাওহীদের প্রমাণ এবং আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করার নাম।[১] এই দুই ধরনের প্রান্তিকতার মাঝামাঝি হল ইমাম গাযালীর মত। তার মতে এই ইল্মে ক্ষতির দিকও রয়েছে এবং উপকারের দিকও রয়েছে।

মুল্লা আলী ক্বারী ইল্মে কালামের গুরুত্ব এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ জানা দরকার যে, ইল্মুত্-তাওহীদ হল সর্বশ্রেষ্ঠ ইল্ম এই শর্তে যে, এটা কিতাব, সুন্নাত এবং ইজ্মা বহির্ভূত হবে না এবং তাতে কেবল যুক্তি নির্ভর দলীল সমূহের সমাবেশ ঘটবে না যেমন বিদআত পন্থীগণ করে থাকেন এবং তারা সে পথ পরিহার করেছেন যার উপর আহ্লুস-সুন্নাত ওয়াল জামা'আত প্রতিষ্ঠিত আছেন। মুল্লা আলী ক্বারী ইল্মে কালামকে দ্বীনের মৌলিক বিষয় (اصول دين) গণ্য করে লিখেন যে, এ সেই ইল্ম যাতে এমন বিষয়ের আলোচনা করা হয় যেগুলির প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক।[২]

ইল্মে কালাম দ্বীনের আকীদা সমূহের জন্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করে থাকে এবং এভাবে ঈমানের ভিত্তির হেফাযত করে থাকে। অনুরূপভাবে এ শাস্ত্র সর্বপ্রথম দ্বীনী আকীদা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী এবং তার অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১. এই উভয় পক্ষ তাদের মতের স্বপক্ষে দলীলাদিও উপস্থাপন করেছেন। তাদের দলীলসমূহের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. شرح الفقه الاكبر ॥

২. شرح الفقه الاكبر ॥

www.iscalibrary.com

আল্লামা তাফতাযানী কালাম নামে অভিহিত ইল্‌মুত-তাওহীদ ওয়াস-সিফাতকে ইল্‌মুশ-শারাইয়ে ওয়াল-আহকাম (علم الشرائع والاحكام) এবং কাওয়াইদু আকাইদিল-ইসলাম (قواعد عقائد الاسلام)-এর ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করে বলেন যে, ইল্‌মুল-কালাম হল সন্দেহ ও সংশয় এবং বাতিল আকীদা সমূহের সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দানকারী। মোটকথা ইল্‌মে কালাম হল যাবতীয় ইল্‌মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দ্বীনী ইল্‌ম সমূহের প্রধান। এ শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভে সফলতা অর্জন করা।

ইল্‌মে কালামের সমালোচনা প্রসঙ্গ ও তার নিরসন ঃ

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যদি প্রকৃত পক্ষে ইল্‌মে-কালাম এতই উচ্চ স্তরের ইল্‌ম হয়ে থাকবে, তাহলে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে এটার বিরোধিতা করেছেন কেন ? যেমন সালাফে সালিহীন (অতীতের জ্ঞানী পূণ্যবান ব্যক্তিগণ)-এর মধ্যে বিশেষ করে ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল, কাজী আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম সুফয়ান ছাওরী (রহঃ) প্রমুখ থেকে ইল্‌মে কালামের সমালোচনামূলক উক্তিও পাওয়া যায়, ইব্‌নে তাইমিয়্যাও ইল্‌মে কালাম-এর কিছু বিষয়কে ভ্রান্ত বলে সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাঁর মতে সেগুলি দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। মুহাদ্দিছীনে কেরাম থেকে সাধারণভাবে বর্ণিত আছে ঃ যখন তোমরা কাউকে জাওহার, (جوهر) আর্‌দ, (عرض) মাদ্দা (مادة) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে শুনবে তখন তাকে পথভ্রষ্ট জ্ঞান করবে।

ইল্‌মে কালাম সম্পর্কে উপরোক্ত মতামতের উত্তর হল ঃ যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইল্‌মে কালামের উদ্ভব হয়েছিল এবং তাতে যেসব বিষয় ও পরিভাষা সংযোজিত হয়েছিল তাতে ইল্‌মে কালামের এরূপ কিছু সমালোচনা হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তদুপরি প্রথম শতাব্দীর দিকে আলিমগণ এক এক বিষয়ে অভিজ্ঞ হতেন। ব্যাকরণ বিষয়ের ইমামগণ ফিকাহ্‌শাস্ত্র সম্পর্কে জানতেন না। ফাকীহগণের হাদীছের সাথে সম্পর্ক ছিল কম। ইল্‌মে কালামের উদ্ভব হলে তাতে দর্শনের অসংখ্য পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। মুহাদ্দিছীনে কেরাম উক্ত পরিভাষাসমূহ শ্রবণ করে দর্শন ও কালামের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেননি এবং যেহেতু তাঁরা প্রথম থেকেই গ্রীক দর্শন (فلسفة يونانى) কে খারাপ জানতেন, তাই ইল্‌মে কালামকেও তারা অনুরূপ মনে করে বসেন। তাছাড়া শেষ দিকে ইল্‌মে কালামের মধ্যে দর্শন দর্শন শাস্ত্রের তাবইয়্যাত (طبعيات/প্রকৃতি বিজ্ঞান), ইলাহিয়্যাত (الهيات/খোদাতত্ত্ব বিজ্ঞান) ইত্যাদি বিষয় এত বেশী পরিমাণ ঢোকানো হয় যে, দর্শন আর ইল্‌মে কালামকে পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে। দর্শনের রিয়াযিয়্যাত (رياضيات/গণিত শাস্ত্র) নিয়েই খুব বেশী চর্চা করা হতে থাকে। এরূপ বিবিধ কারণেই ইল্‌মে কালাম সম্পর্কে অনেকের বিরূপ মন্তব্য এসে গিয়েছে।

ইল্‌মে কালাম ও ইলাহিয়্যাতের মধ্যে পার্থক্য ঃ

যেহেতু বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ইল্‌মে ইলাহিয়্যাত (علم الهيات) ও ইল্‌মে কালাম (علم كلام)-এর মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। তাই ইল্‌মে কালাম ও ইল্‌মে ইলাহিয়্যাত-এর মধ্যকার পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু অবগতি থাকা প্রয়োজন।

www.iscalibrary.com

ইল্‌মে কালাম ইল্‌মে ইলাহী হতে অনেকাংশে পৃথক ও ভিন্ন এভাবে যে, ইল্‌মে কালামে মাসাইল ও আকাইদ সম্পর্কে ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থাৎ, কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে বুদ্ধিগত জ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা করা হয় এবং কেবলমাত্র উপায় অথবা মাধ্যম হিসেবে ইল্‌মে কালামকে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ইলাহিয়্যাত-এর ক্ষেত্রে আলোচনা মূলতঃ হয়ে থাকে বুদ্ধিগত ও জ্ঞানলব্ধ নিয়ম পদ্ধতির উপর নির্ভর করে, সেটা ইসলাম সম্মত কিংবা ইসলাম বিরোধী হতে পারে।[১]

উপরোক্ত মত সাধারণ ইলাহিয়্যাত-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইসলামী ইলাহিয়্যাত-এর ক্ষেত্রে কালামের ন্যায় এর প্রতিও লক্ষ্য করা হয় যেন কোন সিদ্ধান্ত ইসলামের চূড়ান্ত আকীদা (যা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত)-এর পরিপন্থী না হয়, অবশ্য তাবীল (ব্যাখ্যা) -এর অবকাশ থাকতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ইলাহিয়্যাতের ক্ষেত্র কালামের আলোচনা হতে অধিক প্রশস্ত। কালাম হল ঈমানী আকীদাসমূহ প্রমাণের নাম এবং ইলাহিয়্যাত সাধারণ রহস্যাবলী অনুধাবনের নাম। এও এক পার্থক্য যে, কালামের প্রাথমিক ভিত্তি হল কুর-আন-হাদীছ এবং ইলাহিয়্যাত-এর ভিত্তি হল জ্ঞান বুদ্ধি।

ইল্‌মে কালামের প্রকার (اقسام علم الكلام) ঃ

ইল্‌মে কালামকে মাসাইল এবং আকাইদের বর্ণনা হিসেবে স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

১. সে ইল্‌মে কালাম যা বিশেষভাবে ইসলামী দলসমূহের পারস্পরিক রাজনৈতিক অথবা ই'তিকাদগত বিবাদের দরুন সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই মতপার্থক্যের করণেই পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত এবং বিরাট বিরাট বিপর্যয় সংঘটিত হয়; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন কোন এক দলের পক্ষ অবলম্বন করায় অন্য দলের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন পর্যন্ত বৈধ রাখা হয়েছে (যেমন মামূনুর রাশীদের আমলে মু'তাযিলীদের পক্ষ অবলম্বন।)।

২. সেই ইল্‌মে কালাম যা দর্শনের মোকাবিলায় সৃষ্টি হয়েছে।

মুতাকাদ্দিমীন (প্রাচীন আলিমগণ)-এর নিকট এ ছিল দুটি পৃথক ইল্‌ম। কিন্তু ইমাম গাযালী (রহঃ) ফালসাফা এবং কালামের মধ্যে পারস্পরিক মিশ্রণ ও মিলনের ভিত্তি রচনা করেন। ইমাম রাযী (রহঃ) সেটার উন্নতি সাধন করেন এবং পরবর্তী কালের আলিমগণ (মুতাআখ্‌খিরীন) সেটাকে এতদূর মিশ্রিতরূপে আলোচনা করেন যে, শিবলী নু'মানীর ভাষায় ফালসাফা, কালাম, উসূলে আকাইদ সবকিছু একাকার হয়ে একটি মিশ্রিত রূপ পরিগ্রহ করে[২]

এ সম্পর্কে ইব্‌নে খালদূন বর্ণনা করেন যে, প্রথম প্রথম ইল্‌মে কালামকে দার্শনিক রূপ প্রদান করা হয়নি। কেননা একদিকে মানুষের মধ্যে ফালসাফা বা দর্শনের চর্চা খুবই কম ছিল এবং যতটুকু চর্চা বিরাজমান ছিল তা থেকেও মুতাকাল্লিমীন (কালাম শাস্ত্রবিদগণ)

১. شرح المواقف ॥ ২. علم الكلام ॥

www.iscalibrary.com

এজন্য দূরে থাকতেন যে, তাঁরা সেটাকে শরী'আতের আকীদার পরিপন্থী বলে মনে করতেন। অতঃপর যুক্তিনির্ভর প্রমাণ প্রয়োগ করা হতে থাকে এবং নতুন নতুন দলীল উপস্থাপন করা হতে থাকে। এটাই ছিল নতুন পদ্ধতি, যাকে মুতাআখ্খিরীন-এর পদ্ধতি বলা হত এবং যাতে নব নব পদ্ধতি ও প্রমাণের অবতারণা করা হয়েছে। যদিও তাতে স্থান বিশেষে দার্শনিকদের চিন্তাধারায় প্রত্যাখ্যান বিদ্যমান ছিল, তথাপি মূতাআখ্খিরীন ইল্‌মে কালামকে এমন রূপ প্রদান করেছিলেন যে, কালাম এবং ফালসাফা (দর্শন)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এতদুভয় পরস্পর মিলিত হয়ে যেন এক জিনিসে পরিণত হয়।[১]

আহমাদ আমীন[২] ইল্‌মে কালামের ব্যাপকতার দরুণ তাকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, এ ইল্‌ম কেবল দ্বীনী আকীদা সমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে অন্তর্ভুক্ত করে না বরং তাতে আরও অনেক জিনিস ক্রমশ অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে ঃ

১. ইলমে কালামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ইলাহিয়্যাত সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা। যেমন আল্লাহ, তাঁর সত্তা (ذات), তাঁর গুণাবলী (صفات) এবং কার্যাবলী (افعال) আম্বিয়া এবং রাসূল ইত্যাদি। এই বিভাগকে আমরা সঠিক অর্থে ইল্‌মে কালাম বলতে পারি।

২. ইল্‌মে কালামের হিক্‌মিয়া বিভাগ, যার সম্পর্ক অধিকতর তাবাইয়্যাত (طبعيات/পদার্থ বিজ্ঞান) এবং কীমিয়া (كيميا/রসায়ন)-এর সাথে, যেমন জাওহার (جوهر/মূল উপাদান), আরদ (عرض/আপতন), অবিভাজ্য অণু (الجزء الذى لا يتجزى), গতি এবং স্থিতি (حركت وسكون) এ বস্তুর বর্ণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদি।

৩. ইল্‌মে কালামের রাজনৈতিক বিভাগ, যাকে দ্বীনীরূপ প্রদান করা হয়েছে। যেমন ইমাম কে হতে পারে, ইমামতের শর্তাবলী কি, আব্বাসী এবং উমাবী ইমাম হিসেবে কেমন ছিলেন এবং এ ধরনের নানা প্রশ্ন।

৪. ইল্‌মে কালামের আক্‌লী (যুক্তিগত) বিভাগ, ভাল ও মন্দ সম্পর্কে আলোচনা, মানবিক ইচ্ছা ও আকাংখার বিষয়, জ্ঞানগত উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা, ই'জাযুল-কুরআন, ইজ্‌মা এবং কিয়াস ইত্যাদি।

ইল্‌মে কালামের সূচনা ঃ

ইল্‌মে কালামের সূচনা সম্পর্কে আবুল হাছান আশআরী (مقالات الاسلاميين দ্রঃ) হতে শুরু করে আল্লামা তাফতাযানী পর্যন্ত এটা বলেছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং সাহাবীগণের যুগ পর্যন্ত লোকেরা আকাইদ সংক্রান্ত ব্যাপারে সরাসরি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট হতে জেনে নেয়ার কিংবা প্রত্যক্ষভাবে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ পাওয়ার দরুন নিশ্চিন্ত হতেন এবং খুব কমই মতানৈক্য প্রকাশ পেত। কিন্তু পরবর্তীকালে ফিত্‌না এবং অরাজকতা দেখা দিলে সন্দেহ ও আপত্তির সৃষ্টি হয়। এটার কিছু রাজনৈতিক

১. مقدمة ابن خلدون ॥ ২. ظهور الاسلام جـ ٤/ ॥

www.iscalibrary.com

কারণ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মতানৈক্য ও মতভেদ এমন ছিল যা ভিন্ন ধর্মের লোক কিংবা তাদের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণকারী লোক অথবা গ্রীক জ্ঞানসমূহের প্রচার এবং তার প্রভাবাধীন যুক্তিগত পদ্ধতির প্রাধান্যের কারণে সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটা মনে করা ঠিক নয় যে, মতানৈক্যের সৃষ্টি কোন অসাধারণ বা অস্বাভাবিক অবস্থা ছিল অথবা এটা কেবল মুসলমানদের ব্যাপারেই ঘটেছিল। প্রথমত, এটা এক স্বভাবজাত ব্যাপার যে, মানুষ সময়ে সময়ে তার ব্যক্তিগত চিন্তা প্রয়োগ করে থাকে এবং প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে তার নিজস্ব দৃষ্টিভংগীও ধার্য করে থাকে। সে এক চিন্তার উপর বিদ্যমান থাকতে পারে না। রাজনৈতিক অবস্থা, ভৌগলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন জাতির আদর্শিক দ্বন্দ্বের শিকার হওয়ার পর চিন্তাধারায় আলোড়নের সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়তঃ ইসলাম হল সমগ্র মানব জাতির দ্বীন, এটা পৃথিবীর সকল মত ও পথের মোকাবিলায় নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও কর্মপদ্ধতি পেশ করে। যার দরুন একটি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন সকল মাযহাব এবং দ্বীনের অনুসারীরা এটার মোকাবিলায় সংঘবদ্ধ হয় এবং নিজেদের চিন্তাধারার অনুকূলে ও তার প্রতিরোধ কল্পে সব রকমের অস্ত্র প্রয়োগ করে, যার ফলে অনেক সময় ইসলাম গ্রহণকারীগণও প্রভাবিত হয়ে পড়ে। মতবিরোধ প্রতিটি ধর্মে এবং প্রতিটি দর্শনে বিদ্যমান। তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে মুসলমানদের মধ্যেও মতপার্থক্য দেখা যায়।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ ধরনের মতবিরোধ এবং বিতর্কের মোকাবিলা কিভাবে করেছেন এবং এত দ্বন্দ্ব ও কলহের মধ্যেও কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তির উপর উম্মতের ঐক্য কিরূপে সুদৃঢ় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আলিমগণ প্রকৃত পক্ষে মৌলিক বিষয়গুলিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে মূল লক্ষ্যে স্থির রয়েছেন ও উম্মতকে সঠিক নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।

এই একতাবদ্ধ রাখার কাজ ইল্‌মে কালাম সম্পন্ন করেছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে, এই মোকাবিলার তিনটি ক্ষেত্র ছিল ঃ

১. অভ্যন্তরীণ, যাতে মুসলমানদের ভিতরে উদ্ভূত সন্দেহের অবসান করা হয়েছে। এটা ছিল বিভিন্ন মতবাদের ভিতরগত ব্যাপার।
২. ভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে। এটা ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্র।
৩. গ্রীক চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের মোকাবিলা। এটাকে যুক্তিগত ক্ষেত্র বলা যেতে পারে।

যদিও অনেকের ক্ষেত্রে ইল্‌মে কালাম নতুন বিপর্যয়ের কারণও হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইল্‌মে কালাম সত্য দ্বীনের বাস্তবতা প্রমাণ করার এবং ওটার বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছে।

ইল্‌মে কালাম কেবল মুসলমানগণই সৃষ্টি করেছে। কার্যত ইল্‌মে কালামে সেই সকল উপকরণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে যা দ্বীনী এ'তেকাদ (বিশ্বাস) সমূহ প্রমাণের জন্য আবশ্যক ছিল। যেমন সৃষ্টির শুরু এবং বিশ্ব জগতের সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় যুক্তিনির্ভর প্রমাণ সমূহকে যথারীতি একটি পদ্ধতিতে এই শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয় এবং পরবর্তী আলিমগণ দর্শন ও তাসাউফের সাথে ইল্‌মে

www.iscalibrary.com

কালামের আলোচ্য বিষয়গুলির সমন্বয় সাধন করতে প্রয়াস পান। তবে দর্শন ও তাসাউফের স্বকীয়তা বজায় থাকে এবং মৌলিক দ্বীনী দৃষ্টিভংগীর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে।[১]

ইল্‌মে কালামের বহুল আলোচিত বিষয়সমূহ ঃ

ইল্‌মে কালামে যে সব বিষয়ে আলোচনা বেশী দেখা যায় তা হল ঃ

১. আল্লাহ্‌র যাত (সত্ত্বা) সিফাত (গুণাবলী), আদ্‌ল (ন্যায় বিচার) এবং তাওহীদ (একত্ববাদ)-এর প্রসঙ্গ।

২. আল্লাহ্‌র দর্শন প্রসঙ্গ।

৩. কুরআন মাখ্‌লূক (সৃষ্ট) কিংবা গায়রে মাখলূক (অসৃষ্ট) হওয়া প্রসঙ্গ।

৪. জাব্‌র (অদৃষ্টবাদ) এবং ইখ্‌তিয়ার (ইচ্ছার স্বাধীনতা) প্রসঙ্গ।

৫. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির অবস্থা এবং কুফ্‌র-এর সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ (এবং মানযিলাতুন বায়নাল- মানযিলাতায়ন প্রসঙ্গ)।

৬. আম্‌র বিল-মা'রূফ (ভাল কাজের নির্দেশ) এবং নাহী আনিল-মুনকার (মন্দ কাজ থেকে বারণ) প্রসঙ্গ।

৭. নবুওয়াতের উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব প্রসঙ্গ।

৮. ইমামত এবং খিলাফতের মাসআলা।

ইল্‌মে কালামের বহুল আলোচিত এ বিষয়সমূহের কিছু তো রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের দরুন সৃষ্টি হয়েছিল এবং কিছু কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ (আয়াতে মুতাশাবিহাত) হতে এবং কিছু গ্রীক দর্শনের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ পাঠকদের নিকট এ সকল আলোচনা গৌণ এবং গুরুত্বহীন বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার অনেক কুফল অবশেষে দ্বীনের বিধানের উপর আপতিত হয়। এ কারণে মুহাদ্দিছীন, ফুকাহা এবং পরবর্তীকালে আশআরীদিগকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। অন্যথায় দ্বীনের আকীদা সমূহ, আল্লাহ্‌র যাত, নবুওয়াত ও রিসালাত, কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম হওয়া এবং আমল ও প্রতিদানের বিষয় এবং অনুরূপ মৌলিক বিষয় সমূহে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়ার আশংকা ছিল। তার প্রভাবে সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম-কানূন এবং ইবাদত ও এ'তেকাদ ব্যবস্থাপনায়ও ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিত। এটা ছাড়া উক্ত আলোচনা সমূহের মধ্য হতে এমন অনেক বিষয়ও বের হয়ে পড়ে যা ইসলামী চিন্তার অন্তর্ভুক্ত। যেমন আশআরীদের মাসআলায়ে জাওয়াহির, যার গুরুত্ব বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশ পায়। সূচনাতে এটা একটা সাধারণ প্রশ্ন ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সেটার শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হয়, যার ফলে নিয়মতান্ত্রিক দল ও মতের সৃষ্টি হতে থাকে, অতঃপর প্রত্যেক দল ও মত হতে অসংখ্য শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হতে থাকে।

ইমাম আবুল হাছান আশআরী مقالات الاسلاميين গ্রন্থে উক্ত দল ও মত এবং শাখা সমূহের উল্লেখ করেছেন। আল-বাগদাদী আল-ফার্‌কু বাইনাল-ফিরাক গ্রন্থে ঐসকল

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রকাশনায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা থেকে গৃহীত। ॥

www.iscalibrary.com

লোকদেরও চিহ্নিত করেছেন যারা সত্য পথে আছেন এবং তিনি বাতিলপন্থীদের আকীদাসমূহও বর্ণনা করেছেন (আরও দ্র. الملل والنحل للشهرستانى وكتاب الفصل لابن حزم)।

এ স্থানে উক্ত মতবাদসমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এখানে শুধু কিছু মৌলিক দল এবং তাদের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তাদের আলোচনা করা যুক্তিসংগত হবে।

ইল্‌মে কালামের প্রসিদ্ধ দলসমূহ ঃ

খিলাফতে রাশিদা যুগের পর যখন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে (বিশেষ করে খাওয়ারিজ, বানু উমায়্যা এবং শী'আদের দ্বন্দ্ব) তখন স্বাভাবতঃ চিন্তা ও বিশ্বাসগত বাক-বিতণ্ডাও চরমে উঠে। যে সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে উক্ত বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল তা নিম্নরূপ ঃ

(১) জাব্‌র ও ইখ্‌তিয়ার সংক্রান্ত মাসআলা।

(২) কবীরা গুনাহগার এবং শরী'আতে তার স্থান।

(৩) খাল্‌কে কুরআনের মাসআলা।

এ সব বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সব দল সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলঃ

১. জাব্‌রিয়া

২. কাদ্‌রিয়া

৩. মুর্‌জিয়া

৪. জাহ্‌মিয়া

৫. মু'তাযিলা

প্রভৃতি। অত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে মৌলিক ভাবে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে দুটি দল অর্থাৎ, আশাইরা /আশআরিয়্যা ও মাতুরীদিয়্যা-দের সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।

আশাইরা ও মাতূরীদিয়্যা

(الاشاعرة والماتريدية)

ইল্‌মে কালামের ক্ষেত্রে বা বলা যায় আকাইদের ক্ষেত্রে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে দুটি ধারা। তা হল আশাইরা ও মাতুরীদিয়্যা। আশাইরা মতবাদটি ইমাম আবুল-হাসান আলী ইব্‌নে ইসমাঈল আল-আশআরী-র দিকে সম্পৃক্ত। তাঁর মতবাদ আশআরিয়্যা (اشعرية) মতবাদ নামে আখ্যায়িত। আকাইদের ক্ষেত্রে যারা ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরীর অনুসারী তাদেরকে বলা হয় আশ্‌আরী, আশ্‌আরিয়্যা ও আশাইরা। আর মাতুরীদিয়্যা মতবাদটি ইমাম আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইব্‌নে আহমদ আল-মাতুরীদী-এর দিকে সম্পৃক্ত। তাঁর মতবাদ মাতুরীদিয়্যা (ماتريدية) মতবাদ নামে আখ্যায়িত। যারা আকীদাগত বিষয়ে ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী-র অনুসারী, তাদেরকে বলা হয় মাতুরীদী। আশাইরা মতবাদটি ৪র্থ হিজরী শতাব্দী হতে আজ পর্যন্ত ইল্‌মে কালামের সর্ববৃহৎ এবং

www.iscalibrary.com

প্রসিদ্ধতম মতবাদ হিসেবে চলে আসছে। পক্ষান্তরে আহ্‌লে ইল্‌ম-এর উপর মাতুরীদিয়্যা মতবাদটির প্রভাব অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। আজও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও মাদ্‌রাসাসমূহে মাতুরীদিয়্যা মতবাদটিকে ইসলামী আকাইদের প্রসিদ্ধতম উৎসসমূহের মধ্যে গণ্য হয়। মাতুরীদীর মতবাদ বেশীরভাগ মা ওয়ারাউন্‌-নাহ্‌র[১]-এর এলাকাসমূহে, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের দেশসমূহে এবং তুর্কিস্তানী এলাকায় বিস্তার লাভ করে আছে।

ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরী এবং ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী উভয়েই সুন্নী ছিলেন এবং সম্মিলিত প্রতিদ্বন্দ্বী (মু'তাযিলাগণ)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন।

কিছু কিছু ব্যাপারে ইমাম আশ্‌আরী ও ইমাম মাতুরীদির মধ্যে মতবিরোধও পাওয়া যায়, তবে অধিকাংশ মৌলিক বিষয়সমূহে তাঁরা ঐক্যমত্য কিংবা কাছাকাছি মত পোষণ করতেন।

ইমাম আবুল হাসান আল-আশ্‌আরী -এর জীবনী

(الامام ابو الحسن الاشعرى)

ইমাম আবুল হাসান আল-আশ্‌আরীর বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ আবুল হাসান আলী ইব্‌নে ইসমাঈল ইব্‌নে আবী বিশ্‌র ইস্‌হাক ইব্‌নে সালিম ইব্‌নে ইসমাঈল ইব্‌নে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুসা ইব্‌নে বিলাল ইব্‌নে আবী বুরদাহ ইব্‌নে আবূ মুসা আশআরী (রাঃ)। তার নবম উর্দ্ধতন পুরুষ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)।[২]

তিনি প্রসিদ্ধ মতানুসারে ২৬০ মতান্তরে ২৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী[৩] ৩২৪ মতান্তরে ৩৩০ হিজরী মোতাবিক ৯৪২ সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

তিনি প্রখ্যাত মু'তাযিলী আবু আলী আব্‌দুল-ওয়াহ্‌হাব আল-জুবাঈ[৪]-এর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ তাঁর তত্ত্বধানে হয়েছিল। আল-জুবাঈ হতেই তিনি ইল্‌মে কালাম এবং ই'তিযাল মতবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু হিজরী ২৯৫ সনে একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি মু'তাযিলী মতবাদ বর্জন করেন।[৫] তিনি বসরার জামে মসজিদের মিম্বরে আরোহন করে জোর আওয়াজে বলেনঃ যে আমাকে চেনে সে আমাকে চেনে। আর যে আমাকে না চেনে সে শুনে রাখুক আমি অমুকের পুত্র অমুক। এতদিন যাবত আমি বলতাম কুরআন সৃষ্ট, পরকালে আল্লাহ্‌র দর্শন হবে না, মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা

১. ৩৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য ॥ ২. الاتحاف للزبيدى جـ/٢ ॥ ৩. ইমাম ইব্‌নে আসাকির এই মতকেই সহীহ বলেছেন। اتحاف السادة المتقين للزبيدى جـ/٢ ॥ ৩. মৃ. ৩০৩ হিঃ ॥ ৫. ইমাম আশআরীর জীবনে ই'তিযাল হতে সুন্নিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং আদর্শের ক্ষেত্রে এই আকস্মিক বিপ্লবের কারণ কেউ কেউ এরূপ মনে করেন যে, তিনি বাগদাদ যাতায়াত করতেন এবং তথায় জামিউল-মানসূরের প্রসিদ্ধ শাফিঈ ফকীহ আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌নে আহমাদ আল-মাওয়াযীর মজলিসে উপবেশন করতেন। সম্ভবত এই শিক্ষা-বৈঠকে তাঁর অন্তরে ই'তিযাল-এর প্রতি-ঘৃণা এবং মুহাদ্দিছ ও ফকীহদের তরীকার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তিনি ধীরে ধীরে ই'তিযাল হতে দূরে এসং সুন্নিয়াতের নিকটবর্তী হতে থাকেন। ইসলামী বিশ্বকোষ. ইঃ ফাঃ। ॥

www.iscalibrary.com

ইত্যাদি। আজ আমি মু'তাযিলাদের এসব মতবাদ হতে তওবা করছি। এভাবে তিনি ই'তিযাল হতে পৃথক হওয়ার ঘোষণা দেন। ই'তিযাল পরিত্যাগ করার পর ইমাম আশ্আরী বস্রা হতে বাগদাদে চলে আসেন এবং এখানে থেকে তিনি হাদীছ এবং ফিক্হ বিষয়েও জ্ঞান লাভ করেন।

ই'তিযাল হতে পৃথক হওয়ার ঘোষণা দেয়ার পর তিনি মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে লেখনী ও সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেন। তিনি তার প্রতিপক্ষ মু'তাযিলাদের মতাদর্শকে তাদেরই দলীল-প্রমাণ দ্বারা খণ্ডনের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। যদিও সেই যুগে আহ্লুস-সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রখ্যাত ফকীহ ইমাম তাহাবী এবং ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদীও আকীদা এবং চিন্তার জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং তিনিও মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আবুল-হাসান আশআরী মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁর প্রভাব অধিক ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে যখন মু'তাযিলাদের প্রতাপ কমে যায়, তখন ইমাম আবুল হাছান আশআরী সম্মুখে অগ্রসর হন এবং সেই যুগে তাঁকে আহলুস-সুন্নাতের আকাইদের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ও শক্তিধর ইমাম মনে করা হয়। তিনি মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্রতার সাথে কলম ধরেন এবং খাঁটি সুন্নী দৃষ্টিকোণ হতে দ্বীনী আকাইদের সমর্থন ও প্রচারের সূচনা করেন এবং এ কারণেই ইল্মুল-কালামের ইতিহাসে তাঁর বিরাট মর্যাদা ও স্থান রয়েছে। তাঁর এই বিরাট খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে "ইমামু আহ্লিস-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত" বলা হয়।

ইমাম আবুল হাসান আশ্আরী একজন উচ্চ পর্যায়ের লেখক ছিলেন। মু'তাযিলা ও জাহ্মিয়াদের বিরুদ্ধে الموجز নামক তিন খণ্ডে সমাপ্ত একখানি দীর্ঘ কিতাব তিনি রচনা করেছিলেন। তিনি ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত একখানি তাফসীরও লেখেন। তাঁর রচনার মধ্যে আরও রয়েছে مقالات الاسلاميين ও كتاب الابانة। এ ছাড়াও তাঁর অনেক রচনার কথা জানা যায়। কোন কোন বর্ণনা মোতাবিক তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা হাজার পর্যন্ত পৌঁছে।[১]

ইল্মে কালামের ইতিহাসে এক দিকে মু'তাযিলা দল এবং অন্য দিকে মুজাস্সিমা ও মুশাব্বিহা দলের উল্লেখ পাওয়া যায়। মু'তাযিলাগণ আল্লাহ্র সিফাত অস্বীকার করতেন এবং মুজাস্সিমা ও মুশাব্বিহা আল্লাহ্র সিফাতকে সৃষ্টির সিফাতের অনুরূপ গণ্য করতেন। ইমাম আশ্আরীর পদ্ধতি উল্লেখিত চরম পন্থাদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তিনি আল্লাহ্র সিফাতের আকীদা গ্রহণ পূর্বক বলেছেন যে, উক্ত সিফাত হাওয়াদিছ (ক্ষণস্থায়ী) মাখ্লূক সদৃশ নয় বরং আল্লাহ্র যাতের উপযোগী, যেমন তাঁর মর্যাদা দাবী করে।[২]

১. ইসলামী বিশ্বকোষ. ইঃ ফাঃ ও ॥ الاتحاف للزبيدى جـ ٢/

২. প্রথম দিকে ইমাম আবুল হাসান আশ্আরী وجه , يد , ساق/قدم , ইত্যাদি সিফাতের ক্ষেত্রে রূপক অর্থ গ্রহণ করতেন, তবে পরবর্তীতে তিনি সালফে সালেহীনের ন্যায় কোন কাইফিয়াত বর্ণনা ছাড়াই বিশ্বাসের পন্থা গ্রহণ করেন। ॥ الاتحاف للزبيدى جـ ٢/

www.iscalibrary.com

ইমাম আশআরী মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও মু'তাযিলাদের মতবিরোধগত বিষয়সমূহে মুহাদ্দিছদের মত পোষণ করেন এবং বিদআতপন্থীদের থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা আকীদাসমূহের ক্ষেত্রে আক্‌ল (বুদ্ধি-বিবেক) নাক্‌ল (কিতাব-সুন্নাহ) উভয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, তথাপি আক্‌লকে চিন্তা এবং দর্শনের জগতে শাসক এবং বিচারকের স্থান প্রদান করেননি, বরং তাকে শরঈ নাস্ (نص) সমূহের জন্য খাদিমরূপে ব্যবহার করেছেন।

ইমাম আশ্‌আরীর পূর্বে দুটি দল ছিল। আরবাবে নাক্‌ল (ارباب نقل/কুরআন-হাদীছের ভাষ্য নির্ভর) এবং আরবাবে আক্‌ল (ارباب عقل/নিছক বুদ্ধি ও যুক্তি নির্ভর)। ইমাম আশ্‌আরী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার প্রয়াস পান এবং এ কারণে এমন আকীদাসমূহ গ্রহণ করেন যা তাঁর আক্‌ল (জ্ঞান) এবং নাক্‌ল (বর্ণনাজাত ভাষ্য) উভয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১]

যদিও ইমাম আশ্‌আরী নিজেকে ইমাম আহমাদ ইব্‌নে হাম্বাল (রহঃ)-এর পথের অনুসারী বলে ঘোষণা করেন (كتاب الابانة-র মুকাদ্দামা দ্রঃ) কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা হাম্বলী মাযহাবে তেমন একটা প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি; বরং হাম্বলী মাযহাবে তাঁর বিরোধীর সংখ্যা প্রচুর। অবশ্য শাফিঈ মাযহাবে তাঁর চিন্তাধারা ব্যাপক মর্যাদা লাভ করে এবং হানাফী মাযহাবেও তাঁর অনুসারী পাওয়া যায়। যেমন সায়্যিদ শরীফ আল-জুরজানী।[২]

ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরীর অনুসারীদের অধিকাংশ ছিল শাফিঈ মতাবলম্বী। শাফিঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ আশ্‌আরী উলামার মধ্যে রয়েছেন ঃ আবূ সাহ্‌ল আস-সালূকী, আবূ বাক্‌র ক্বাফ্‌ফাল, আবূ যায়দ আল-মাওয়াযী, হাফিজ আবূ বাক্‌র আল-জুরজানী, আবূ মুহাম্মাদ আত-তাবারী, আবূ আবদিল্লাহ আত-তাঈ, আবূল-হাসান আল-বাহিলী, আবূ বাক্‌র ইব্‌নে ফুরাক, ইমাম গাযালী (রঃ)-র শিক্ষক ইমামুল-হারামাইন এবং আল্লামা বায়যাবী। এ ছাড়া ইমাম বায়হাকী, শাহরাস্‌তানী, ইমাম ফাখ্‌রুদ্দীন রাযী এবং পরবর্তী আলিমদের মধ্যে আস্-সানূসী প্রমুখও আশআরী ছিলেন।[৩]

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদীর জীবনী

(الامام ابو منصور الماتريدى)

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী-র বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইব্‌নে মুহাম্মাদ ইব্‌নে মাহ্‌মূদ আস্‌সামারকন্দী। সমরকন্দের অন্তর্গত মাতুরীদ[৪] নামক গ্রামে/মহল্লায় তার জন্ম বিধায় তাঁকে মাতুরীদী বলা হয়। তাঁর উপাধি ছিল ইমামুল হুদা অর্থাৎ, হেদায়েতের ইমাম।

১. ইসলামী বিশ্বকোষ. ইঃ ফাঃ - ইল্‌মুল-কালাম, পৃ. ৫৭)॥

২. মৃ. ৮১৬ হি.॥

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ. ইঃ ফাঃ ॥

৪. মাতুরীদ (ماتريد) শব্দটি মূলতঃ ছিল মাতুরীত (ماتريت)। শেষের তা (ت) কে দাল (د) দ্বারা পরিবর্তন করে মাতুরীদ (ماتريد) বানানো হয়েছে এবং তার দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁকে মাতুরীদী বলা হয়। الاتحاف للزبيدى. جـ/২ ॥

www.iscalibrary.com

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী ফেকাহ, উসূলে ফেকাহ এবং উসূলে-দ্বীনের সর্বস্বীকৃত আলিম ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের বড় বড় আলিমের নিকট হতে ইল্‌ম হাসিল করেন। তন্মধ্যে আবূ নাস্‌র আহমাদ ইব্‌নে আব্বাস আল-ইয়াদী (العياضى), আবূ বাক্‌র আহ্‌মদ ইব্‌নে ইস্‌হাক আল-জুরজানী, মুহাম্মাদ ইব্‌নে মুকাতিল আর-রাযী এবং নাসীর ইব্‌নে ইয়াহ্‌য়া আল-বালাখী হলেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইমাম মুহাম্মাদের বরাতে উল্লেখিত মনীষীদের নিকট হতে ইমাম মাতুরীদী (রঃ) ইমাম আবূ হানীফার গ্রন্থসমূহের রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী তিন সিড়ির মাধ্যমে ইমাম আবূ হানীফার বিশেষ শাগরেদ ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌নে হাসান শায়বানীর শিষ্য।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী বহু সংখ্যক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. كتاب التوحيد
২. كتاب المقالات
৩. كتاب رد اوائل الادلة للكعبى
৪. كتاب رد وعد الفساق للكعبى
৫. كتاب رد الاصول الخمسة لابى محمد الباهلى
৬. كتاب بيان وهم المعتزلة
৭. كتاب تاويلات القرآن
৮. كتاب الجدل
৯. كتاب الاصول فى اصول الدين
১০. الرد على القرامطه

প্রভৃতি।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী একজন প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ, আহলুস-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের একজন প্রসিদ্ধ মুতাকাল্লিম এবং মু'তাযিলাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর অনুসারীদের অধিকাংশ হল হানাফী মতাবলম্বী। অপর পক্ষে ইমাম আশআরীর অনুসারীদের অধিকাংশ ছিল শাফিঈ মতাবলম্বী। সম্ভবতঃ এ কারণেই কারও কারও মত হল আশআরী ও মাতুরীদীর মধ্যে যে সামান্য মতপার্থক্য দেখা যায় তা প্রকৃত পক্ষে ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-র নীতির ফল। মাতুরীদী মতবাদের যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার না হওয়া সত্ত্বেও আহ্‌লে ইল্‌মের উপর আবূ মানসূর মাতুরীদীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। আজও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও মাদ্‌রাসাসমূহে মাতুরীদী ইল্‌মে কালাম ইসলামী আকাইদের প্রসিদ্ধতম উৎসসমূহের মধ্যে গণ্য হয়। বর্তমান যুগে মাতুরীদী দর্শনের ছাপ মিসরের শায়খ আব্দুহ-র রিসালাতুত-তাওহীদ এবং শারহুল-আকাইদ আল আদূদিয়াতে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।[১]

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইঃ ফাঃ - ইল্‌মুল কালাম, শিবলী নু'মানী ॥

www.iscalibrary.com

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদির চিন্তা ও মতবাদ পর্যালোচনা করলে অনুমিত হয় যে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-র চিন্তাধারা ও মতবাদের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং তার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। কেননা উভয়ের চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য এবং সম্পর্ক পাওয়া যায়। ইমাম আবূ হানীফার প্রতি আরোপিত অনেক পুস্তিকা ও গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে আল-ফিক্হুল-আকবার, আল-ফিকহুল-আবসাত, মাকতূব আবী হানীফা, ইলা আবী উছমান আল-বাত্তী, ওয়াসিয়্যাতু আবী হানীফা, ইলা ইউসুফ ইব্নে খালিদ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ খুবই প্রসিদ্ধ। অনুমিত হয় যে, ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী ইমাম আবূ হানীফার এ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন।[১]

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী-এর চিন্তাধারার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ

১. তিনি নাক্ল (কুরআন ও হাদীছ)-এর সংগে সংগে আক্ল (যুক্তি)-এর উপরও নির্ভর করতেন এই শর্তে যে, তা শরীআতের অনুকূলে হবে এবং তাঁর নিকট কেবল সেই সকল আক্লী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বৈধ যা শরী'আত বিরোধী হবে না।

২. কুরআনের তাফ্সীর করার ক্ষেত্রে তিনি এই নীতি অবলম্বন করেছেন যে, মুতাশাবিহাত (متشابهات/রূপক)-কে মুহকামাত (محكمات/স্পষ্টভাষ্য)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং মুতাশাবিহাতের তাবীল ও বিশ্লেষণ মুহ্কামাতের আলোকে করতে হবে।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদির মতবাদ বেশীরভাগ মা ওয়ারাউন্-নাহার[২] (ماوراء النهر)-এর এলাকাসমূহে, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দেশসমূহে এবং তুর্কিস্তানী এলাকায় বিস্তার লাভ করে। তাঁর চিন্তা ও মতবাদ এবং এ'তেকাদ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ফাখ্রুল-ইসলাম আল-বাইযাবী, আত-তাফ্তাযানী, আন-নাসাফী এবং ইব্নুল-হুমাম-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ হানাফী আলিমদের যথেষ্ট অবদান আছে।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী ৩৩৩ হিজরীতে ইমাম আবূল হাসান আশ্আরীর ওফাতের কিছুকাল পর ইন্তেকাল করেন। সমরকন্দে তাঁর কবর বিদ্যমান।

ইল্মে কালামের কিছু বিষয়ে আশআরী ও মাতূরীদীদের মধ্যকার মতবিরোধ প্রসঙ্গ

ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং আবূ মানসূর মাতুরীদী উভয়ই সুন্নী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপারে মতবিরোধও পাওয়া যায়, তবে অধিকাংশ মৌলিক বিষয়সমূহে তাঁরা ঐক্যমত্য কিংবা কাছাকাছি মত পোষণ করতেন। যে সব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, তা তেমন কোন মৌলিক বিষয় নয়। তাঁদের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, তার সংখ্যা প্রায় ৪০ বলে বর্ণনা করা হয়। কেউ কেউ তার সংখ্যা ৫০ পর্যন্ত বলেছেন। তন্মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইঃ ফাঃ ॥ ২. জায়হান/আমুদরিয়া নদীর উত্তর পূর্ব অঞ্চলীয় এলাকাকে মাওয়ারা উন্নাহার এলাকা বলা হয়। বর্তমানে এখানে রয়েছে উযবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান। এর মধ্যে রয়েছে বোখারা, সমরকন্দ, তাশখন্দ, তিরমীয প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ ॥

www.iscalibrary.com

১. বস্তুসমূহের ভাল (حسن) এবং মন্দ (قبح) হল জ্ঞানগত (عقلى);
২. আল্লাহ কাউকে শক্তির বাইরে কষ্ট দেন না।
৩. আল্লাহ্‌র সকল কাজ কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল (معللة بالمصالح)।
৪. মানুষের স্বীয় কার্যাবলীর উপর ক্ষমতা ও ইখ্‌তিয়ার রয়েছে এবং এই ক্ষমতা উক্ত কার্যাবলীর অস্তিত্বের উপর প্রভাব রাখে।
৫. জ্ঞান (عقل)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ ঃ
৬. আল্লাহ যুল্‌ম করেন না এবং তাঁর যালেম বা অত্যাচারী হওয়া জ্ঞানগতভাবে (عقلا) অসম্ভব।
৭. ঈমান হ্রাস পায় না এবং বৃদ্ধিও হয় না।
৮. আল্লাহ্‌কে যথাযথ ভাবে চেনা সম্ভব।
৯. জীবন সম্পর্কে হতাশ হওয়া অবস্থায়ও তওবা কবূল হয়।
১০. পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বস্তু অনুভব করা ইল্‌ম নয়, বরং ইল্‌ম-এর মাধ্যম ইত্যাদি।

আশাইরা উল্লেখিত আকীদাসমূহের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করে। আশ্‌আরীগণ মালিকী ও শাফিঈ মাযহাবের মাসায়েলের উপর ভিত্তি করে এসব বিষয়ে মতবাদ দাঁড় করেছেন। পক্ষান্তরে মাতুরীদীগণ এ ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবূ হানীফার ভাষ্যসমূহকে গ্রহণ করেছেন। তবে এই মতবিরোধ তেমন কোন মৌলিক মতবিরোধ নয়। যেমন নিম্নে উপরোক্ত মতবাদ সমূহের কয়েকটির বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করে বিষয়টা স্পষ্ট করার প্রয়াস নেয়া গেল।[১]

(১) বস্তুসমূহের ভাল ও মন্দ-প্রসঙ্গ ঃ

আশ্‌আরীদের নিকট বস্তুসমূহের মধ্যে মূলতঃ কোন ভাল কিংবা মন্দ নিহিত নেই, বরং উক্ত ভাল এবং মন্দ শরীআতের উপর নির্ভরশীল। কোন কাজ বা কোন বস্তু এজন্য উৎকৃষ্ট যে, শরী'আত তার নির্দেশ দিয়েছে এবং নিকৃষ্ট এজন্য যে, শরী'আত তা করতে নিষেধ করেছে। মাতুরীদির মতে বস্তুসমূহ মূলতঃ হয় উৎকৃষ্ট না হয় নিকৃষ্ট এবং তার উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়া জ্ঞানের সাহায্যে অনুভব করা যেতে পারে। মু'তাযিলাগণও জ্ঞানগত ভাল ও মন্দের কথা বলেন, তবে তাদের এবং মাতুরীদিয়াদের চিন্তা ও মতের মধ্যে পার্থক্য হল- মু'তাযিলাদের নিকট যে জিনিস জ্ঞানগতভাবে উৎকৃষ্ট তা সম্পাদন করা ওয়াজিব এবং যে জিনিস নিকৃষ্ট তা হারাম। মাতুরীদীগণ যদিও স্বীকার করেন যে, বস্তুসমূহের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়ার অনুভব জ্ঞান দ্বারা সম্ভব, তবে তাদের মতে মানুষ কেবল এই কারণে মুকাল্লাফ এবং আদিষ্ট হয় না, বরং মুকাল্লাফ ও আদিষ্ট হওয়ার (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কাজ সম্পাদন ও নিকৃষ্ট কাজ পরিহার বিষয়ে আদিষ্ট হওয়ার) জন্য শরী'আতের নির্দেশ অপরিহার্য এবং আদেশ-নিষেধ (امر و نهى) তারই উপর নির্ভরশীল।

(২) আল্লাহ কাউকে তার ক্ষমতার বাইরে কষ্ট দেন কি না-এ প্রসঙ্গ ঃ

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইঃ ফাঃ ও الاتحاف للزبيدى جـ ২/ থেকে গৃহীত। ॥

www.iscalibrary.com

আশআরীদের নিকট আল্লাহর জন্য এটা বৈধ যে, তিনি বান্দাদের জন্য এমন সকল কাজ নির্ধারণ করে দিবেন যা সম্পাদন তাদের ক্ষমতার বাইরে। মাতুরীদীগণের মতে আল্লাহ্ ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ করতে কাউকে বাধ্য করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই মাসআলাটি আল্লাহ্র কার্যাবলী মুআল্লাল অথবা গায়রে মুআল্লাল হওয়ার মাসআলা থেকে উদ্ভব হয়েছে। আশআরীদের নিকট এটা যুক্তিগ্রাহ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন এবং পাপীকে পুরস্কৃত করতে পারেন। কেননা ভাল কাজের প্রতিদান কেবল আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ এবং পাপের শাস্তি প্রদান আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়। আশআরীদের নিকট আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার খেলাফও করতে পারেন, কিন্তু মাতুরীদিদের নিকট আল্লাহ তাঁর হিকমত পরিবর্তন করেন না এবং তাঁর ওয়াদায় কোনরূপ পরিবর্তন হয় না।

ان الله لا يخلف الميعاد -

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না। (সূরাঃ ৩ -আলু ইমরানঃ ৯)

(৩) আল্লাহ্র সকল কাজ কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল হওয়া প্রসঙ্গ ঃ

এ বিষয়টি এভাবেও পেশ করা যায় যে, আল্লাহ্র কার্যাবলী মুআল্লাল বিল-ইল্লাত (معلل بالعلة) অর্থাৎ, হেতুর সঙ্গে সম্পর্কিত কি না? মু'তাযিলাদের মতে আল্লাহ্র সকল কাজ মুআল্লাল বিল-ইল্লাত বা হেতু নির্ভর। কল্যাণ তার ভিত্তিমূল এবং তার কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব তাঁদের মতে আল্লাহ কোন অকল্যাণকর কাজের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন না; বরং কল্যাণকর কাজের আদেশ করা তাঁর জন্য ওয়াজিব। আশআরীদের মতে আল্লাহ্র কার্যাবলী গায়রে মুআল্লাল (হেতু নির্ভর নয়)। তিনি তাঁর বান্দাদের বিষয়ে যা খুশী করতে পারেন। এ কারণে বান্দার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা তাঁর উপর অপরিহার্য নয়। কেননা তাঁকে কারও সম্মুখে জওয়াবদিহী করতে হয় না। মাতুরীদীগণের বক্তব্য হল- আল্লাহ্র সকল কাজ হিকমত এবং কল্যাণের উপর ভিত্তি করেই সংঘটিত হয়। কেননা তিনি সর্বজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ, তবে তিনি হিকমত এবং কল্যাণের ইচ্ছা ও কামনা করতে বাধ্য নন। অতএব এটা বলা ভুল যে, কল্যাণ সাধন করা তাঁর জন্য অপরিহার্য, কেননা এতে তাঁর সীমাহীন ইচ্ছা ও কামনা এবং পূর্ণ স্বাধীনতা রহিত হয়। তাঁর জন্য কোন কাজ অপরিহার্য করা বৈধ নয়।

(৪) মানুষের স্বীয় কার্যাবলীর উপর ক্ষমতা ও ইখ্তিয়ার রয়েছে কি-না এবং এই ক্ষমতা উক্ত কার্যাবলীর অস্তিত্বের উপর প্রভাব রাখে কি-না -এ প্রসঙ্গ ঃ

এ প্রসঙ্গে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক। তা হল জাব্রিয়্যা ফিরকা বলে যে, মানুষের মাঝে কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছা শক্তিরই অস্তিত্ব নেই বরং কার্য সম্পাদনের জন্য মানুষ সম্পূর্ণ বাধ্য (مجبور محض)। কাদরিয়্যা ফিরকা বলে, মানুষ সকল কাজ নিজ ইচ্ছায় সম্পাদন করে থাকে এবং তার কার্যের সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নেই বরং মানুষ নিজেই তার কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা। এ কারণে তারা আল্লাহ্র তাক্দীরকে অস্বীকার করতেন। মু'তাযিলাগণও এই আকীদা পোষণ করতেন যে, মানুষ স্বয়ং তার কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা এবং আল্লাহ কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা নন। আশাইরা এই আকীদায়

www.iscalibrary.com

বিশ্বাসী যে, আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। অতএব তিনি মানুষের সকল কার্যেরও সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষ কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা নয়, বরং তা অর্জনকারী (مكتسب)। মাতুরীদিয়ার নিকট মানুষের কার্য সম্পাদন সেই শক্তির বলেই হয়ে থাকে যা আল্লাহ মানুষের কার্য সম্পাদন অথবা অসম্পাদন উভয়ের ব্যাপারে তাকে দিয়ে রাখেন। অর্থাৎ সে কোন্ কাজ করবে বা কোন্ কাজ করবে না সে ব্যাপারে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। কার্যলাভের জন্য উক্ত সৃষ্ট শক্তির নাম হল কর্মশক্তি (استطاعت) এবং এটা মানুষের মধ্যে কর্ম সম্পাদনের সময় সৃষ্টি হয়ে থাকে। আশাইরা এবং মাতুরীদিয়া-র মতবাদের মধ্যে পার্থক্য হল, আশাইরা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষকে স্বয়ং ক্ষমতাবান মনে করে না এবং এ কারণে 'উলামা' আশঅ-ারীদের এই ধারণাকে অদৃষ্টবাদের দিকে ধাবিতকারী (مؤدى الى الجبر) বলে আখ্যায়িত করেছেন। অপর দিকে মাতুরীদিয়া কার্যলাভের ক্ষেত্রে মানুষকে ক্ষমতাবান মনে করে। তাদের নিকট মানুষের সকল কার্যাবলী আল্লাহ্র ইচ্ছায় এবং তাঁর নির্দেশে সম্পাদিত হয়, অবশ্য মানুষের স্বীয় কার্য সম্পর্কে স্বাধীনতা আছে। কেননা তাকে কার্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

(৫) জ্ঞান (عقل)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্র পরিচয় লাভ হওয়া প্রসঙ্গ ঃ

এ বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ঈমানের মূল বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত। মু'তাযিলাদের মতে জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহ্র পরিচয় লাভ অপরিহার্য। আশ্আরীদের মতে নবী প্রেরণের পূর্বে ঈমান ওয়াজিব নয় (অর্থাৎ তাঁর পরিচয় লাভ করা শরী'আতের মাধ্যমে ওয়াজিব, জ্ঞানের মাধ্যমে নয়)। মাতুরীদীদের নিকট আক্ল বা জ্ঞান আল্লাহ্র অস্তিত্বের পরিচয় লাভ করতে পারে কিন্তু তা দ্বারা স্থায়ীভাবে শরী'আতের আহ্কামের পরিচয় লাভ সম্ভব নয়।

* * * * *

www.iscalibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ঈমান ও আকাইদ বিষয়ক)

ঈমান ও আকাইদ সংক্রান্ত কয়েকটি পরিভাষার ব্যাখ্যা

❐ ঈমান/ايمان ঃ

"ঈমান" শব্দের আভিধানিক অর্থ অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় রাসূল (সাঃ) কর্তৃক আনীত ঐ সকল বিষয়াদি যা স্পষ্ট ভাবে এবং অবধারিত রূপে প্রমাণিত, সে সমুদয়কে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে বিশ্বাস করা এবং মুখে তা স্বীকার করা (যদি স্বীকার করতে বলা হয়) ও মেনে নেয়া। আর কুরআন হাদীছ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের অবধারিত বিষয়গুলো (بديهيات)-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা। সংক্ষেপে ও সাধারণ কথায় ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়।

❐ আকীদা (عقيدة) ঃ

শব্দটি عقد থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করা। ইসলামের পরিভাষায় "আকীদা" অর্থ দৃঢ় ও মজবূত ঈমান, অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক খবরাখবর ও বিষয়াবলীর প্রতি মনের অটল বিশ্বাস। "আকীদা" শব্দের বহুবচন আকাইদ। এ'তেকাদ (اعتقاد) শব্দটিও আকীদা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ'তেকাদ (اعتقاد) শব্দের বহুবচন এ'তেকাদাত (اعتقادات)।

www.iscalibrary.com

❐ মু'মিন/مؤمن ঃ

যার মধ্যে ঈমান আছে তাকে মু'মিন বলা হয়।

❐ ইসলাম/اسلام ঃ

"ইসলাম" শব্দের আভিধানিক অর্থ মেনে নেয়া, আনুগত্য করা। শরী'আতের পরিভাষায় ইসলাম বলা হয় (ঈমানসহ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে মেনে নেয়া। সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক আনীত ধর্মকে ইসলাম বলা হয় বা ধর্মীয় কর্মকে ইসলাম বলা হয়।

বিঃ দ্রঃ 'ঈমান' ও 'ইসলাম' শব্দ দুটো সমার্থবোধক ভাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

❐ মুসলমান/মুসলিম ঃ

'ইসলাম' ধর্ম অনুসারীকে মুসলমান বা মুসলিম বলা হয়।

❐ কুফ্‌র/كفر ঃ

যে সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখাকে ঈমান বলা হয়, প্রকাশ্যে তার কোন কিছুকে মুখে অস্বীকার করা বা তার প্রতি অন্তরে বিশ্বাস না রাখা হল কুফ্‌র।

❐ কাফের/كافر ঃ

যার মধ্যে কুফ্‌র থাকে সে হল 'কাফের'।

❐ শির্‌ক/شرك ঃ

আল্লাহর যাত (ذات/সত্তা) তাঁর ছিফাত (صفات/গুণাবলী) এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক বা অংশীদার বানানো হল শির্‌ক।

❐ মুশ্‌রিক/مشرك ঃ

যে শির্‌ক করে তাকে বলা হয় মুশ্‌রিক।

❐ নিফাক/মুনাফিকী ঃ

মুখে ঈমান প্রকাশ করা, প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করা অথচ অন্তরে কুফর প্রচ্ছন্ন রাখা-এরূপ কপটতাকে বলা হয় নিফাক বা মুনাফিকী।

❐ মুনাফিক/منافق ঃ

যে মুনাফিকী করে তাকে বলা হয় মুনাফিক।

❐ মুলহিদ/যিন্‌দীক-ملحد/زنديق ঃ

যে ব্যক্তি মৌলিক ভাবে ও প্রকাশ্যে ইসলাম এবং ঈমান-এর অনুসারী, কিন্তু নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বদীহী ও অবধারিত বিষয়গুলোর এমন ব্যাখ্যা দেয়, যা কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য-বিরুদ্ধ, এরূপ লোক প্রকৃত মু'মিন মুসলমান নয়। কুরআনের পরিভাষায় এরূপ লোককে বলা হয় মুল্‌হিদ আর হাদীছের পরিভাষায় তাকে বলা হয় যিন্‌দীক। কারও কারও ব্যাখ্যা মতে সব ধরনের ধর্মবিরোধী বা মুশ্‌রিকদেরকেও যিন্‌দীক বলা হয়। যারা দাহ্‌রী বা নাস্তিক, তাদেরকেও যিন্‌দীক বলা হয়ে থাকে।

www.iscalibrary.com

❐ মুরতাদ/مرتد ঃ

ইসলাম ধর্মের অনুসারী কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করলে কিংবা ঈমান পরিপন্থী কোন কথা বললে বা কাজ করলে তাকে মুরতাদ বলে। সংক্ষেপে মুরতাদ অর্থ ধর্মত্যাগী।

❐ ফাসেক/فاسق ঃ

প্রকাশ্যে যে ব্যক্তি গোনাহে কবীরা করে বেড়ায় তাকে বলা হয় ফাসেক। আবার ব্যাপক অর্থে সব ধরনের অবাধ্যকে ফাসেক বলা হয়। এ হিসেবে একজন কাফেরকেও ফাসেক বলা যেতে পারে, যেহেতু সেও অবাধ্য।

❐ আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত (اهل السنة والجماعة) ঃ

এ সম্পর্কে দেখুন "আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সম্বন্ধে আকীদা" শীর্ষক আলোচনা, পৃষ্ঠা নং ১৭৩।

আকাইদের প্রকার ও স্তরগত পার্থক্য

আকাইদের কিতাব সমূহে উল্লেখিত ইসলামী আকীদা সমূহ মূলত ঃ তিন প্রকার।[১] যথাঃ

১. যে সব আকীদা নিশ্চিত (يقينى وقطعى) ভাবে প্রমাণিত। এগুলি আবার তিন শ্রেণীর। যথাঃ

(এক) যা কুরআনের জাহেরী ইবারত দ্বারা প্রমাণিত।

(দুই) যার মূল বিষয়টা নবী (সাঃ) থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনায় (চাই হাদীছের লফজ মুতাওয়াতির হোক বা না হোক) প্রমাণিত।

(তিন) যে ব্যাপারে উম্মতের এজমা (اجماع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চাই তার দলীল নিশ্চিত (قطعى) হোক বা না হোক। আমাদের জানা থাকুক বা না থাকুক।[২]

এই প্রথম প্রকারের তিন শ্রেণীর যে কোন শ্রেণীর কোন আকীদা অমান্যকারী ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত।

২.যে সব আকীদা যুক্তিগত দলীল প্রমাণ (دلائل عقليه) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং যার উপর শরী'আতের বুনিয়াদ বা শরী'আতের অধিকাংশ বিষয় যার উপর নির্ভরশীল। চাই তার সমর্থনে শরঈ দলীল থাকুক বা না থাকুক। যেমন আল্লাহ্র অস্তিত্ব। আল্লাহ্র গুণাবলী, নবুওয়াতের প্রমাণ, জগতের অনিত্বতা ইত্যাদি।

এই প্রকারের আকীদার হুকুম প্রথম প্রকারের আকীদার ন্যায়। তবে এসব ক্ষেত্রে আরও কিছু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে যেমন আত্মার নিত্বতা বা অনিত্বতার বিষয়, আল্লাহ্র গুণাবলী কি তাঁর সত্তার হুবহু (عين ذات) না সত্তা থেকে ভিন্ন (غير ذات)-এর বিষয়। এছাড়া এই দ্বিতীয় প্রকারের আকীদা সমূহের প্রারম্ভিক কিছু আলোচনা রয়েছে। যেমন পরমাণু (جوهر فرد বা الجزء الذى لا يتجزى)-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা, শরীরের উপাদান নিত্ব কি না ইত্যাদি। এসব তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (تحقيقات علميه) ও প্রারম্ভিক বিষয়াদি (مسائل مبادية) যা ইল্‌মে

১. عبدالحق حقانى. عقائد الاسلام থেকে গৃহীত ॥ ২. কেননা, উম্মত বিশেষভাবে সাহাবা ও তাবিয়ীন কর্তৃক শরীয়ত বিরুদ্ধ কোন বিষয়ের উপর ঐক্যমত্য পোষণ অসম্ভব ॥

www.iscalibrary.com

কালামে বা আকাইদের কিতাবে প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। এগুলির ক্ষেত্রে জমহুরের বিরোধিতা কারীদেরকে আমরা ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত বলতে পারি না। তবে তারা জমহুর মুসলিমের বিরোধী।

৩. যে সব বিষয় খবরে ওয়াহেদ (خبر واحد) দ্বারা প্রমাণিত বা উলামায়ে কেরাম যা কুরআন হাদীছ থেকে গবেষণা (استنباط) সূত্রে বের করেছেন। যেমন কুরআন নিত্ব না সৃষ্ট-এই বিষয়। ফেরেশতাদের চেয়ে নবীদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার বিষয়। সাহাবীদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়। নেক আমল ঈমানের অংশ (جزء) কি না এ বিষয় প্রভৃতি। এসব বিষয়েই প্রধানতঃ ইসলামী ফিরকাগুলির মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ। এক্ষেত্রে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সাহাবা তাবিয়ীন ও সালাফে সালেহীনের অনুসরণ করে থাকেন।[১]

যে সব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়

মৌলিকভাবে যে সব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয় তা হল ৬ টি। তথাঃ

১. আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান।
২. ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমান।
৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান।
৪. নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান।
৫. পরকালের প্রতি ঈমান।
৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান।

এ ৬ টি বিষয় বিভিন্ন আয়াতে বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملئكته وكتبه ورسله الاية -

অর্থাৎ, রাসূলের প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, রাসূল ও মু'মিনগণ তার প্রতি ঈমান এনেছে। সকলেই ঈমান আনয়ন করেছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর (প্রেরিত) কিতাব ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ২৮৫)

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر الاية -

অর্থাৎ, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে নেকী শুধু এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং নেকী হল তাদের, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১৭৭)

انا كل شئ خلقنه بقدر -

অর্থাৎ, আমি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছি তাক্‌দীর মোতাবেক। (সূরাঃ ৫৪-কামারঃ ৪৯)

১. عقائد الاسلام. عبد الحق حقانى থেকে গৃহীত ॥

www.iscalibrary.com

وكل شئ عنده بمقدار -

অর্থাৎ, তাঁর নিকট সবকিছুর একটা নিদৃষ্ট পরিমাণ রয়েছে। (সূরাঃ ১৩-রা'দঃ ৮) এবং হাদীছে জিব্রীল নামক হাদীছে একত্রে এ ৬ টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

ما الايمان ؟ قال ان تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره -

(متفق عليه)

১. "আল্লাহ"-এর উপর ঈমান

বিশুদ্ধতম মতানুসারে "আল্লাহ" (الله) শব্দটি সৃষ্টিকর্তার ইস্মে যাত বা সত্তাবাচক নাম। আরবীতে বলা হয় ঃ

الله علم على الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع بجميع صفات الكمال -

অর্থাৎ, "আল্লাহ" ঐ চিরন্তন সত্তার নাম, যাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, যিনি সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী।

"আল্লাহ্" তা'আলার উপর ঈমান বলতে আল্লাহ্র যাত বা সত্তা ও তাঁর সিফাত বা গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করা এবং মেনে নেয়াকে বুঝায় ঃ

(ক) আল্লাহ্র সত্তা (যাত/ذات) ও তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ্র অস্তিত্বের যুক্তিগত প্রমাণ ঃ

আল্লাহ্র অস্তিত্বের যুক্তিগত প্রমাণ দিয়ে বলা হয় ঃ আমরা জানি যে, জগতের সবকিছু (আল্লাহ্র যাত ও সিফাত ব্যতীত আসমান যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু) অনিত্ব (حادث) বা সৃষ্ট।[১] আর সব অনিত্ব বা সৃষ্ট বস্তুর জন্য সৃষ্টিকর্তা (محدث) আবশ্যক। অতএব জগতের জন্যেও একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যক।[২]

১. জগতের সবকিছু অনিত্ব (حادث) হওয়ার প্রমাণ হল জগতের যে কোন বস্তু হয় মূল উপাদান (جوهر) হবে নতুবা অপ্রধান বিষয় (عرض)। যদি অপ্রধান বিষয় হয় তাহলে সেটা অনিত্বই। তন্মধ্যে কোন কোনটার অনিত্ব হওয়া ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিষয়, যেমন অন্ধকার চলে যাওয়ার পর আলো আসা, গরমের পর ঠান্ডা আসা ইত্যাদি। আর কোনটার অনিত্ব হওয়া এভাবে প্রমাণিত যে, অপ্রধান বিষয় (عرض) অস্তিত্বহীনতা (عدم) কে গ্রহণ করে অর্থাৎ, তা বিলীন (فانى) হয়ে যায় অথচ নিত্ব (قديم) জিনিস কখনও বিলীন (فانى) হয় না। অতএব প্রমাণিত হল যে, অপ্রধান বিষয় (عرض) নিত্ব- (قديم) নয় বরং অনিত্ব (حادث)। আর যদি মূল উপাদান (جوهر) হয়, তাহলে মূল উপাদান সমূহও অনিত্ব। কেননা মূল উপাদান (جوهر) হয় শরীর (جسم) হবে নতুবা পরমাণু (جوهر فرد বা الجزء الذى لايتجزى) যা-ই হোক, তা গতি/স্থিতি (حركت وسكون) কে গ্রহণ করে থাকে বিধায় তা অনিত্ব (حادث)। কারণ গতি/স্থিতি (حركت وسكون) হল অপ্রধান বিষয় (عرض) আর যার মধ্যে অপ্রধান বিষয় (عرض) বনাম অনিত্বতা (حدوث) পাওয়া যায় তা অনিত্বই হয়ে থাকে। নতুবা অনিত্বকে নিত্ব বলা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। এখন রয়ে গেল (পরবর্তি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

www.iscalibrary.com

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দলীল সম্পর্কে মনীষীদের কয়েকটি উক্তি

* কতিপয় যিন্দীক (নাস্তিক গোছের লোক) হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) কে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তোমরা আমাকে একটা বিষয় একটু ভাবতে দাও। কতিপয় লোক আমাকে এই মর্মে একটা সংবাদ দিল যে, একটা সমুদ্রে ব্যবসার মালামাল বোঝাই একটা নৌকা কোন মাঝি ছাড়াই আপনা আপনি চলছে, সমুদ্রের ঢেউ চিরে সন্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। কারও কোনরূপ পরিচালনা ছাড়াই ইচ্ছামত সেটি তার গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে। একথা শুনে তারা ইমাম সাহেবকে বলল কোন বদ্ধ পাগল ছাড়া এমন কথা কেউ বলতে পারে না। তখন ইমামে আযম আবূ হানীফা (রহঃ) বললেন ঃ

(পূর্ববর্তি পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা) প্রত্যেকটা শরীর (جسم) বা পরমাণু (جوہر فرد বা الجزء الذی لا یتجزی)-এর জন্য গতি/স্থিতি (حرکت وسکون) অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টি। তা এভাবে যে, শরীর (جسم) বা পরমাণু (جوہر فرد)-এর জন্য একটি স্থান (حیز) থাকা আবশ্যক। এখন এই মুহূর্তের পূর্বে থেকেই যদি সেই স্থানে তার অবস্থান চলে আসতে থাকে, তাহলে বলতে হবে সেটা স্থিতিশীল (ساکن) অর্থাৎ, তার মধ্যে স্থিতি (سکون) বিদ্যমান নতুবা সেটা গতি সম্পন্ন (متحرک) অর্থাৎ, তার মধ্যে গতি (حرکت) বিদ্যমান ॥

২. এই যুক্তির মধ্যে জগতের সবকিছুকে অনিত্ব প্রমাণিত করে তার জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়েছে। এখন যদি জগতের কোন বস্তুর বাস্তব প্রকৃতিকেই কেউ অস্বীকার করে এবং বলে জগতের কোন কিছুর বাস্তব প্রকৃতি বা حقیقۃ الشیٔ আছে বলে আমাদের জানা নেই, তাহলে তার সামনে এই যুক্তি অচল। যেমন এক শ্রেণীর গ্রীক দার্শনিক (حکماء یونان) বলেছিল জগতে কোন বস্তুর حقیقۃ الشیٔ বা বাস্তব প্রকৃতি আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই শ্রেণীর দার্শনিকদেরকে বলা হয় সফিষ্ট (سوفسطائیہ)। এদের মধ্যে আবার ৩টি উপদল ছিল। যথা ঃ

১. যারা জিদ ও হটকারিতা পুর্বক বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি (حقیقۃ الشیٔ)কেই অস্বীকার করত। তারা বলত কোন বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি বলতে কিছু নেই, এগুলো সব কল্পনা। এদেরকে বলা হত হটকারী (عنادیہ)।

২. যারা বস্তুর বাস্তব প্রকৃতিকে সমূলে অস্বীকার না করলেও তারা বলত বস্তুর প্রকৃতি কোন প্রতিষ্ঠিত বিষয় নয় বরং তা আমাদের বিশ্বাসনির্ভর। অর্থাৎ, তারা মনে করত প্রত্যেক বস্তু তাই, আমরা যেটাকে যা মনে করি। যেমন বৃক্ষকে আমরা মানুষ মনে করলে সেটাই মানুষ ইত্যাদি। এদেরকে বলা হয় অত্মবিশ্বাসবাদী (عندیہ)।

৩. যারা বলত কোন্‌টার বাস্তব প্রকৃতি কি তা আমরা নিশ্চিত জানি না। বরং সবকিছুর মধ্যে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। এমনকি তারা বলত আমাদের সন্দেহের ব্যাপারেও আমাদের নিশ্চিত জানা নেই, বরং সন্দেহের ব্যাপারেও আমরা সন্দিহান। এদেরকে বলা হত সংশয়বাদী (لا ادریہ)। (شرح عقائد) ॥ এদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "গ্রীক দর্শন" শিরোনামের আলোচনা।

www.iscalibrary.com

তাহলে এই মহা উর্ধ্বজগত ও অধঃজগত এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী এই বিশাল সৃষ্টিরাজির কোন সৃষ্টিকর্তা থাকবে না তা কি করে হয়? তখন লোকগুলো লা-জওয়াব হয়ে যায়।[১]

* হযরত ইমাম শাফিই (রহঃ) কে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এই দেখ তুত গাছের পাতা। প্রত্যেক পাতার স্বাদ ও গুণ অভিন্ন। কিন্তু এই তুত গাছের পাতা রেশম পোকা আহার করলে সে পাতা রেশম হয়ে বের হয়, মধু পোকায় আহার করলে তা মধু হয়ে বের হয়ে আসে, গরু-ছাগলে আহার করলে গোবর হয়ে বের হয় আর হরিণে আহার করলে মৃগনাভী কস্তুরী হয়ে বের হয়। অথচ বস্তু এক। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই সুক্ষ্ম কারিগরি কার ? নিশ্চয়ই এর পেছনে একজন কারীগর রয়েছেন। তিনিই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ।[২]

* ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌নে হাম্বল (রহঃ) কে স্রষ্টার অস্তিত্বের দলীল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি একটি ক্ষুদ্র আকারের মসৃণ দূর্গ দেখতে পাই, যাতে আসা-যাওয়ার কোন পথ এমনকি কোন ছিদ্র পর্যন্ত ছিল না। তার উপরটা দেখতে রূপার ন্যায় শুভ্র আর ভিতরটা স্বর্ণের ন্যায়। তারপর এক সময় সে দূর্গটি বিদীর্ণ হয় এবং তার দেয়াল ফেটে ফুটফুটে একটি বাচ্চা বের হয়ে আসে। অর্থাৎ, ডিমের ভিতর থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসে।[৩]

ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (রহঃ) বোঝাতে চেয়েছেন যে, এমন একটি দূর্গ সদৃশ ডিম থেকে বের হয়ে সে তার শত্রু মিত্রকে চিনতে সক্ষম হয়। তাই সে চিল কাকের উপদ্রবকালে মায়ের ডানায় আশ্রয় নেয়। যে বাচ্চা ডিমের ভিতর কোন দানাপানি দেখেনি, সে বের হয়ে এসেই নিজের খাদ্য চিনতে পারে। ডিমের ছিদ্রহীন বদ্ধ ঘরে এই বাচ্চাটিকে এতসব কে শিখালো ? যিনি শিখিয়েছেন তিনিই আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টিকর্তা।

* এক চরকাওয়ালী বুড়িকে জিজ্ঞেস করা হয়, জীবন তো শেষ হলো চরকা কেটে কেটে, স্রষ্টার পরিচয় পেয়েছো কি ? সে উত্তরে বলে, হ্যাঁ, এই চরকাই তো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। যতক্ষণ ঘুরাই, কেবল ততক্ষণই ঘুরে। নয়তো স্থির হয়ে যায়। তাই বুঝতে বাকী নেই যে, এই ক্ষুদ্র চরকার জন্য যদি চালকের আবশ্যক হয়, তবে এই বিরাট বিশ্ব-ভূবনের জন্য কি চালকের দরকার নেই ?[৪]

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দলীল সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কয়েকটি উক্তি

* ডঃ জন ক্লীভল্যান্ড কথর‍্যান বলেন, "বিশ্বের অন্যতম প্রধান পদার্থ বিজ্ঞানবিদ লর্ড কেলভীন নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন, "আপনি যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করবে।" আমাকে অবশ্য স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমিও তার এই উক্তির সাথে সম্পূর্ণ একমত।

তিনি আরও বলেন, "রসায়ন শাস্ত্র এই তথ্য প্রকাশ করে যে, জড় পদার্থ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হচ্ছে। কতক খুব ধীরে ধীরে আবার কিছু অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বলা চলে, জড় পদার্থের অস্তিত্ব শাশ্বত নয়।"

১. فتح الملهم جـ١/ ॥ ২. ايضا ॥ ৩. ايضا ॥ ৪. হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্ধ, আহ্‌মদ শফী ॥

www.iscalibrary.com

অতএব, নিশ্চয়ই জড় পদার্থের একটা আরম্ভও রয়েছে। এখন কথা হচ্ছে এই জড়জগত যখন নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারেনি, তখন স্বীকার করতে হয় যে, সৃষ্টির এই কাজ নিশ্চয় অজড় কোন প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে এবং এই প্রতিনিধি নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার অধিকারী।

* ডোনাল্ড হেনরী পোটার বলেন, "আমার বক্তব্য হল, যদি এই ধারাবাহিক সৃষ্টি সম্পর্কিত থিউরী সমর্থন করতে হয়, তাহলে আমি অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ্‌কে স্বীকার করব।" তিনি আরও বলেন, "প্রকৃতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে কোন কিছুই বিবেচনা করা হোক না কেন, একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে সকল বিষয়ে সক্রিয় বিবেচনা করা হোক না কেন, একজন বিজ্ঞানী হিসেবে সকল বিষয়ের প্রধান ভূমিকায় আল্লাহ্‌কে বসিয়ে আমি পরম সন্তুষ্টি লাভ করি। প্রতিটি ছবিতে (ক্ষেত্রে) আল্লাহ্ হচ্ছেন মূল চরিত্র। আর যে সব প্রশ্নের আজও জবাব দেয়া হয়নি, একমাত্র তিনিই তার জবাব।"

* পল ক্ল্যারেন্স ইবার সোল্ড বলেন, "ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিক ফ্যান্সিস বেকন তিন শতাব্দীরও আগে বলেছিলেন, সামান্য দর্শন জ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়। আর গভীর দর্শন জ্ঞান তাকে ধর্মের পথে টেনে আনে।"

পল ক্ল্যারেন্স আরও বলেন, "মানব জাতির অভ্যুদয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষকে লক্ষ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা দাঁড়ায়, তার চাইতেও বেশী সংখ্যক চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু প্রতিটি ব্যক্তিস্বতন্ত্র এইসব রহস্যময় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, কোন্ সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা, কোন্ অনন্ত শক্তিশালী মানুষ এই অন্তহীন মহাবিশ্বকে পরিচালনা করেন ? জীবন ও মানুষের অভিজ্ঞতার মূলে অথবা বাইরে কি আছে ?

আল্লাহ কোন অর্থেই শারীর নন। তাই শারীরিক উপলব্ধি দিয়ে তাঁকে বোঝানো মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এই সঙ্গে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক প্রমাণ বিদ্যমান। এবং তিনি যে বুদ্ধি, জ্ঞান ও শক্তিতে বর্ণনাতীত, তাঁর সৃষ্টি সে কথাই সাক্ষ্য দিচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, "মানুষ ও এই মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ শূন্যতা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়নি। নিশ্চয় এসবের আরম্ভ আছে এবং তজ্জন্য একজন আরম্ভকর্তাও রয়েছেন"।

* মারলিন বুকস ক্রীডার বলেন, "সাধারণ মানুষ হিসেবে এবং বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও গবেষণায় জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার মনে আদৌ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ আছেন। তবে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। গবেষণাগারের নিয়ম মাফিক পারা যায় না তাঁকে কোন প্রকার বিশ্লেষণ বা পুংখানুপুং-খরূপে বিচার করে দেখা। তিনি হচ্ছেন অপ্রাকৃতিক, আত্মিক, প্রজ্ঞাবান, সৃজনশীল, সর্বশক্তির আধার।"

মারলিন বুকস ক্রীডার বলেন, "তাঁর (আল্লাহ্‌র) অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যদিও আমরা সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি না, তবুও আমরা মানুষ ও প্রকৃতিতে তাঁর অস্তিত্বের অগণিত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে, তা নিয়ে গবেষণা করতে পারি। আমার মনে হয়, ঐ সব প্রমাণ যেমন সুস্পষ্ট তেমনি বিশ্বাসজনক।"

www.iscalibrary.com

* জর্জ আর্ল ডেভিস বলেন, "একজন পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে এই মহাবিশ্বের অবিশ্বাস্য জটিল কাঠামোর যৎকিঞ্চিৎ দেখার সুযোগ হয়েছে আমার, যার ক্ষুদ্রতম পরমাণুর অভ্যন্তরীণ প্রাণস্পন্দন বৃহত্তম নক্ষত্রের বিশাল কর্মতৎপরতার তুলনায় কোন অংশেই কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। যেখানে প্রতিটি আলোকরশ্মি, প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বিক্রিয়া, প্রতিটি প্রাণীর প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য একই অপরিবর্তনীয় আইনাবলীর নির্দেশ মোতাবেক আত্মপ্রকাশ ও নিজস্ব পথে পরিচালিত হয়ে থাকে।"

তিনি আরও বলেন, (প্রতিপক্ষের ধারণা মতে) "যদি একটি মহাবিশ্ব নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে বাধ্য হয়েই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, এই বিশ্বই খোদা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। তবে এখানে এক অদ্ভুতরূপে আল্লাহ্‌কে কল্পনা করা হচ্ছে - আল্লাহ্‌র আধ্যাত্মিক ও জড় উভয়রূপে। আমি কিন্তু এমন এক আল্লাহ্‌র কথা চিন্তা করতে পছন্দ করি, যিনি নিজের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য রেখে একটি জড় জগতকে সৃজন করেন নি। কিন্তু তাঁরই সৃষ্টি সেই বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আছেন।"

* ডঃ অস্কার লিও ব্রউয়ার বলেন, "মহাবিশ্বের বিশাল আকার এবং নক্ষত্র-মণ্ডলী ও অগণন সংখ্যা ও কল্পনাতীত জড়পিণ্ডের ওজন সম্পর্কিত আমাদের আলোচনা ফিরে এসে এবং এই সকল নক্ষত্র গ্রহ পরিচালনাকারী আইনাবলীর বিধিতত্বের কথা চিন্তা করে যখন দেখি, আমাদের কমিউনিষ্ট বন্ধুরা যাদের নিয়ে গোটা মানব জাতির একটা বিরাট অংশ গড়ে উঠেছে, তারা "আল্লাহ্ যে আছেন"- এ চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, তখন সত্যিই অদ্ভুত লাগে না কি ? অকমিউনিষ্ট বিশ্বেরও শিক্ষিত সমাজের একটা বিরাট অংশ আল্লাহ্‌কে অবজ্ঞা করে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছেন দেখলে তাও তেমনি অদ্ভুত লাগে না কি ?"

তিনি আরও বলেন, "নাস্তিকতার অর্থ হচ্ছে দ্বন্দ্ব আর যুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমি এর কোনটিই চাই না। থিউরী হিসেবে আমি নাস্তিকতাকে অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত বলে মনে করি।"

* ডঃ ইরভিং উইলিয়াম নবলচ বলেন, "আমি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী। যে জন্য বিশ্বাস করি তার কারণ হচ্ছে, আমি মনে করি না সর্বপ্রথম ইলেকট্রোন অথবা প্রথম প্রোটোন অথবা প্রথম পরমাণু বা প্রথম এনিমো-এসিড অথবা প্রথম প্রোটোপ্লাজম অথবা প্রথম বীজ অথবা সর্বপ্রথম মস্তিস্কটির জন্মের জন্য কেবল দৈব দায়ী। আমার কাছে এসব কিছুর মূলে আল্লাহ্‌র পবিত্র অস্তিত্বই একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা হতে পারে।" তিনি আরও বলেন, "বিখ্যাত মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ অলিবার ওয়েনডেল এক সময় বলেছিলেন যে, "জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে, বিজ্ঞান ততই ধর্মকে ভ্রুকুটি করা থেকে বিরত হয়। বিজ্ঞানকে উপযুক্ততার সাথে বুঝতে পারলে দেখা যাবে, সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে বিজ্ঞানই অধিক থেকে অধিকতর সম্ভাবনাময় করে তোলে।"

* ডঃ মার্লিন গ্র্যান্ট স্মীথ বলেন, "আমার কথা হচ্ছে এ আল্লাহ্ কোন এক অনির্বচনীয়, চঞ্চলমতি স্বর্গীয় বা ইথারীয় সত্তা নয়। অনেক যুগে আর অনেক স্থানে অতি উৎসাহী সব মন থেকে উদ্ভুত কাল্পনিক সাজানো গল্পের চেয়ে অনেক সুসামঞ্জস্য সত্তা। অধিকন্তু এক

www.iscalibrary.com

আল্লাহ্ হচ্ছেন বাইবেলে বর্ণিত আল্লাহ্ যাঁকে সকল পয়গম্বর ও তাঁদের বাণীর প্রচারকগণ বিশ্বাস এবং বর্ণনা করেছেন।"

তিনি আরও বলেন, "মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে সকল যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ অশিক্ষিত সরল অথবা জ্ঞানীআর বৈজ্ঞানিকগণ এ সাক্ষ্য দিয়ে এসেছেন যে, তারা যথার্থই তাদের অন্তরাত্মায় আল্লাহ্র উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন। আমরা তাদের সে সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে কি করব ? বর্জন করব ? অবজ্ঞা করব ? অগণিত মানুষ যে "অবর্ণনীয় আনন্দ ও গৌরব" লাভ করেছেন, আমরা কি তাকে দৃষ্টির আড়াল করে চাপা দিয়ে রাখব ? শহীদ আর ধর্মপ্রাণ ও ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছে, তাঁদের যে ঈমান নিঃসঙ্গতার মধ্যে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে, অহরহ কষ্ট স্বীকার করিয়েছে, সকল নির্যাতন সহ্য করিয়েছে, মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করতে দিয়েছে, আমরা কি সে সম্পর্কে নির্লজ্জের মত উদাসীন থাকতে পারি ? পারি আপন মনে এ কথা বলতে - সে সবই ভুল ? আমার কথা হচ্ছে, আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ্ আছেন এবং যারা তাঁকে অধ্যবসায় সহকারে পাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি তাদের জন্য মহা পুরস্কার দাতা।" (হিব্রু ১১ ঃ ৬)

* জন এডল্ফ বুয়েহ্লার বলেন, "আজকের দিনের বিজ্ঞানের বিশ্বাস - যে প্রাকৃতিক আইন আমাদের গ্রহকে পরিচালনা করে, মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহগুলিও সেই একই আইনানুসারে পরিচালিত। যে দিকে আমরা তাকাই, সর্বত্র আমাদের নজরে পড়ে সুকল্পিত পরিকল্পনা, ক্রম এবং সমন্বয়। তাই আমার মনে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ এক মনীষা এসব কিছুর পরিকল্পনা করেছেন, সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এ মহাবিশ্বকে এর নির্দিষ্ট গন্তব্য পথে পরিচালনা করেছেন।"

* ডঃ আলবার্ট ম্যাক্কম্রস উইনচেষ্টার বলেন, "অনেকের কাছেই বিজ্ঞান ও ধর্ম হচ্ছে দু'টি বিরুদ্ধ শক্তি। কেউ যদি একটিকে আঁকড়ে ধরে, এদের মতে তাহলে অন্যটিকে বর্জন করতে হয়। আজ আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে একথাই বলছি যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে অধ্যয়ন আর গবেষণার পর আল্লাহ্তে আমার বিশ্বাস শিথিল না হয়ে আরো জোরদার হয়েছে এবং পূর্বাপেক্ষা আরও মজবূত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নয়া আবিস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র মর্যাদা আর শক্তিমত্তা সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি দান করে, তা আরো জোরদার হয়।"

* ডোনাল্ড রবার্টকার বলেন, "আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার পক্ষে খোলা মন নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ অসম্ভব। এটা অপর পক্ষে অবৈজ্ঞানিক শোনাবে। আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন। তারপর আমি খাঁটি বিজ্ঞান সম্মত ধরনের কতিপয় মন্তব্য পেশ করব। তিনি বলেন, ভূ-রসায়ন সম্পর্কিত গবেষণা ব্যাপক আকারে সমুদয় বস্তুর প্রতি নজর দিতে শিক্ষা দিয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসের কোটি কোটি বছরের প্রতি একবার চিন্তা নিবদ্ধ করতে, যে মহাশূন্য মহাবিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে, আরেক বার তার দিকে এবং সর্বশেষ বিশ্বব্যাপী আবর্তনের যে প্রক্রিয়া বিদ্যমান, তাকেও অবলোকন করতে শিক্ষা দেয়। সব কিছুর বিশালত্বই মানুষকে আল্লাহ্র মহত্বকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে, হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে"।

www.iscalibrary.com

* ডঃ ক্লাড এম হ্যাথাওয়ে বলেন, "আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস সম্পর্কিত আমার যুক্তিসঙ্গত কারণসমূহ সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে আমি বলতে চাই যে, আল্লাহ্‌তে আমার যে বিশ্বাস-তার অধিকাংশই জীবনের এ বয়সে, যাকে অভিজ্ঞতা বলে উল্লেখ করা যায়, তার উপর প্রতিষ্ঠিত।"

তিনি আরও বলেন, "পরিকল্পনার জন্যে একজন পরিকল্পকের প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তে আমার বিশ্বাসের এ মৌলিক যুক্তিযুক্ত কারণটি আমার ইঞ্জিনিয়ারিং অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেকখানি সমর্থিত হয়েছে। অতএব, এমনি অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের চারিদিকে দুনিয়ায় যে কল্পনাতীত পরিকল্পনা ছড়িয়ে আছে, তা দেখে এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অসীম মনীষার অধিকারী পরিকল্পকের কাজ ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তাই আসতে পারে না। নিঃসন্দেহে এ একটি পুরানো যুক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ এমন এক যুক্তি, যাকে আধুনিক বিজ্ঞান পূর্বাপেক্ষা আরও অধিকতর অখণ্ডনীয় করে তুলেছে।"

* সিসিল বয়েস হ্যাম্যান বলেন, "বিজ্ঞান জগতের যেদিকেই আমি দৃষ্টি ফিরাইনা কেন, সর্বত্র পরিকল্পনা, আইন, ও শৃঙ্খলার - সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য দেখতে পাই। সূর্যোকরোজ্জ্বল রাস্তা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যান এবং সেই সঙ্গে ফুলের অত্যন্ত খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যগুলো একবার লক্ষ্য করুন, মন দিয়ে রবিন পাখীর মিষ্ট গান শুনুন (আর চিন্তা করুন) পতঙ্গকে আকর্ষণকারী ফুলের যে মধু তা কি আকস্মিকভাবে ফুলের মধ্যে পৌঁছেছে ? পতঙ্গ যে আগামী বছর আরও ফুল জন্মানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল তা কি আকস্মিকভাবে হলো ? অতি ক্ষুদ্র পুষ্পরেণু ফুলের গর্ভকোষের মধ্যে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হয়ে যে বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, এটাও কি মামুলি দৈব ব্যাপার বলে উল্লেখ করা চলে ?"

তিনি আরও বলেন, "একবার নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালে সেখানকার সুশৃঙ্খল দৃশ্য দেখে আমাদেরকে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। রাতের পর রাত, ঋতুর পর ঋতু, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মহাশূন্যের সকল জগত আকাশ পথে নিজ নিজ কক্ষে এগিয়ে চলেছে। তারা নিজ কক্ষ পথে নির্দিষ্ট স্থানে এমন নির্ভুলভাবে ফিরে আসে যে, বহু শতাব্দী আগেও সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারতো। এরপরেও কি এমন কোন ব্যক্তি থাকতে পারেন, যিনি এগুলিকে দৈবক্রমে একত্রীভূত জ্যোতিষ্ক জাতীয় পদার্থ বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, উদ্দেশ্যহীনভাবেই এগুলি আকাশ মার্গে বিচরণ করছে ?[১]

* নিউটন বলেন, "বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়ে স্থান ও কালের হাজার হাজার বিপ্লব অতিক্রম করেছে। তা সত্ত্বেও তাতে যে শৃঙ্খলা ও সুনিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়, তা একজন নিয়ন্ত্রক ছাড়া সম্ভব নয়। এ নিয়ন্ত্রকই হলেন সর্বাদি সত্তা, জ্ঞানবান ও শক্তিমান মহান আল্লাহ।"

* দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, "এ রহস্যগুলো নিয়ে যতই চিন্তা ভাবনা করি ততই সূক্ষ্ম বলে মনে হয়। এতে নিশ্চিত বুঝা যায় যে, মানুষের উপর এমন একটি চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী ক্ষমতা রয়েছে, যেখান থেকে হয়েছে সকল বস্তুর উৎপত্তি।"

১. বৈজ্ঞানিকদের এ উক্তিসমূহ 'চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব' গ্রন্থ থেকে সংকলিত ॥

www.iscalibrary.com

* ক্যামিল প্রামারিয়ন বলেন, "কোন শিক্ষাগুরুই এটা বুঝতে পারছেন না যে, বিশ্বের অস্তিত্ব কি করে হল এবং কিভাবে তা অটুট রয়েছে ? বাধ্য হয়ে তাঁরা এমন একজন স্রষ্টা স্বীকার করে নিলেন, যিনি সদা বিরাজমান ও সক্রিয়।"

* অধ্যাপক লিনি বলেন, "শক্তিমান ও বুদ্ধিমান আল্লাহ নিজ অদ্ভুত কারিগরির মহিমা নিয়ে আমার সামনে এভাবে উদ্ভাসিত হল যে, আমার চোখ দুটি তার প্রতি পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং আমি পুরোপুরি তন্ময় হয়ে পড়ি। প্রত্যেকটি বস্তুতেই, তা যতই ছোট হোক না কেন, তাঁর অদ্ভুত শক্তি, আশ্চর্য কৌশল ও বিচিত্র অনবদ্যতা পরিলক্ষিত হয়।"[১]

আল্লাহ্‌র যাত বা সত্তার প্রতি ঈমান/বিশ্বাস রাখার পর্যায়ে কয়েকটি মৌলিক বা বুনিয়াদী বিষয়

আল্লাহ্‌র যাত বা সত্তার প্রতি ঈমান/বিশ্বাস রাখার পর্যায়ে কয়েকটি মৌলিক বা বুনিয়াদী বিষয় রয়েছে। যথা ঃ

১. তাঁর সত্তা সমস্ত গুণাবলীসহ আপনা আপনি অস্তিত্বশীল।

২. তাঁর সত্তা এমন, যিনি নিজ সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত তবে কোন নিদৃষ্ট স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট বা নিদৃষ্ট স্থানে সমাহিত ও গণ্ডিবদ্ধ নন। তিনি স্থান ও কালের গণ্ডি হতে মুক্ত। কারণ স্থান হয়ে থাকে দেহ বিশিষ্ট বস্তুর জন্য, আর আল্লাহ তা'আলা দেহ থেকে পবিত্র। তাঁর কোন স্থান নেই অর্থাৎ, না তিনি আসমানে থাকেন, না যমীনে, না পূর্বে না পশ্চিমে। সমগ্র জগত তাঁর সামনে একটা অনু পরিমাণ বস্তু সমতুল্য, তিনি কিভাবে তার মধ্যে সমাহিত হতে পারেন ? বরং তিনি সর্বত্র বিরাজমান। কোন স্থানের কোন কিছু তাঁর অগোচর নয়।

৩. তিনি عرض অর্থাৎ, কোন দেহের সাথে সংযুক্ত বিষয় নন। কেননা عرض বলা হলে তাঁর সত্তার সূচিত বিষয় বা অনিত্ব (حادث) হওয়া অবধারিত হয়ে যায়, অথচ আল্লাহ্‌র সত্তা নিত্ব বা قديم। অর্থাৎ যা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। তদুপরি عرض বললে যার সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট, তাঁকে তার মুখাপেক্ষী বলতে হয়, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন।

৪. তিনি কোন উপাদান (جوهر) গঠিত দেহ বিশিষ্ট নন। কেননা দেহ (جسم) একাধিক অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্‌র দেহ স্বীকার করলে তাঁর একাধিক অংশ স্বীকার করতে হয়। আর একাধিক অংশের ক্ষেত্রে এক অংশ অপর অংশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা মুখাপেক্ষিতা হতে পবিত্র।

৫. তাঁর সত্তা ডান-বাম, উপর-নীচ, সন্মুখ-পশ্চাত ইত্যাদি দিক হতে মুক্ত। কেননা এতে করে আল্লাহ্‌র নিদৃষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ হওয়া অবধারিত হয়ে যায়। তদুপরি এতে করে আল্লাহ্‌র অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও দেহ সাব্যস্ত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্‌র উপর আছে বলতে গেলে

১. বাতিল যুগে যুগে -মুহাঃ ইসহাক ফরিদী থেকে সংকলিত ॥

www.iscalibrary.com

তাঁর মাথা আছে বলতে হয়, কেননা উপর বলা হয় মাথার দিককে। এমনিভাবে তাঁর নীচ আছে বলতে গেলে তাঁর পা আছে বলতে হয়, কেননা নীচ বলা হয় পায়ের দিককে। ইত্যাদি। সারকথা তিনি নিরাকার। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন " মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা ফিরকা" শীর্ষক আলোচনা। পৃঃ ৭১।

৬. আল্লাহ্ তা'আলা সূরত-আকৃতি, দিক ও প্রান্ত থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও পরকালে দৃষ্টিগোচর হবেন। দুনিয়াতে তাঁর সত্তার দর্শন সম্ভব, তবে সংঘটিত হয়নি। পরকালে দৃষ্টিগোচর হওয়ার দলীল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة -

অর্থাৎ, সেদিন (কিয়ামতের দিন) কতক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরাঃ ৭৫-কিয়ামাহঃ ২২-২৩)

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য "আল্লাহ্র দীদার প্রসঙ্গ" শীর্ষক আলোচনা দেখুন।

৭. আল্লাহ্র সত্তা কারও সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না বা প্রবেশ (حلول) হয় না এবং তাঁর সত্তার মধ্যেও কেউ মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না। খৃষ্টানদের ধারণায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে প্রবেশ حلول করেছিলেন অর্থাৎ, অবতারিত হয়েছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাস মতে ঈশ্বর মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ পাথর সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেন অর্থাৎ, অবতারিত হন।এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে হুলুলিয়া (حلولية) বলা হয়। এরূপ বিশ্বাস কুফ্রী। মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী বলেন ঃ যেসব মূর্খ লোকেরা বলে, আল্লাহ্র খাস ওলীগণ আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে এমনভাবে লীন হয়ে যান, যেমন বরফ পানির মধ্যে এবং বিন্দু দরিয়ার মধ্যে লীন হয়ে যায়, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফ্র।[১]

(খ) আল্লাহ্র সিফাত অর্থাৎ, গুণাবলীতে বিশ্বাস করা। আল্লাহ্র গুণাবলী তাঁর গুণবাচক নামসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। নিম্নে আল্লাহ্র সিফাত এবং তৎসঞ্জাত ও তৎ সংশ্লিষ্ট আকীদা সমূহ উল্লেখ করা হল। তবে উল্লেখ্য যে, সিফাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত (اجمالى) ঈমানই যথেষ্ট। বিস্তারিত জানা উলামায়ে কেরামের জন্য আবশ্যকীয়।

আল্লাহ্র ছিফাত বা গুণ প্রকাশক নাম এবং তৎসঞ্জাত ও তৎসংশ্লিষ্ট আকীদা সমূহ

আল্লাহ্র সিফাত বা গুণ প্রকাশক ৯৯টি নাম রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বিস্তারিত গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে। এরূপ ৯৯ টি নাম এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও তৎসঞ্জাত আকীদাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. الحى (আল-হায়্যু)- চিরঞ্জীব;

২. القيوم (আল-কায়্যুম)-স্বপ্রতিষ্ঠ, সংরক্ষণকারী;

* আল্লাহ্ তা'আলা চিরঞ্জীব (الحى)। চিরঞ্জীব না হলে পরবর্তীতে সৃষ্টি হওয়ায় তিনি মাখলূকে পরিণত হয়ে যান।

১. عقائد الاسلام عبد الحق حقانى ॥

www.iscalibrary.com

* আল্লাহ্ তা'আলা চিরকাল থেকে আছেন, তাঁকে কেউ প্রতিষ্ঠিত করেননি। বরং তিনি নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত। তিনি সমস্ত সৃষ্টির সত্তা ও গুণাবলীর অস্তিত্ব দানকারী ও তার সংরক্ষণকারী (القيوم)। সারকথা- সবকিছুর অস্তিত্ব তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁর অস্তিত্ব কারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم الاية

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, স্ব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বধাতা। তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা, আর না নিদ্রা। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ২৫৫)

৩. الحق (আল-হাক্কু)- সত্য

* তিনি প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং হক মা'বূদ। তাঁর খোদায়ী এবং শাহানশাহী সত্য ও যথার্থ। তিনি ব্যতীত আর সব মিথ্যা ও বাতিল।

৪. الاول (আল-আওয়ালু)-প্রথম অর্থাৎ, অনাদি;

৫. الاخر (আল-আখিরু)-শেষ অর্থাৎ, অনন্ত,

৬. الباقى (আল-বাকীউ)-চিরস্থায়ী

* তিনি অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান (الاول) অর্থাৎ, তাঁর অস্তিত্ব অনাদিকাল থেকে বিরাজমান। তাঁর অস্তিত্বে কখনও অনস্তিত্ব ছিল না। তাঁর সত্তা অনাদি (قديم)।

قال الله تعالى : هو الاول والاخر -

অর্থাৎ, তিনিই আদি এবং তিনিই অন্ত। (সূরাঃ ৫৭-হাদীদঃ ৩)

* আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত অন্য কোন কিছু অনাদি (قديم) নয়। যারা মৌলিক উপাদান (مادة/ هيولى), সূরত (صورت) , বুদ্ধি (عقول) ও আসমান সমূহকে অনাদি (قديم) বলে থাকে, ইমাম গাযালীর মতে তারা কাফের।

* তাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী (واجب الوجود) হওয়ার কারণেই তাঁর অস্তিত্ব সদা সর্বদা টিকে থাকবে। অর্থাৎ, তিনি চির বাকী (الباقى) অনন্ত । তিনি যেমন অনাদি (الاول), তেমনি অনন্ত (الاخر)। তাঁর অস্তিত্বে যেমন কখনও অনস্তিত্ব ছিল না, কখনও অনস্তিত্ব আসবেও না।

قال تعالى :كل شئ هالك الا وجهه -

অর্থাৎ, তাঁর (আল্লাহ্র) সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল। (সূরাঃ ২৯-আনকাবূতঃ ৮৮)

وقال تعالى : ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام -

অর্থাৎ, অবশিষ্ট থাকবে কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরাঃ ৫৫-রহ্মানঃ ২৭)

৭. الظاهر (আয্ যাহিরু)-প্রকাশ্য;

৮. الباطن (আল-বাতিনু)-গুপ্ত;

* আল্লাহ্র অস্তিত্ব দেখা যায় না, তাঁর অস্তিত্ব গোপন। অর্থাৎ, তিনি গুপ্ত (الباطن)।

* তাঁর অস্তিত্ব সুক্ষ্ম ও গুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টির অনু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্বের ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন বহন করে চলেছে। এ হিসেবে তিনি প্রকাশ্য (الظاهر)।

www.iscalibrary.com

قال الله تعالى : هو الاول والاخر والظاهر والباطن -

অর্থাৎ, তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত। (সুরাঃ ৫৭-হাদীদঃ ৩)

৯. العليم (আল-আলীমু)-মহাজ্ঞানী;

১০. الخبير (আল-খবীরু)-সর্বজ্ঞ;

১১. اللطيف (আল-লাতীফু)-সূক্ষ্ম;

* আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকূলের সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত ও জ্ঞানী। কোন কিছু তাঁর থেকে গোপন নয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন কিছু তাঁর জানার আওতা থেকে বাইরে নয়।[১]

* সমগ্র মাখ্লূকের ক্ষুদ্র-বৃহৎ, জাহের-বাতেন সর্ব বিষয়ে তিনি অবগত। অর্থাৎ, তিনি মহাজ্ঞানী (العليم)। কেউ কেউ বলেছেন যিনি বাতিনী বিষয় (امورباطنه) জানেন, তাকে خبير বলে এবং সাধারণ ভাবে জাননেওয়ালাকে عليم বলে।[২]

قال الله تعالى : ان الله بكل شئ عليم -

অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (সূরাঃ ৮-আনফালঃ ৭৫)

و قال : لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموت ولا فى الارض ولا اصغر من ذالك ولا اكبر . الاية -

অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ কোন কিছু তাঁর অগোচর নয়। (সূরাঃ ৩৪-সাবাঃ ৩)

وقال : عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم -

অর্থাৎ, তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সর্ব বিষয়ের পরিজ্ঞাতা। তিনি অত্যন্ত মেহেরবান, অতি দয়ালু। (সূরাঃ ৫৯-হাশ্রঃ ২২)

وقال : ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين-

অর্থাৎ, তিনি পানি ও স্থলভাগে যা আছে সে সম্বন্ধে অবগত। বৃক্ষের একটা পাতা পতিত হলেও, মাটির অন্ধকারে কোন দানা (গজাতে) থাকলেও এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ যা কিছুই আছে সব সম্বন্ধে তিনি অবগত। সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফূজে) রয়েছে। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ৫৯)

১. কোন কোন গ্রীক দার্শনিকের ধারণা ছিল আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন যায়েদ, ওমর, বক্র প্রমুখের সামগ্রিক অবস্থা সম্বন্ধে অবগত, তবে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় (جزئيات) সম্বন্ধে বিশেষ সময়ে অবগত নন। ইয়াহুদী, খৃষ্টান প্রমুখ ধর্মাবলম্বীদের আকীদা থেকেও অনুরূপ মনে হয় যে, তাদের ধারণায় খোদা কোন কোন বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না। ॥ عقائد الاسلام . عبد الحق حقانى

২. ॥ عقائد الاسلام . ادريس كاندهلوى-

www.iscalibrary.com

* আল্লাহ তা'আলা যখন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তখন সবকিছুর যাবতীয় জ্ঞান অবশ্যই তাঁর থাকবে। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে অনবগত থাকবেন তা অসম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير -

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি অবগত নন? তিনি সুক্ষ্ম, সর্বজ্ঞ। (সুরাঃ ৬৭-মুল্‌কঃ ১৪)

* আল্লাহ্‌র জ্ঞান অনাদি (قديم)। তিনি অনাদিকাল থেকে সর্ববিষয়ে অবগত। ভবিষ্যতে তাঁর মাখ্‌লূকের মধ্যে যা সৃষ্টি হবে বা যেসব অনিত্ব বিষয় (امر حادث) ঘটবে, সেসব বিষয়ে তাঁর অনাদি জ্ঞান (علم ازلى) রয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞানে অনিত্ব কোন বিষয়ের জ্ঞান সংযোজিত হয় না। বরং যে কোন ঘটিত অনিত্ব বিষয় সম্বন্ধে অনাদিকাল থেকেই তিনি অবগত।

* গায়েব সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ্‌র খাস সিফাত বা গুণ। অতীত ও ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, যা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন।[১]

* তিনি সবকিছুর জাহের বাতেন সম্বন্ধে যেমন অবগত, তেমনিভাবে সবকিছুর হাকীকত ও স্বরূপ সম্বন্ধেও অবগত। অর্থাৎ, তিনি সর্বজ্ঞ (الخبير)।

* আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে হাজির-নাজির জানা স্পষ্ট গোমরাহী ও বাতিল পন্থা। যারা বলে নবী কারীম (সাঃ) সর্বত্র হাজির-নাজির কিংবা তিনি গায়েব সম্পর্কে অবগত, (عالم الغيب) তারা কুরআন বুঝতে অপারগ সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব মীলাদের মজলিসে রাসূল (সাঃ)-এর হাজির হওয়া এবং এ ধারণার ভিত্তিতে কিয়াম করা (দণ্ডায়মান হওয়া) নিছক কল্পনা এবং বিভ্রান্তি।[২]

* তিনি সুক্ষ্মদর্শী (اللطيف) অর্থাৎ, এমন গোপন ও সুক্ষ্ম বিষয়ও তিনি অনুভব করেন যেখানে দৃষ্টি পৌঁছতে সক্ষম নয়।

قال تعالى : وهو اللطيف الخبير -

অর্থাৎ, তিনি সুক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। (সূরাঃ ৬৭-মুল্‌কঃ ১৪)

১২. الحكيم (আল-হাকীমু) প্রজ্ঞাময়;

* আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত। যেহেতু তিনি সবকিছুর যাহের বাতেন এবং সবকিছুর প্রকৃত স্বরূপ ও মূল রহস্য সম্বন্ধে অবগত। এ হিসেবে তাঁর জ্ঞান পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত। তাঁর এই পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতেই তাঁর সব কাজ-কর্ম ও কথা হয়ে থাকে প্রজ্ঞাময়। অতএব তিনি হেকমতওয়ালা (الحكيم) বা প্রজ্ঞাময়। হেকমত (حكمت) বলা হয় পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে কাজ-কর্ম এবং কথা যথাযথ ও পাকাপোক্ত হওয়া।[৩]

১. بدائع الكلام. مولانا المفتى يوسف التاؤلوى ॥
২. প্রাগুক্ত থেকে গৃহীত ॥
৩. عقائد الاسلام ، ادريس كاندهلوى - ॥

www.iscalibrary.com

قال الله تعالى : عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير -

অর্থাৎ, তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সর্ব বিষয়ের পরিজ্ঞাতা। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ৭৩)

১৩. الواسع (আল-ওয়াছিউ)-সর্বব্যাপী;

* তাঁর জ্ঞান ও দান সবটাই ব্যাপক। তাঁর জ্ঞান ও দানের আওতা থেকে কোন কিছু বাইরে নয়। তিনি তাঁর জ্ঞান ও নেয়ামত দিয়ে সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন এ অর্থে তিনি সর্বব্যাপী (الواسع)।

১৪. الملك (আল-মালিকু)-অধিপতি, সম্রাট,

১৫. مالك الملك (মালিকুল মুল্ক)-সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক;

* তিনি সকলের সম্রাট বা অধিপতি এবং সবকিছুর প্রকৃত মালিক। অতএব তিনি যা যেভাবে ইচ্ছা তৈরি করেন। সবকিছুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও সবকিছু পরিচালনার ব্যাপারে তিনি একচ্ছত্র ইচ্ছার অধিকারী (مختار مطلق)।

قال تعالى : وربك يخلق ما يشاء ويختار -

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। (সূরাঃ ২৮-কাসাসঃ ৬৮)

وقال تعالى : ان الله يفعل ما يشاء -

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান করেন। (সূরাঃ ২২-হাজ্জঃ ১৮)

* তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী (مالك الملك)। অতএব তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন হুকুম করবেন, যেমন ইচ্ছা তেমন হস্তক্ষেপ করবেন, কেউ তাঁর হুকুম ও হস্তক্ষেপে বাঁধ সাধতে পারবে না। তিনি রাজাধিরাজ, তাই যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করবেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নিবেন।

قال تعالى : فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ -

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহান ঐই সত্তা, যার হাতে সর্ব বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা। (সূরাঃ ৩৬-ইয়াসীনঃ ৮৩)

وقال : قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء..... الاية

অর্থাৎ, তুমি বল হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। (সূরাঃ ৩ আলু-ইমরানঃ ২৬)

* তিনি সকলের মালিক আর সকলে তার গোলাম। তাই মালিক হিসেবে গোলামকে তিনি যে হুকুম করবেন এবং তাদের ব্যাপারে যে হস্তক্ষেপ করবেন তাতে জুলুমের প্রশ্ন উঠতে পারে না। বিনা অপরাধেও যদি তিনি কাউকে শাস্তি দেন তাতেও কোন জুলুমের প্রশ্ন উঠতে পারবে না।[১] কারণ জুলুম বলা হয় অন্যের মালিকানায় তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ

১. এ ব্যাপারে মু'তাযিলাদের ভিন্ন মত রয়েছে। দেখুন মু'তাযিলা শিরোনাম। ॥

www.iscalibrary.com

করাকে।[১] আর সবকিছুই আল্লাহ্‌র মালিকানা। তবে হ্যাঁ নেক কাজের উপর তিনি পুরস্কার দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আর সে ওয়াদা অবশ্যই তিনি পূরণ করবেন। আল্লাহ্ কোন ওয়াদা খেলাপ করেন না।

ان الله لا يخلف الميعاد -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না। (সূরাঃ ১৩-রা'দঃ ৩১)

ومن اصدق من الله قيلا -

অর্থাৎ, কথায় আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে আছে ? (সূরাঃ ৪-নিছাঃ ১২২)

* আল্লাহ্ তা'আলা মহা সম্রাট, রাজাধিরাজ। যা ইচ্ছা, যাকে যেমন ইচ্ছা হুকুম করেন, যেমন ইচ্ছা রাজ্য পরিচালনা করেন। এই হুকুম প্রদান ও রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বাকশক্তি (কালাম সিফাত) তাঁর রয়েছে। তাই আল্লাহর কালাম (كلام) সিফাত (গুণ) প্রমাণিত। তদুপরি বাকশক্তি না থাকা একটি দোষ। আর আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সব দোষ থেকে মুক্ত, তাই তাঁর বাকশক্তি থাকা অপরিহার্য। কুরআনে কারীম দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম (كلام) সিফাত প্রমাণিত। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وكلم الله موسى تكليما -

অর্থাৎ, আল্লাহ মূসা-র সাথে কথা বলেছেন। (সূরাঃ ৪-নিছাঃ ১৬৪)

* কালাম বা বাকশক্তি তাঁর সত্তাগত একটি গুণ। এবং এটি তাঁর সত্তার ন্যায় অনাদি। তবে তাঁর কথার কোন আওয়াজ নেই, কোন অক্ষর নেই। কালাম দুই ধরনেরঃ

(এক) কালামে নফ্‌সী বা সত্তাগত কালাম। এটা অনাদি।

(দুই) কালামে লফ্‌জী বা উচ্চারণগত কালাম। এটি অনাদি নয়।

আল্লাহ্‌র যে কালামকে অনাদি কালাম বলা হয় তা দ্বারা উদ্দেশ্য কালামে নফ্‌সী। কালামে নফ্‌সী ও কালামে লফ্‌জী-র মধ্যে পার্থক্য হল - কালামে নফ্‌সীর কোন অক্ষর বা শব্দ নেই। পক্ষান্তরে কালামে লফ্‌জী হল অক্ষর ও শব্দ সমন্বিত ।[২] তাঁর কথা অন্য কারও কথার মত নয়, যেমন তাঁর অস্তিত্ব অন্য কারও অস্তিত্বের মত নয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ليس كمثله شئ -

অর্থাৎ, তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। (সূরাঃ ৪২-শূরাঃ ১১)

১. عقائد الاسلام ، ادريس كاندهلوى ॥

২. কোন কোন মুহাক্কিকের মতে আল্লাহ্‌র কালামের শব্দ এবং উচ্চারণ আছে, শ্রোতা যা শুনতে পায়। তবে এটা তাঁর কালামের নিত্বতা-- (قدامت)কে ক্ষুন্ন করে না। এতদসত্ত্বেও নিত্ব এভাবে যে, নিত্ব হল তাঁর কালামের সত্তাগত ধরন (نوع كلام)। বিশেষ আকৃতি এবং বিশেষ শব্দকে নিত্ব বলা হয় না। তবে তাঁর কালামের শব্দ ও উচ্চারণ থাকায় এ কথা আদৌ বোঝায় না যে, তাঁর কথা বলার জন্য আমাদের মত মাংসখণ্ড বিশিষ্ট জিহ্বা থাকা অপরিহার্য। কেননা তাঁর শব্দ ও উচ্চারণ অন্য কারও মত নয়। মুল্লা আলী ক্বারী شرح فقه اكبر গ্রন্থে আইম্মায়ে হাদীছ ও আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে এই মত বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। عقائد الاسلام. عبد الحق حقانى ॥

www.iscalibrary.com

* আল্লাহ্‌র কালাম-সিফাত সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তাস্থিত কালাম (كلام نفسى) অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান (قديم)। এমনিভাবে তাঁর সমস্ত গুণাবলীই অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। অন্যথায় আল্লাহকে অনিত্ব বিষয়ের আধাঁর (محل حوادث) বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর তা অসম্ভব।

১৬. المعز (আল-মুইয্‌যু) সম্মানদাতা;

১৭. المذل (আল-মুযিল্লু)-অপমানদাতা বা সম্মানহরণকারী ;

* তাঁর একচ্ছত্র অধিকার স্বীকৃত। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দিবেন, কারণ সম্মান প্রদান তাঁর এখতিয়ারে। তিনি সম্মানদাতা (المعز)।

* আবার যাকে ইচ্ছা তার থেকে সম্মান ছিনিয়ে নিবেন, কারণ অপমান প্রদান বা সম্মানহরণও তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি অপমানদাতা (المذل)। তবে আল্লাহ্ তা'আলা কারও অকল্যাণ করেন না, তাঁর কাছে কল্যাণই কাম্য।

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير -

অর্থাৎ, তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, যার থেকে ইচ্ছা সম্মান হরণ করে নাও। তোমারই হাতে কল্যাণ। (সূরাঃ ৩ আলু ইমরানঃ ২৬)

১৮. الخافض (আল-খাফিয়ু)-অবনতকারী;

১৯. الرافع (আর্-রাফিউ)-উন্নয়নকারী;

* যার যতটুকু সম্মান ও স্তর রয়েছে তার সেই সম্মান ও স্তরকে তিনি নতও করেন। তিনি الخافض (আল-খাফিয়ু)।

* আবার যার যতটুকু সম্মান ও স্তর রয়েছে তার সেই সম্মান ও স্তরকে তিনি উন্নতও করেন। তিনি الرافع (আর্-রাফিউ)।

এই নত ও উন্নত করার মধ্যে রিযিক হ্রাস বৃদ্ধি করাও অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে আছে ঃ

يخفض القسط ويرفعه - (متفق عليه)

২০. القادر (আল-ক্বাদিরু)-শক্তিশালী;

* তিনি তাঁর কোন কাজে উপকরণের মুখাপেক্ষী নন। কোন আসবাব ছাড়াই তাঁর সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে। সর্ববিষয়ে তিনি ক্ষমতাবান। ইরশাদ হয়েছে ঃ

قل هو القادر -

অর্থাৎ, বলে দাও তিনিই ক্ষমতাবান। (সূরাঃ ৬-আনআম ঃ ৬৫)

ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে খোদাকে সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান মনে করা হয় না। যেমন খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ)কে খোদা বলে জানে, অথচ তাদের ধারণা হল ঈসাকে ফাঁসীতে চড়ানো হয় এবং তিনি তখন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকেন। তাহলে দেখা গেল ঈসা খোদা বা খোদার অংশ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না বরং ইয়াহুদীদের হাতে নিহত হলেন। তাদের খোদা নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন না। ইয়াহুদীরা বলে আল্লাহ্ তা'আলা সারারাত্র ইয়াকূবের সাথে কুস্তি লড়তে থাকেন কিন্তু

www.iscalibrary.com

ইয়াকূব খোদাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেননি। হিন্দুদের ধারণায় খোদা অবতারদের মধ্যে প্রবেশ (طول) করেন অর্থাৎ, অবতারিত হন। অথচ লংকার রাজা রাবন অবতার রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে হরণ করে নিয়ে যায় আর রামচন্দ্র দীর্ঘদিন তার প্রেমে দিশেহারা হয়ে থাকেন, তার সন্ধান লাভ করতে পারেন না। অবশেষে সন্ধান পাওয়ার পর হনুমান প্রমুখের সাহায্য ব্যতীত তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হননি।[১]

২১. المقتدر (আল-মুকতাদিরু)-পূর্ণ ও স্বয়ংক্রীয় শক্তির অধিকারী;

* তাঁর ক্ষমতা স্বয়ংক্রীয় ক্ষমতা এবং ত্রুটিমুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা।

২২. القوى (আল-কাবিয়্যু)-অসীম ও অটুট ক্ষমতার অধিকারী;

* তিনি সীমাহীন ও অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর ক্ষমতা কখনও শেষ হবে না এবং কখনও তাতে কোন দূর্বলতা দেখা দেয় না।

২৩. المتين (আল-মাতীনু)-সুস্থিত এবং অসম ক্ষমতার অধিকারী;

* তাঁর ক্ষমতা সুস্থিত ও দৃঢ়, যাতে চিড় ধরার বা দূর্বলতা আসার কোন অবকাশ নেই। এবং কেউ তাঁর ক্ষমতার সমকক্ষ নেই।

২৪. العزيز (আল-আযীযু)-পরাক্রমশালী;

* তাঁর ক্ষমতা ও শক্তিবলে তিনি পরাক্রমশালী। সকলকে তিনি পরাভূত করতে সক্ষম, কেউ তাকে পরাভূত করতে বা কেউ তাঁর মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়।

২৫. المانع (আল-মানিউ)-প্রতিরোধকারী;

* আল্লাহ যা কিছুই করতে চান তা কেউ প্রতিহত করতে পারে না। তিনি কারও কল্যাণ করতে চাইলে তা কেউ ঠেকাতে পারে না, এমনি ভাবে কারও ক্ষতি করলে তাও কেউ প্রতিহত করতে পারে না। তিনি প্রতিরোধকারী (المانع)।

قال تعالى : وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله -

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত সেটা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। (সূরাঃ ১০-ইউনুসঃ ১০৭)

২৬. القهار আল-কাহ্হারু)-মহাপরাক্রান্ত;

* তাঁর ক্ষমতা ও বিক্রমের সামনে সকলে অক্ষম ও পরাভূত। তিনি মহাপরাক্রান্ত।

২৭. الجبار (আল-জাব্বারু)-প্রবলবিক্রমশালী;

* আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল বিক্রমশালী, কেউ তাঁকে অক্ষম করতে সক্ষম নয়।

২৮. السميع (আস্ সামীউ)-সর্বশ্রোতা;

২৯. البصير (আল-বাছীরু)-সম্যক দ্রষ্টা;

قال تعالى : الم يعلم بان الله يرى -

অর্থাৎ, মানুষ কি জানে না যে, অবশ্যই আল্লাহ দেখেন। (সূরাঃ ৯৬-আলাকঃ ১৪)

১. عقائد الاسلام . عبد الحق حقانى ॥

www.iscalibrary.com

وقال تعالى : والله بما تعملون بصير -

অর্থাৎ, তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ের সম্যকদ্রষ্টা। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ২৩৭)

وقال تعالى : وسيرى الله عملكم -

অর্থাৎ, অচিরেই আল্লাহ দেখবেন তোমাদের আমল। (সূরাঃ ৯-তাওবাঃ ৯৪)

وقال تعالى : وهو السميع البصير -

অর্থাৎ, তিনি সর্বশ্রোতা ও সম্যকদ্রষ্টা। (সূরাঃ ৫৭-হাদীদঃ ৪)

وقال تعالى : قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى -

অর্থাৎ, তিনি বললেনঃ (হে মূসা ও হারূণ!) তোমরা ভয় কর না; আমি তোমাদের সাথে রয়েছি; আমি শ্রবণ করি ও দেখি। (সূরাঃ ২০-তাহাঃ ৪৬)

* আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা (السميع)। সবকিছু তিনি শুনতে পান। একই সাথে আল্লাহ পাক সমস্ত আওয়াজ শুনতে পান; এক আওয়াজ অন্য আওয়াজ শোনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না।

* তিনি সর্বদ্রষ্টা (البصير)। সবকিছু তিনি দেখতে পান। এমনকি মনের চিন্তা বা কল্পনার গোপনীয় বিষয়ও তার অগোচর বা অদেখা নয়। একই সাথে তিনি সবকিছু দেখতে পান, এক দৃশ্য অন্য দৃশ্য দেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না।

قال تعالى : انه بكل شئ بصير -

অর্থাৎ, তিনি সর্ব বিষয়ের সম্যকদ্রষ্টা। (সূরাঃ ৬৭-মুল্‌কঃ ১৯)

৩০. الخالق (আল-খালিকু)- স্রষ্টা;

৩১. المبدى (আল-মুবদিউ)- আদি স্রষ্টা;

৩২. البارى (আল-বারিউ)- উদ্ভাবনকর্তা;

৩৩. المصور (আল-মুসাওবিরু)- আকৃতিদাতা;

৩৪. البديع (আল-বাদীউ)-নমূনা বিহীন সৃষ্টিকারী;

* আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ, তিনি خالق।

* তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং আদি সৃষ্টিকর্তা (المبدى)।

* সবকিছুর নমূনাও আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ভাবন করেছেন। অর্থাৎ, তিনি البارى।

* সবকিছুর আকৃতিও আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন। অর্থাৎ, তিনি المصور। বিভিন্ন রকম আকৃতি আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টি করা এসব আকৃতি একটা অন্যটা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।

هو الله الخالق البارى المصور الاية -

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ। তিনি সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, আকৃতি দানকারী। (সূরাঃ ৫৯-হাশ্‌রঃ ২৪)

www.iscalibrary.com

* জগত সৃষ্টি করার সময় তাঁর সামনে কোন আসল বা নমুনা ছিল না। কোন আসল ও নমুনা ছাড়াই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, তিনি البديع (নমুনা বিহীন সৃষ্টিকারী)

بديع السموت والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون -

অর্থাৎ, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (নমুনাবিহীন) সৃষ্টিকর্তা। যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন, 'হও', ব্যস তা হয়ে যায়। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১১৭)

* আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর সত্তা, সবকিছুর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমুদয়ের সৃষ্টিকর্তা। এমন নয় যে, তিনি শুধু একটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন অতপর তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে।

* আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তাদের কর্ম (افعال)-এরও সৃষ্টিকর্তা। মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা নয়।[১]

قل الله خالق كل شئ وهو الواحد القهار -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি একক, পরাক্রমশালী। (সূরাঃ ১৩-রা'দ ১৬)

* আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যা কিছু করেছেন সবকিছুর সাথে তাঁর ইরাদা সংশ্লিষ্ট। তাঁর ইরাদা ব্যতীত কোন কিছু অস্তিত্বে আসতে পারে না। তিনি ইরাদা করেন অতপর সেটাকে সৃষ্টি করেন। এমন নয় যে, তিনি ইরাদা করেন আর সেটা হয় না।

قال الله تعالى : فعال لما يريد -

অর্থাৎ, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। (সূরাঃ ৮৫-বুরূজঃ ১৬)

এমনকি হেদায়েত এবং গোমরাহীও আল্লাহ্র সৃষ্টি। আল্লাহ্র সিফাত হল ঃ

৩৫. النور (আন্ নূরু)- জ্যোতির্ময়;

৩৬. الهادى (আল-হাদীউ)-পথ প্রদর্শক;

* আল্লাহ তা'আলা জ্যোতির্ময় (النور) অর্থাৎ, হেদায়েত দানকারী ও পথ প্রদর্শক (الهادى)। তিনি যাকে ইচ্ছা পথ দেখান অর্থাৎ, হেদায়েত দান করেন যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন। মু'তাযিলাদের মত বক্তব্য নয় যে, বান্দার জন্য যা কল্যাণকর আল্লাহ্র উপর তা করা ওয়াজিব। অতএব হেদায়েত মানুষের জন্য কল্যাণকর বিধায় সকলকে হেদায়েত করা আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব। কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েতকে তাঁর ইচ্ছা (ارادة)-এর সাথে সংযুক্ত বলেছেন ঃ

ولو شاء لهدكم اجمعين -

অর্থাৎ, তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে হেদায়েত করতেন। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ১৪৯)

১. এ ব্যাপারে জাব্রিয়া ও কাদরিয়াদের মতবিরোধ রয়েছে। দেখুন জাবরিয়া ও কাদরিয়া শিরোনাম ॥

www.iscalibrary.com

وقال تعالى : وما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله . الاية

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত তারা ঈমান আনয়ন করার নয়। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ১১১)

وقال : فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء . الاية ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে হেদায়েত করতে চাইলে ইসলামের জন্য তার বক্ষ প্রশস্ত করে দেন। আর কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, তার কাছে ইসলামের অনুসরণ আকাশে আরোহণের ন্যায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ১২৫)

* আল্লাহ্‌র ইরাদা (ارادة) অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান (قديم)। যা কিছু তিনি ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি করবেন বা যা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যথাসময়ে ঘটবে তার সাথে তাঁর ইচ্ছা (ارادة) অনাদিকাল থেকেই বিজড়িত রয়েছে।

৩৭. الرشيد (আর-রাশীদু)- পথ প্রদর্শনকারী, সত্যদর্শী;

* তিনি শুধু পরকালের বিষয়ে পথ প্রদর্শনকারী নন বরং তিনি আর-রাশীদ বা জগতের পথ প্রদর্শনকারী অর্থাৎ, দ্বীনী ও দুনিয়াবী যাবতীয় বিষয়ে পথ প্রদর্শনকারী। তাঁর যাবতীয় পদক্ষেপ সত্য ও সঠিক। তিনি সত্যদর্শী (الرشيد)।

৩৮. المحيى (আল-মুহ্‌য়ী)-জীবনদাতা;

* সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে জীবন সঞ্চারকারীও তিনি। তিনিই জীবনদাতা المحيى (আল-মুহ্‌য়ী)। অন্য কেউ জীবনদাতা নয়। তিনি ব্যতীত কোন প্রাণীর মধ্যে আপনা আপনি কোন বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে জীবন সঞ্চারিত হয়নি। যারা বিবর্তন প্রক্রিয়ায় জীবন সৃষ্টি হওয়ার প্রবক্তা, তারা আল্লাহ্‌র এই সিফাতকে অস্বীকারকারী কাফের।

৩৯. الواحد (আল-ওয়াহিদু)-একক;

৪০. الاحد (আল-আহাদু)-এক অদ্বিতীয়;

* তিনি একক। তাঁর কোন দ্বিতীয় অর্থাৎ, শরীক বা সমকক্ষ নেই।[১]

১. অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে احد ও واحد সমার্থবোধক। কেউ কেউ এতদুভয়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে পার্থক্য করেছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যথাঃ

(১) واحد বা একক হল সত্তার ক্ষেত্রে আর احد হল গুণাবলীর ক্ষেত্রে।

(২) واحد অনাদিত্ব ও অনন্ততা বোঝায় আর احد গুণাবলীর ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়তার ইংগিত বহন করে।

(৩) واحد সৃষ্টির ও কর্মের ক্ষেত্রে শরীক না থাকা বোঝায়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

অর্থাৎ, তবে কি তারা আল্লাহ্‌র জন্য এমন শরীক সাব্যস্ত করেছে যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মাঝে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? তুমি বলে দাও আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি একক, মহাপরাক্রান্ত। (সূরাঃ ১৩-রা'দঃ ১৬)

এখানে সৃষ্টিকর্মে শরীক না থাকার কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে واحد গুণটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর احد অনাদিত্ব ও অনন্ততা জ্ঞাপন করে। যেমন ঃ (অবশিষ্ট টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.iscalibrary.com

والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم -

অর্থাৎ, আর তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, অতি দয়াময়। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১৬৩)

وقال تعالى : وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর রাজত্বে কোন অংশী নেই। আর দূর্বলতা হেতু তাঁর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন হয় না। সূতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম ঘোষণা কর। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ১১১)

* তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস করতে হবে। এই তাওহীদ বা একত্ব আল্লাহ্‌র সত্তার ক্ষেত্রে যেমন, তাঁর গুণাবলী ও ইবাদতের ক্ষেত্রেও তেমন। অর্থাৎ,

১. আল্লাহ্‌র সত্তা যেমন এক, তাঁর সত্তায় যেমন কেউ শরীক নেই, এটাকে বলা হয় توحيد فى الذات।

২. তেমনিভাবে তাঁর গুণাবলীতেও কেউ শরীক নেই এটাকে বলা হয় توحيد فى الصفات এবং

৩. একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে, ইবাদতেও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। এটাকে বলা হয় توحيد فى العبادة।

আল্লাহ্‌র সত্তায় কোন শরীক না থাকার পক্ষে (نقلى) দলীল হল ঃ

وما من اله الا اله واحد -

অর্থাৎ, একক ইলাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৭৩)

قل انما يوحى الى انما الهكم اله واحد -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও আমার নিকট এ মর্মে ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহতো একক ইলাহ। (সূরাঃ ১৮-কাহ্‌ফঃ ১১০)

عقلى বা যুক্তিগত দলীল হল ঃ

(১) শরীক থাকা দোষ। কেননা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আপনা আপনি যথেষ্ট না হলেই তার শরীকের প্রয়োজন হয়। আর স্বয়ংসম্পূর্ণ ও যথেষ্ট না হতে পারা ত্রুটি ও দোষ। আর আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। তাই তাঁর কোন শরীক নেই।

سبحانه وتعالى عما يشركون -

অর্থাৎ, তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও উর্দ্ধে। (সূরাঃ ৩৯-যুমারঃ ৬৭)

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা

قل هو الله احد - الله الصمد -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও তিনিই আল্লাহ, অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। (সূরা ঃ ১১২-ইখ্‌লাস ঃ ১-২)

এখানে আল্লাহ্‌র সত্তার অনাদিত্ব ও সমকক্ষতা না থাকার বর্ণনা প্রদানের বেলায় احد গুণটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইত্যাদি আরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে, বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য الا تحاف للزبيدى . جـ/২ ॥

www.iscalibrary.com

আর যখন তাঁর শরীক না থাকা প্রমাণিত তখন তাঁর সন্তানাদি না থাকাও প্রমাণিত। কেননা পুত্র পিতার শ্রেণীভূক্তই হয়ে থাকে। সেমতে আল্লাহ্‌র পুত্র থাকলে সেও খোদায়ীতে শরীক থাকবে। অথচ আল্লাহ্ শরীক থেকে পবিত্র।

سبحانه ان يكون له ولد -

অর্থাৎ, তাঁর কোন সন্তান থাকবে এ থেকে তিনি পবিত্র। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ১৭১)

(২)একাধিক খোদা থাকলে একজন কোন একটা বিষয় করার সিদ্ধান্ত নিলে অপরজন হয় সেটাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হতেন বা অক্ষম হতেন। সক্ষম হলে প্রথম জনকে দূর্বল বলতে হয়, আর দূর্বলকে খোদা মানা যায় না। পক্ষান্তরে অক্ষম হলে দ্বিতীয়জনকে খোদা বলা যায়না কেননা অক্ষমকে খোদা বলা যায় না। আর কেউ অক্ষম না হলে দুজনের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।

قال تعالى : لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا -

অর্থাৎ, যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধংস হয়ে যেত। (সূরাঃ ২১-আম্বিয়াঃ ২২)

(৩)একাধিক খোদা থাকলে প্রত্যেক খোদা তার মাখলূককে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপর থেকে বেনিয়ায হয়ে যেত। তাহলে কেউ আর খোদা থাকল না। কারণ যার থেকে অন্য কেউ বেনিয়ায হয়ে যেতে পারে সে আর খোদা আখ্যায়িত হওয়ার নয়। তাছাড়া তখন এক খোদা আরেক খোদার উপর চড়াও হত, কেননা খোদায়ীর দাবী হল উপরে থাকা। অথচ এমনটি দেখা যায় না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قال تعالى : وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض -

অর্থাৎ, তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ নেই। যদি থাকত, তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর চড়াও হত। (সূরাঃ ২৩-মু'মিনুনঃ ৯১)

তাওহীদের বিপরীত হল শির্ক। অতএব একাধিক মা'বুদে বিশ্বাস করা শির্ক। যেমন অগ্নিপূজক সম্প্রদায় কল্যাণের মা'বুদ হিসেবে 'ইয়াযদান' (يزدان)এবং অকল্যাণের মা'বুদ হিসেবে 'আহ্‌রমান' (اهرمن)কে বিশ্বাস করে। এটা শির্ক। এমনিভাবে খৃষ্টানরা ত্রিত্ববাদ (تثليث) তথা তিন খোদা থাকা-এর প্রবক্তা। উক্ত তিন খোদা হলঃ পিতা অর্থাৎ, আল্লাহ্, পুত্র অর্থাৎ, ঈসা (যীশু) [আঃ] এবং পবিত্রাত্মা অর্থাৎ, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বা মতান্তরে মরিয়াম (মেরি) [আঃ]। এর খন্ডনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد -

অর্থাৎ, যারা বলে আল্লাহ তিনের তৃতীয়, তারা কুফ্‌রী করল। একক ইলাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৭৩)

www.iscalibrary.com

হিন্দুগণ ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুকে পালনকর্তা এবং মহাদেবকে সংহারকর্তা বলে মানে; এভাবে তারা একাধিক ভগবানে বিশ্বাসী। এছাড়াও তারা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করে, তারা প্রায় ৩৩ কোটি দেবতায় বিশ্বাস করে। এটা শির্ক।

এমনিভাবে আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে কোন সৃষ্টিকে শরীক করা, যেমন মানুষের কোন কল্যাণ সাধন কিংবা বিপদ মোচন ইত্যাদি বিষয়ে কোন সৃষ্টিকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করা, এটা শির্ক।

এমনি ভাবে আল্লাহ্‌র সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করাও শির্ক, যেমন জলের (অর্থাৎ, গঙ্গার), সূর্যের, রামের, যীশুর, দেবতার ইত্যাদির পূজাঁ করা শির্ক।

৪১. المقيت (আল-মুকীতু)-আহার্যদাতা;

৪২. الرزاق (আল-আর্‌রায্‌যাকু)- রিযিক্‌দাতা;

* আল্লাহ্ তা'আলা মাখলূকের আহার্য দানকারী (المقيت)। শারীরিক (جسمانى) ও আত্মিক (روحانى) উভয় ধরনের আহার্য এর অন্তর্ভুক্ত।

* আল্লাহ্ তা'আলা রায্‌যাক (الرزاق) অর্থাৎ, রিযিক সৃষ্টিকারী ও রিযিক দানকারী। ইন্দ্রীয়গাহ্য (حسى) ও অতিরিন্দ্রীয় (معنوى) সব ধরনের রিযিক এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা যত মাখলূক সৃষ্টি করেছেন ও করবেন সকলের রিযিকের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ـ

অর্থাৎ, পৃথিবীতে বিচরণকারী সকলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই। (সূরাঃ ১১-হুদঃ ৬)

* প্রত্যেকে তার জন্য বরাদ্দকৃত রিযিক পুরোপুরি অর্জন করবে। কেউ তার রিযিক গ্রহণ করবে না বা অন্য কেউ তার রিযিক গ্রহণ করবে তা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ যার জন্য যে রিযিক বরাদ্দ করেছেন অবশ্যই সে সেটা গ্রহণ করবে অন্য কারও পক্ষে সেটা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। রিযিক বলতে হালাল হারাম উভয়টাকে বোঝায়। কেননা রিযিক বলা হয় যা আল্লাহ কোন প্রাণীর জন্য প্রেরণ করেন ও তার কাছে পৌছান। তবে সেটি হারাম হলে আল্লাহ তা পছন্দ করেন না।[১]

৪৩. الباسط (আল-বাসিতু)-সম্প্রসারণকারী;

৪৪. القابض (আল-কাবিযু)- সংকোচনকারী;

* রিযিকের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করে দেন। তিনি সম্প্রসারণকারী (الباسط)।

* যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করে দেন। তিনি সংকোচনকারী (القابض)। তবে এই সংকোচন বা সম্প্রসারণ তাঁর হেকমতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, স্বেচ্চাচারিতার ভিত্তিতে নয়।

قال تعالى : ان ربک يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ـ

১. نبراس ، شرح عقائد ॥

www.iscalibrary.com

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সীমিত করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ৩০)

وقال تعالى : نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا -

অর্থাৎ, আমি পার্থিব জীবনে তাদের মাঝে রিযিক বণ্ঠন করি এবং একজনের উপর অন্যজনের মর্যাদা উন্নিত করি, যাতে একে অপরকে অনুগত রেখে তার দ্বারা কাজ নিতে পারে। (সূরাঃ ৪৩-যুখরুফঃ ৩২)

৪৫. الفتاح (আল-ফাত্তাহু)- উমুক্তকারী;

* যাদের রিযিক বন্ধ আছে তাদের রিযিকের দুয়ার আল্লাহ্ তা'আলা খুলে দেন। এমনিভাবে যেকোন বিপদ-আপদ থাকলে বিপদের গিরা আল্লাহ্ তা'আলা খুলে দেন। তিনি উন্মুক্তকারী (الفتاح)।

৪৬. الحفيظ (আল-হাফীযু)-সংরক্ষণকারী;

* বিপদ আসার পর তা থেকে তিনি উদ্ধার করেন, আবার বিপদ-মুসীবত আসার পূর্বেও তা থেকে তিনি বান্দাকে হেফাযত ও রক্ষা করেন। তিনি সংরক্ষণকারী (الحفيظ)।

৪৭. المؤمن (আল-মু'মিনু)-নিরাপত্তা বিধায়ক;

* তিনি শুধু বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করা নয় বরং যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার এবং মাখলূকের জন্য নিরাপত্তা প্রদান ও নিরাপত্তার সরঞ্জাম যোগান দানকারী। এ অর্থে তিনি নিরাপত্তা বিধায়ক (المؤمن)।

৪৮. السلام (আস্-সালামু) নিরাপদ, শান্তিময়;

* তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার প্রয়োজন হয় না। বরং তিনি নিজে বিপদ-আপদ ও দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ এবং শান্তি দানকারী। তিনি নিরাপদ ও শান্তিময় (السلام)।

৪৯. المهيمن (আল-মুহাইমিনু)- নেগাহবান, রক্ষক;

* আল্লাহ্ তা'আলা সব জিনিসের নেগাহবান ও পাহারাদার (المهيمن)। তিনি সকলের সব অবস্থার প্রতি স্বযত্ন লক্ষ্য রাখেন।

৫০. الوالى (আল-ওয়ালী)-অধিপতি; অভিভাবক;

* শুধু রিযিক প্রদান, বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার ও রক্ষা নয়, তিনি সবকিছুর অধিপতি ও অভিভাবক, সবকিছুর ব্যবস্থাপক, সবকিছু সম্পাদনকারী (الوالى)।

৫১. الوكيل (আল-ওয়াকীলু)- কর্মবিধায়ক;

* আল্লাহ্ তা'আলা কর্মবিধায়ক অর্থাৎ, তাঁর নিকট যা কিছু সোপর্দ করা হয় তিনি তা সম্পাদনকারী। সে মর্মে আল্লাহ্র উপর কেউ ভরসা করলে তিনি তার কর্ম সম্পাদন করে দেন।

www.iscalibrary.com

৫২. الوهاب (আল-ওয়াহ্হাবু)- মহানুভবদাতা;

* আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাখলূককে যা কিছু দেন এক্ষেত্রে তাঁর কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ নেই, দুনিয়াতে একজন আরেকজনকে দেয়ার পশ্চাতে যেমন কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ কিংবা বিনিময় ছাড়াই দিয়ে থাকেন। তিনি হলেন মহানুভবদাতা (الوهاب)।

৫৩. الكريم (আল-কারীমু)-উদারদাতা;

* আল্লাহ্ তা'আলার দানের জন্য সওয়াল করারও প্রয়োজন হয় না। তিনি সওয়াল ছাড়াই নিজ উদারতায় দান ও অনুগ্রহ করে থাকেন। তিনি উদারদাতা (الكريم)।

৫৪. الغنى (আল-গানিয়্যু)- অভাবমুক্ত; মুখাপেক্ষিহীন;

* মাখলূকের রিযিক পৌঁছাতে গিয়ে এবং অন্য কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে তাঁর কখনও অভাব দেখা দেয় না, তিনি অভাব মুক্ত (الغنى)। এমনিভাবে কোন কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে তিনি কারও মুখাপেক্ষিও হন না। তিনি মুখাপেক্ষিহীন (الغنى)।

قال تعالى : يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد -

অর্থাৎ, হে মানুষেরা! তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন, প্রশংসিত। (সূরাঃ ৩৫-ফাতিরঃ ১৫)

আসমান যমীনের সবকিছুর যিনি মালিক তাঁর অভাব হতে পারার ধারণা অমূলক।

هو الغنى له ما فى السموت وما فى الارض الاية - (সূরাঃ ১০- ইউনুছঃ ৬৮)

অর্থাৎ, তিনি অভাবমুক্ত, আসমান যমীনে যা কিছু আছে, তার মালিকানা তাঁরই।

* মাখলূক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্র ইবাদত করবে তাদের নিজস্য প্রয়োজনে, এর জন্যে আল্লাহ্র কোন ঠেকা নেই। এর থেকেও আল্লাহ অভাবমুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন।

قال تعالى : ومن كفر فان الله غنى عن العلمين -

অর্থাৎ, কেউ কুফ্রী করলে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ জগৎবাসীর মুখাপেক্ষী নন। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ৯৭)

৫৫. المغنى (আল-মুগ্নীয়ু)-অভাব মোচনকারী;

* আল্লাহ্র অভাব হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না বরং তিনি সকলের অভাব মোচনকারী। অর্থাৎ., তিনি المغنى (আল-মুগ্নী)।

৫৬. الواجد (আল-ওয়াজিদু)-প্রাপক;

* আল্লাহ্ তা'আলা যা চান তাই পান অর্থাৎ, তাই হয়। এ অর্থে তিনি প্রাপক (الواجد)। কোন কিছু তাঁর থেকে অব্যাহতি পায় না, কোন কিছু তাঁর পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম নয়। অথবা এর ব্যাখ্যা হল তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

৫৭. النافع (আন্নাফিউ')-কল্যাণকারী;

৫৮. الضار (আয্যাররু)-অকল্যাণের মালিক;

www.iscalibrary.com

* তিনি কল্যাণ অ-কল্যাণ সবটার মালিক। তিনি যেমন কল্যাণকারী (النافع) তেমনি অকল্যাণকারী (الضار)ও। মু'তাযিলাগণ মনে করেন বান্দার জন্য যা উত্তম ও কল্যাণকর, আল্লাহ্‌র উপর তা করা জরূরী। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا ـ

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সকলে ঈমান আনয়ন করত। (সূরাঃ ১০-ইউনুছঃ ৯৯)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, হেদায়েত প্রত্যেকের জন্য কল্যাণকর, তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েতকে তার ইচ্ছার উপর মওকূফ বলেছেন এবং সকলকে তিনি হেদায়েত করেননি। অতএব বোঝা গেল (আমাদের দৃষ্টিতে) কল্যাণকর (বিবেচিত) হলেই তা আল্লাহ্‌র জন্য করা জরূরী নয়।

৫৯. البر (আল-বার্‌রু)-নেকময়;

* কল্যাণ-অ-কল্যাণ সবই আল্লাহ্‌র হাতে, তবে তিনি কারও অকল্যাণ করেন না বরং তিনি সকলের সাথে কল্যাণের আচরণ এবং নেকীর মুআমালা করেন তিনি নেকময় (البر)। অতএব যার ব্যাপারে আল্লাহ যা করেন তার মধ্যেই তার জন্য কল্যাণ নিহিত।

৬০. المميت (আল-মুমীতু)-মৃত্যুদাতা;

* আল্লাহ্ তা'আলা যেমন জীবনদাতা (المحيي), তেমনি মৃত্যুদাতা (المميت)ও তিনি। নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটবে। কিয়ামতের সময় শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে সকলের মৃত্যু ঘটবে।

৬১. الوارث (আল-ওয়ারিসু)-স্বত্বাধিকারী;

* সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার পর যখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন একমাত্র তিনিই থাকবেন সবকিছুর স্বত্বাধিকারী এবং মালিক (الوارث)। বাহ্যিকভাবে যারা দুনিয়ার অনেক কিছুর মালিক বলে মনে হত, তাদের কারও তখন কোন অস্তিত্বও থাকবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ

لمن الملک الیوم ؟ لله الواحد القهار ـ

অর্থাৎ, আজ রাজত্য কার ? এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র। (সূরাঃ ৪০-মু'মিনঃ ১৬)

৬২. المعيد (আল-মুঈদু)-পুনঃসৃষ্টিকারী;

৬৩. الباعث (আল-বা'ইছু)- পুনরুত্থানকারী;

৬৪. الجامع (আল-জামিউ)-একত্রকরণকারী;

* তারপর তিনি সকলকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তিনি পুনঃসৃষ্টিকারী (المعيد)। শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেয়ার পর সকলে পুনরায় জীবন লাভ করবে।

* তারপর তিনি সকলের পুনরুত্থান ঘটাবেন। তিনি পুনরুত্থানকারী (الباعث)।

* পুনরুত্থান পূর্বক তিনি সকলকে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য একত্রিত করবেন। তিনি একত্রকরণকারী (الجامع)।

www.iscalibrary.com

৬৫. الحسيب (আল-হাসীবু)-হিসাব গ্রহণকারী;

৬৬. المحصى (আল-মুহ্সী)-পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণকারী;

* কিয়ামতের ময়দানে সকলকে একত্রিত করে তিনি সকলের হিসাব গ্রহণ করবেন। তিনি হিসাব গ্রহণকারী (الحسيب)।

* এই হিসাব হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে। সে হিসাবে থাকবেনা বিন্দুমাত্র ত্রুটি। কেননা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণকারী (المحصى)। المحصى -এর আর এক অর্থ হল জগতের সৃষ্টিসমূহের যাবতীয় গণনা ও পরিমিতির ব্যাপারে তিনি সম্যক জ্ঞানী। তাঁর জ্ঞানের আওতা থেকে ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন কিছুই বহির্ভূত নয়।

৬৭. الشهيد (আশ-শাহীদু)- প্রত্যক্ষকারী;

* সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়ার জন্য সবকিছুর যাহের বাতেন প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক এবং এজন্য তার সর্বত্র হাযির-নাযির থাকা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বত্র হাযির-নাযির এবং তিনি সবকিছুর প্রত্যক্ষকারী (الشهيد)।

قال تعالى : والله شهيد على ما تعملون -

অর্থাৎ, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার প্রত্যক্ষকারী। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ৯৮)

কেউ কেউ বলেছেন যাহিরী বিষয় (امور ظاهره) জাননেওয়ালাকে الشهيد বলে এবং বাতিনী বিষয় (امورباطنه) জাননেওয়ালাকে خبير বলে।

৬৮. الرقيب (আর্ রাকীবু)-পর্যবেক্ষণকারী;

* তিনি শুধু প্রত্যক্ষ করেন না বরং ভালভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ, পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি পর্যবেক্ষণকারী (الرقيب)।

৬৯. الحكم (আল-হাকামু)-মীমাংসাকারী;

৭০. العدل (আল-আদ্লু)-ন্যায়নিষ্ঠ;

৭১. المقسط (আল-মুকসিতু)- ন্যায়পরায়ণ;

* হিসাব গ্রহণ পূর্বক তিনি ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছুর মীমাংসা করবেন। তিনি হলেন মীমাংসাকারী (الحكم)।

* আল্লাহ্র মীমাংসা অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে হবে। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ (العدل) ও ন্যায়পরায়ণ (المقسط)।

৭২. الشكور (আশ্ শাকূরু)- গুণগ্রাহী;

* তাঁর ন্যায্য বিচারে যে নেককার ও ভাল সাব্যস্ত হবে, তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন। তিনি গুণগ্রাহী (الشكور)। তিনি গুণের মুল্যায়ন করবেন। দুনিয়াতেও তিনি নেক কাজের কিছু পুরস্কার ও বদকাজের কিছু শাস্তি দিয়ে থাকেন। তবে পূর্ণ পুরস্কার ও পুর্ণাঙ্গ শাস্তি দিবেন পরকালে।

৭৩. الولى (আল-ওয়ালিয়্যু)-সাহায্যকারী, বন্ধু, অভিভাবক;

* আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে শান্তি দান করবেন এবং সাহায্য করবেন। তিনি সাহায্যকারী অভিভাবক অর্থাৎ, মুমিনদের সাহায্যকারী ও মুমিনদের অভিভাবক। দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের অভিভাবক।

www.iscalibrary.com

قال تعالى : الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمت من النور . الاية

অর্থাৎ, আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে (কুফ্‌রীর) বিবিধ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ২৫৭)

৭৪. ذو الجلال والاكرام (যুল জালালি ওয়াল ইক্‌রাম)

আযমত ও জালালের অধিকারী, একরাম করনেওয়ালা ;

* তিনি আযমত ও জালালের অধিকারী অর্থাৎ, তিনি মহিমাময়। তাঁর আযমত ও জালালের সামনে যারা আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তাঁর এতায়াত করে, তিনি তাদের সম্মানিত ও পুরস্কৃত করবেন কারণ তিনি মহানুভব, একরাম করনেওয়ালা।

৭৫. الودود (আল-ওয়াদূদু)-প্রেমময়;

* নেককার লোক এবং নেক কাজকে তিনি ভালবাসেন। এ অর্থে তিনি প্রেমময় (الودود)।

৭৬. المقدم (আল-মুকাদ্দিমু)-অগ্রবর্তীকারী;

৭৭. المؤخر (আল-মুআখ্‌খিরু)-পশ্চাদবর্তীকারী;

* যারা আল্লাহ্‌র দোস্ত তাদেরকে তিনি অগ্রবর্তী করে দেন, তিনি অগ্রবর্তীকারী (المقدم), আর যারা তাঁর দুশমন, তাদেরকে তিনি পশ্চাদবর্তী করে দেন। তিনি পশ্চাদবর্তীকারী (المؤخر)।

৭৮. المنتقم (আল-মুন্‌তাকিমু)-শাস্তিদাতা;

* নেককার, দোস্ত ও আপন লোকদেরকে তিনি পুরস্কার দান করবেন। পক্ষান্তরে যে বদকার সাব্যস্ত হবে, তাকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি হলেন শাস্তিদাতা (المنتقم)।

৭৯. الصبور (আস্ সাবূরু)- ধৈর্যশীল;

৮০. الحليم (আল-হালীমু)-সহিষ্ণু;

* আল্লাহ্ তা'আলা পাপের কারণে শাস্তিদাতা। তবে দুনিয়াতে তিনি সব পাপের কারণে শাস্তি দেন না। কারণ তিনি ধৈর্যশীল (الصبور) ও সহিষ্ণু (الحليم)। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মধ্যে পার্থক্য হল - ধৈর্যগুণ যখন নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন সেটাকে সহিষ্ণুতা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৮১. العفو (আল-'আফুউ)- ক্ষমাকারী;

৮২. الغفار (আল-গাফ্‌ফারু) পরম ক্ষমাশীল;

৮৩. الغفور (আল-গাফূরু)- পরম ক্ষমাকারী;

* আখেরাতে যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তাদের অনেককে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল (العفو)। ক্ষমার গুণ আল্লাহ্ তা'আলার অত্যন্ত বেশী। তিনি পরম ক্ষমাশীল (الغفار)। শির্‌ক ব্যতীত আর সব ধরনের পাপ ইচ্ছা হলে তিনি ক্ষমা করবেন বলে কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন।

www.iscalibrary.com

قال تعالى : ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাঁর শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ১১৬)

৮৪. التواب (আত্-তাওয়াবু)-তওবা কবূলকারী;

৮৫. المجيب (আল-মুজীবু)- কবূলকারী;

* ক্ষমা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তওবার নিয়ম করে রেখেছেন। কেউ তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। তিনি তওবা কবূলকারী (التواب)।

* শুধু তওবা নয় যে কোন বিষয়ে কেউ দুআ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার দুআ কবূল করেন। তিনি কবূলকারী (المجيب)।

قال تعالى : اجيب دعوة الداع اذا دعان الاية ـ

অর্থাৎ, আমি আহ্বানকারী-র আহ্বানে সাড়া দেই, যখন সে আমার কাছে আহ্বান জানায়। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১৮৬)

৮৬. الرحيم (আর রাহীম)- অতি দয়ালু;

৮৭. الرحمن (আর রাহ্মানু)-অত্যন্ত দয়াময়;

* সবকিছু আল্লাহ্র দয়ায় সংঘটিত হয়, কোন কিছু আল্লাহ্র উপর জরূরী নয়। আল্লাহ্র উপর কোন কিছু ওয়াজিব বা অবশ্যকরণীয় বলা হলে আল্লাহ্র এখতিয়ার (اختيار) রহিত হওয়া অবধারিত হয়ে যায়।[১]

৮৮. الرؤف (আর্-রাউফু) সীমাহীন দয়ালু ;

* রহ্মত ও দয়াগুণ তাঁর মধ্যে সীমাহীন। তিনি সীমাহীন দয়ালু (الرؤف)। الرؤف শব্দটি رأفة থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ প্রচন্ড দয়া (شدة الرحمة)।

৮৯. القدوس (আল-কুদ্দূসু) পবিত্র;

* আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও যাবতীয় কর্ম দোষক্রটি মুক্ত। তিনি সব ধরনের দোষক্রটি থেকে পবিত্র (القدوس)।

৯০. الجليل (আল-জালীলু)- পূর্ণাঙ্গ মহিমাময় ;

* দোষক্রটি থেকে পবিত্রতা, অনপেক্ষ হওয়ার পরম স্তরে তিনি উন্নিত। তিনি পূর্ণাঙ্গ মহিমাময় (الجليل)।

৯১. المجيد (আল-মাজীদু)- গৌরবময়;

* আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও কর্ম দোষক্রটিযুক্ত তো নয়ই বরং আল্লাহ্র সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও যাবতীয় কর্মে তিনি বুযুর্গির অধিকারী অর্থাৎ, গৌরবময় (المجيد)।

৯২. المتكبر (আল-মুতাকাব্বিরু)- সুউচ্চ, সমুচ্চ গৌরবময়তার অধিকারী;

* তাঁর বুযুর্গি ও গৌরবময়তায় তিনি অত্যন্ত উঁচু স্তরে উন্নিত। তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সুউচ্চ, সুমহান (المتكبر)।

১. এ ব্যাপারে মু'তাযিলাদের ভিন্ন মত রয়েছে। দেখুন ২য় খণ্ড "মু'তাযিলা" শিরোনাম ॥

www.iscalibrary.com

৯৩. المتعالى (আল-মুতা'আলী)-সর্বোচ্চ মর্যাদাবান;

* আল্লাহ্ তা'আলা আলীশান, অর্থাৎ, তিনি তাঁর বুযুর্গি ও গৌরবময়তায় এমন উঁচু মর্যাদার স্তরে উন্নিত যে পর্যন্ত কারও পৌঁছা সম্ভব নয়।

৯৪. الماجد (আল-মাজিদু)- এককতম মহান;

* আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কর্মের বুযুর্গি এবং গৌরবময়তায় একক। এ ক্ষেত্রে অন্য কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি আল-মাজিদু (الماجد)।

৯৫. الصمد (আস্ সামাদু)-অনপেক্ষ;

* আল্লাহ্ তাঁর সত্তা, কর্ম ও গুণাবলী কোন ক্ষেত্রেই কারও মুখাপেক্ষী নন বরং তিনি অনপেক্ষ (الصمد)। কোন ব্যাপারেই তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। বরং অন্য সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী। [১]

৯৬. الحميد (আল-হামীদু)-প্রশংসিত;

* আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কর্মের প্রেক্ষিতে প্রশংসার্হ্য (الحميد)। অর্থাৎ, তিনি তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কর্মে এমন বুযুর্গি বা গৌরবময়তার অধিকারী, যার প্রেক্ষিতে তিনি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

৯৭. الكبير (আল-কাবীরু)-সর্বাধিক বড়ত্বের অধিকারী;

* আল্লাহ্ সর্বাধিক বড়ত্বের অধিকারী; যার চেয়ে বড় কারও কল্পনা করা যায় না।

৯৮. العلى (আল-আলিয়্যু)- সর্বোচ্চ মর্যাদাবান;

* আল্লাহ্ সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। যার উপর আর কারও মর্যাদা হতে পারে না।

৯৯. العظيم (আল-আযীমু)-সর্বোচ্চ মাহাত্মের অধিকারী;

* আল্লাহ্ সর্বোচ্চ মাহাত্মের অধিকারী; যার মাহাত্মের স্তরে কারও পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এ ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার আরও কিছু গুণবাচক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-

১. الرب (আর রাব্বু)- প্রতিপালক; ২. المنعم (আল মুন্ইমু)- নিয়ামত দানকারী ; ৩. المعطى (আল্ মু'তী) দাতা ; ৪. الصادق (আস্ সাদিকু)- সত্যবাদী ; ৫. الستار (আস্ সাত্তারু)- গোপনকারী।

* আল্লাহ্ তাআলার আসমায়ে হুসনা-র যথাযথ বাংলা অনুবাদ হয় না। এখানে যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা ইংগিত মাত্র। আল-আসমাউল হুসনা-র মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক গুণাবলী আল্লাহ্র জন্য সত্তাগত, অনাদি-অনন্ত ব্যাপক ও অসীম। আর মানুষের জন্য এগুলো আল্লাহ্ প্রদত্ত অস্থায়ী ও সীমিত।

১. শয়খ আকবর حقائق الاسماء নামক গ্রন্থে বলেনঃ

الصمد هو الذى يلجأ ويقصد اليه فى الحوائج والنوائب - (الاتحاف جـ٢/)

অর্থাৎ, صمد বলা হয় ঐ সত্তাকে প্রয়োজন ও বিপদাপদে যার স্মরণাপন্ন হওয়া এবং যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়॥

www.iscalibrary.com

* কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌র কতক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। যেমন- يد হাত, وجه মুখমন্ডল, عين চক্ষু। এগুলোর তাৎপর্য সম্বন্ধে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত এই যে, আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাত সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) যা বলেছেন, তার উপর ঈমান রাখতে হবে। আল্লাহ্‌র এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত নয়। আল্লাহ্ যেমন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাঁর শান উপযোগী। এর চেয়ে বিস্তারিত আমাদের জানা নেই। "মুজাস্‌সিমা, মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা ফিরকা প্রসঙ্গ" শিরোনামে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পরবর্তী পৃষ্ঠা।

আল্লাহ্‌র সিফাত সম্পর্কে আরও বিশেষ কিছু আকীদা

১. আল্লাহ্‌র সমস্ত গুণাবলী অনাদি (قديم)। অর্থাৎ, তাঁর সমস্ত গুণাবলী অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। যেমন তাঁর সত্তা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। অনাদি (قديم) সত্তার গুণ অনাদি (قديم)ই হয়ে থাকে। আল্লাহর গুণাবলীকে অনিত্ব (حادث) বললে অসুবিধা হল ঃ

(এক) আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অনিত্ব বললে তার মধ্যে পরিবর্তন (تغير) আসতে পারে বলতে হয়। কেননা অনিত্ব বিষয়ের মধ্যে পরিবর্তন এসে থাকে। কিংবা বলতে হয় এক সময় এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন আল্লাহ্‌র মধ্যে এসব গুণাবলী ছিল না। কারণ অনিত্ব বিষয়গুলিই এমন, যা এক সময় অস্তিত্বহীন ছিল। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা অনাদিকাল থেকেই তাঁর সমস্ত গুণাবলীর সাথে গুণান্বিত।

(দুই) আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অনিত্ব (حادث) বললে আল্লাহ্‌কে অনিত্ব বিষয়ের আধাঁর (محل حوادث) বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর তা অসম্ভব।

অতএব আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটা সিফাতী নাম অনাদি। যেমন সৃষ্টি করা তাঁর একটি গুণ। মাখলূক না থাকলেও তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করার গুণ অবশ্যই ছিল। অতএব তাঁর খালেক (خالق) নাম অনাদি। এমনিভাবে তাঁর সমস্ত গুণাবলীর ব্যাপারে এরূপ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।

২. আল্লাহ্‌র সিফাত তাঁর হুবহু সত্তা (عين ذات)ও নয়, কেননা গুণ তাঁর অধিকারী-র হুবহু সত্তা হয় না। আবার তাঁর সত্তা বহির্ভূত (غير ذات) ও নয়। বরং তাঁর সিফাত তাঁর সত্তার অপরিহার্য বিষয় (لازم ذات)। যেমন জ্ঞান আর জ্ঞানী হুবহু এক জিনিস নয়, আবার জ্ঞান জ্ঞানী থেকে পৃথকও নয়।[১]

৩. আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী যেমন অনাদি, তেমনি অনন্ত। কারণ যেটা অনাদি হয় সেটা অনন্তও হয়।[২]

৪. আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে কোন তারতীব বা পর্যায়ক্রমিকতা নেই। এরূপ বলা দোরস্ত নয় যে, তাঁর অমুক গুণ আগের আর অমুক গুণ পরের। কেননা তাঁর সমস্ত গুণ অনাদি ও নিত্ব। আর পর্যায়ক্রমিকতা সাব্যস্ত করলে পরবর্তীটা অনাদি ও নিত্ব থাকে না বরং পূর্বেরটার তুলনায় পরবর্তীটা حادث বা অনিত্ব হয়ে যায়।

১. এ ব্যাপারে মু'তাযিলাদের ভিন্ন মত রয়েছে। দেখুন দ্বিতীয় খণ্ড "মু'তাযিলা" শিরোনাম ॥ ২. عقائد الاسلام. عبدالحق حقانی ॥

www.iscalibrary.com

৫. আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত সবগুলো এক ধরনের এবং এক পর্যায়ের নয়। তাঁর সিফাত-গুলো প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

(এক) ইতিবাচক (ثبوتية)।

(দুই). নেতিবাচক (سلبية)।

ইতিবাচক সিফাতগুলি আবার দু'ভাগে বিভক্ত।

(এক) সত্তাবাচক গুণাবলী (ذاتية)।

(দুই) কর্মবাচক গুণাবলী (افعالية)।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী-র মতে আল্লাহ্র সত্তাবাচক গুণাবলী ৮টি। যথা ঃ (১) হায়াত, (২) ইরাদা বা ইচ্ছা, (৩) ইল্ম বা জ্ঞান (৪) কুদরত বা শক্তি, (৫) শ্রবণ, (৬) দর্শন, (৭) কালাম, ও (৮) তাক্বীন। তাক্বীন অর্থ সৃষ্টি করা, গঠন করা, রচনা করা ইত্যাদি। তাক্বীন স্বতন্ত্র কোন গুণ নয়। তাক্বীন গুণটি মৌলিক ও ব্যাপক একটি গুণ যা যাবতীয় কর্মবাচক গুণের সমষ্টিকে বোঝায়।

সত্তাবাচক ও কর্মবাচক গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য হল সত্তাবাচক গুণাবলীর বিপরীত গুণে আল্লাহ্ গুণান্বিত হন না। যেমন "জ্ঞান" হল আল্লাহ্র একটি সত্তাবাচক গুণ। তাই এর বিপরীত - মূর্খতার সাথে আল্লাহ গুণান্বিত হন না। আল্লাহ জ্ঞানী কিন্তু তিনি কখনও নিঃজ্ঞান হন না। পক্ষান্তরে কর্মবাচক গুণের বিপরীত গুণেও তিনি গুণান্বিত হন, যদি সেটার সম্পর্ক অন্যের সাথে হয়। যেমন মৃত্যু দেয়া, রিযিক দেয়া ইত্যাদি। তিনি এক সময় কাউকে মৃত্যু দেন আবার কাউকে মৃত্যু দেন না। তবে একথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ নিজেকে মৃত্যু দিতে পারেন, কেননা কর্মবাচক গুণের বিপরীত গুণের সাথে গুণান্বিত হওয়ার প্রশ্ন তাঁর নিজের বেলায় নয় বরং অন্যের বেলায়।

৬. আল্লাহ্র সত্তা যেমন অন্য কারও মত নয়, তাঁর গুণাবলীও অন্য কারও গুণাবলীর মত নয়। তাই তাঁর জীবন আমাদের জীবনের মত নয়, তাঁর শক্তি আমাদের শক্তির মত নয়, তাঁর জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের মত নয়, তাঁর শ্রবণ আমাদের শ্রবণের মত নয়। যেমন বলা যায় আমাদের শ্রবণের জন্য আমরা কান ব্যবহার করি অর্থাৎ, কান দিয়ে শ্রবণ করি, কিন্তু তিনি কান ছাড়া শ্রবণ করেন, এমনিভাবে তিনি জবান ছাড়া বলেন, চোখ ছাড়া দেখেন। তিনি এসব অঙ্গের মুখাপেক্ষী নন। নতুবা বলতে হবে তিনি শ্রবণের জন্য কানের মুখাপেক্ষী, দেখার জন্য চোখের মুখাপেক্ষী ইত্যাদি। মোট কথা তাঁর কোন কিছুই আমাদের মত নয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ليس كمثله شئ -

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর মত নয়। (সূরাঃ ৪২-শুরাঃ ১১)

মুজাস্সিমা, মুশাব্বিহা ও মুআত্তিলা ফিরকা প্রসঙ্গ

এ বিষয়টি বোঝার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা বলার প্রয়োজন। তা হলঃ কুরআন মাজীদে এমন অনেক আয়াত আছে যার দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর কোন কিছুর মত নন। যেমন ঃ

www.iscalibrary.com

ليس كمثله شيئ -

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর মত নয়। (সূরাঃ ৪২-শুরাঃ ১১) অতএব মানুষ বা কোন কিছুর সাথে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য নেই, মানুষ বা কোন কিছুর মত আল্লাহ্‌র কোন আকৃতি নেই।

এর বিপরীত এমন কিছু আয়াতও আছে যা স্পষ্টতঃ আল্লাহ্‌র দৈহিক গঠনের প্রতি ইঙ্গিত করে, বা আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট কোন দিক আছে বা আল্লাহ্ নির্দিষ্ট কোন স্থানে আছেন বোঝায়, যা দ্বারা মানুষ বা পৃথিবীর কোন বস্তুর সাথে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য আছে বলে অনুমিত হয়। যেমন ঃ

يد الله فوق ايديهم -

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর। (সূরাঃ ৪৮-ফাত্‌হঃ ১০)

ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله -

অর্থাৎ, পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত আল্লাহ্‌র। অতএব যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাওনা কেন সেদিকেই আল্লাহ্‌র মুখ রয়েছে। (অর্থাৎ, সব দিকই আল্লাহ্‌র)। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১১৫)

ثم استوىٰ على العرش -

অর্থাৎ, অনন্তর তিনি আরশে সমাসীন হলেন। (সূরাঃ ৩২-সাজদাঃ ৪)

أأمنتم من فى السماء -

অর্থাৎ, আকাশে যিনি আছেন তাঁর থেকে কি তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ ? (সূরাঃ ৬৭-মুল্‌কঃ ১৬)

হাদীছেও কিয়ামতের দিন ফেরেশ্‌তাদের সমভিব্যাহারে আল্লাহ্‌র আগমন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা বাহ্যতঃ মানুষ বা পৃথিবীর কোন বস্তুর সাথে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য আছে বলে অনুমিত হয়।

এই দুই ধরনের আয়াত ও হাদীছ নিয়ে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিরোধী দুটি ভিন্ন মতাবলম্বী দলের জন্ম হয়। একদিকে মুজাস্‌সিমা/مجسمه (নরাত্মারোপবাদী) এবং মুশাব্বিহা/مشبهه (সাদৃশ্য প্রতিপাদনকারী) ফিরকা-এর উৎপত্তি হয়, যারা আমাদেরই মত আল্লাহ্‌র হাত-পা আছে বলে স্বীকার করত এবং বলত আল্লাহ আরশের উপর ওরকমই বসেন যেমন দুনিয়াতে কোন বাদশাহ তার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এভাবে তারা দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত ও হাদীছগুলো মেনে নিলেও প্রথমোক্ত আয়াতকে অস্বীকার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অপর দিকে মু'তাযিলা ও কাদরিয়াগণ আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলীকেই অস্বীকার করে বসে। তাই তাদের অপর নাম হল মুন্‌কিরিনে সিফাত বা আল্লাহ্‌র গুণাবলী অস্বীকারকারী। এই শ্রেণীর লোকদেরকে মুআত্তিলা (معطله)ও বলা হয়। معطله (মুআত্তিলা) শব্দটি تعطيل থেকে উদগত, যার অর্থ বেকার করা। পরিভাষায় মুআত্তিলা বলা হয় যারা আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী, যেগুলো কুরআন ও হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সেগুলোকে অস্বীকার করে।

www.iscalibrary.com

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উলামায়ে কেরাম সাদৃশ জ্ঞাপক উপরোক্ত আয়াতগুলোকে মুতাশাবিহাত (متشابهات)-এর পর্যায়ভুক্ত মনে করে মুতাশাবিহাত-এর ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি অনুসারে আল্লাহর পবিত্র যাতের বিস্তারিত আলোচনা ব্যতীত এর প্রতি ঈমান রাখেন এবং যে সকল আয়াত দ্বারা সাদৃশ্য (تشبيه وتمثيل)-এর প্রকাশ ঘটে থাকে তার আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকেন। তাদের বক্তব্য হল, আল্লাহ্‌র হাত, মুখ, আরশে সমাসীন হওয়া, আকাশে থাকা ইত্যাদিতে আমরা বিশ্বাস রাখি, তবে তার হাকীকত বা প্রকৃত স্বরূপ আমাদের জানা নেই।[২] আল্লাহ্‌র হাত, মুখ ইত্যাদি আছে তবে এগুলো আমাদের কারও মত নয়। এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা উভয় প্রকার আয়াতসমূহের মধ্যে সমন্বয় হয়ে যায় এবং কোন প্রকার আয়াতকে বর্জন করতে হয় না। চার ইমাম ও জমহুরের মত এটাই। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ফেক্‌হে আক্‌বার গ্রন্থে বলেন ঃ

فما ذكر الله فى القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس والعين فهو له صفات ولا يقال ان يده قدرة او نعمة لان فيه ابطال الصفة وهو قول اهل القدر والاعتزال ولكن يده صفة بلا كيف انتهى - (عقائد الاسلام . عبد الحق حقانى)

অর্থাৎ, কুরআনে আল্লাহ তা'আলা চেহারা, হাত, মন, চোখ ইত্যাদির যে উল্লেখ করেছেন, এগুলো তাঁর গুণাবলী। "হাত" দ্বারা শক্তি বা নেয়ামত উদ্দেশ্য-এরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হবে না, কেননা এতে তাঁর সিফাতকে অস্বীকার করা হয় যা কাদরিয়া ও মু'তাযিলাদের মতবাদ। বরং হাত তাঁর একটি সিফাত, তবে সেই হাতের কাইফিয়াত বা অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জানা নেই।

২. ফেরেশতা সম্বন্ধে ঈমান

দ্বিতীয় মৌলিক যে বিষয়ে ঈমান রাখতে হয় তা হল ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান। ফেরেশতা শব্দের আরবী হল মালায়িকা (ملائكة)। এ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হল مَلَك/ مِلاك/ مالك। এর আভিধানিক অর্থ হল বার্তাবাহক। পরিভাষায় ফেরেশতা বলা হয় ঃ

جسم نورانى متشكل باشكال مختلفة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون مايؤمرون -

অর্থাৎ, এমন নূরানী মাখ্‌লূক, যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে থাকেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেন না। বরং সর্বদা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে রত থাকেন।[১]

১. قواعد الفقه ॥

২. উল্লেখ্য ঃ মুতাআখ্‌খিরীন উলামায়ে কেরাম পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যাকেই যথার্থ আখ্যায়িত করে দূর্বল বুদ্ধি লোকদের মনের খটকা নিরসন ও বিষয়টিকে তাদের ধারণ ক্ষমতার আওতায় আনার জন্য আল্লাহ্‌র আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টিকে রূপক অর্থেও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ॥

www.iscalibrary.com

ফেরেশতা সম্বন্ধে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে,

১. ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তা'আলার এক সম্মানিত সৃষ্টি। তারা নূরের সৃষ্টি।[১]

২. তারা পুরুষও নন নারীও নন। তারা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু থেকে মুক্ত।[২] ফেরেশতাদেরকে নারী বা পুরুষ আখ্যায়িত করা যায় না। কেননা এ ব্যাপারে কুরআন হাদীছে কোন ভাষ্য কিংবা কোন যুক্তি বর্তমান নেই।

৩. তারা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বিভিন্ন আকৃতিতে নবী কারীম (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হতেন। অধিকাংশ সময় তিনি হযরত দেহ্ইয়ায়ে কাল্বী (রাঃ)-এর আকৃতিতে আসতেন। হাদীছে জিব্রীল নামক প্রসিদ্ধ হাদীছে তার এক বেদুঈনের বেশে আসার কথা উল্লেখিত আছে।

৪. তাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই।

৫. তারা সংখ্যায় অনেক। হাদীছে বর্ণিত আছে সাত আসমানের সর্বত্র এত ফেরেশ্তা ইবাদতে রত আছেন যে, সামান্য অর্ধহাত জায়গাও খালী নেই। তাদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও জানা নেই। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وما يعلم جنود ربك الا هو -

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত তোমার প্রতিপালকের সৈন্যবাহিনী (ফেরেশতা) সম্বন্ধে কেউ অবগত নয়। (সূরাঃ ৭৪-মুদ্দাছ্ছিরঃ ৩১)

৬. আল্লাহ্ তাদেরকে বিপুল শক্তির অধিকারী বানিয়েছেন।

৭. আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন- কতিপয় আযাবের কাজে, কতিপয় রহ্মতের কাজে নিযুক্ত আছেন, কতিপয় আমলনামা লেখার কাজে নিযুক্ত, তাদেরকে "কিরামান কাতিবীন" বলা হয়। কেউ আল্লাহ্র আরশ বহনের দায়িত্বে নিয়োজিত। এমনিভাবে সৃষ্টির বিভিন্ন কাজে ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহ্ পাক নিয়োজিত করে রেখেছেন।

৮. ফেরেশ্তাগণ মাসূম বা নিস্পাপ। সর্বদা আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক কার্য সম্পাদন করে থাকেন, তার ব্যতিক্রম করেন না। আল্লাহ্র আদেশের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম তারা করেন না। তারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেন না। বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেন। এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لايسبقونه بالقول وهم بامره يعملون-

অর্থাৎ, তারা আগে বেড়ে কথা বলে না। তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। (সূরা ঃ ২১-আম্বিয়া ঃ ২৭)

لايستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون -

অর্থাৎ, তারা ইবাদত করা থেকে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। (সূরা ঃ ২১-আম্বিয়া ঃ ১৯)

১. المصدر السابق ২. مرقاة جـ١/

www.iscalibrary.com

ইবলীস আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিল - এ থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, ফেরেশতা থেকে নাফরমানী হতে পারে। কেননা মুহাক্কিকদের মতে ইবলীস ফেরেশতা নয়, বরং সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

كان من الجن ففسق عن امر ربه -(সূরা ঃ ১৮-কাহ্ফ ঃ ৫০)

অর্থাৎ, সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। অতপর সে তার প্রতিপালকের নির্দেশের অবাধ্য হয়ে যায়।

তদুপরি ইবলীসের আওলাদ আছে বলে কুরআনে উল্লেখ হয়েছে এটাও তার ফেরেশতা না হওয়ার দলীল। কেননা ফেরেশতাদের কোন আওলাদ হয় না। উপরোক্ত আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

افتتخذونه وذريته اولياء من دونى وهم لكم عدو -

অর্থাৎ, তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। (সূরা ঃ ১৮-কাহ্ফ ঃ ৫০)

এছাড়া ইবলীস কর্তৃক নাফরমানী ঘটে যাওয়াও তার ফেরেশতা না হওয়ার দলীল। কেননা ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নাফরমানী করেন না। যেমন পূর্বে এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হারূত ও মা'রূত সহীহ মত অনুসারে দুজন ফেরেশতা ছিলেন। তাদের থেকে কোন কুফর বা গোনাহে কাবীরা সংঘটিত হয়নি। তাদের শাস্তি গোনাহের কারণে নয়, বরং সেটা তিরস্কার স্বরূপ (معاتبة) হয়েছে। যেমন নবীদের বিচ্যুতির ফলে তিরস্কার হয়ে থাকে।[১] তদুপরি উক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের সাথে জোহরা নাম্নী নারীর প্ররোচনা সংক্রান্ত রেওয়ায়াতটি বায়যাবী প্রমুখ সহীহ নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

ফেরেশ্তাদের মধ্যে চারজন সর্ব প্রধান

(এক) জিব্রাঈল ফেরেশতা ঃ তিনি ওহী ও আল্লাহ্র আদেশ বহন করে নবীদের নিকট আসতেন। এছাড়া আল্লাহ্ যখন যে নির্দেশ প্রদান করেন তা কর্তব্যরত ফেরেশতার নিকট পোঁছান।

(দুই) মীকাঈল ফেরেশতা ঃ তিনি মেঘ প্রস্তুত করা, বৃষ্টি বর্ষাণো এবং আল্লাহ্র নির্দেশে মাখ্লূকের জীবিকা সরবরাহের দায়িত্বে নিযুক্ত।

(তিন) ইসরাফীল ফেরেশতা ঃ তিনি রূহ সংরক্ষণ ও সিঙ্গায় ফুৎকার দিয়ে দুনিয়াকে ভাঙ্গা ও গড়ার দায়িত্বে নিযুক্ত।

(চার) আযরাঈল ফেরেশতা ঃ জীবের প্রাণ হরণের কাজে নিযুক্ত তিনি। হাদীছে তাকে 'মালাকূল মউত' বলা হয়েছে, আছারে সাহাবার মধ্যে আযরাঈল নামটি পাওয়া যায়। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে রূহ কব্য করার সময় আযরাঈল (আঃ) কে কারও কাছে আসতে হয় না, বরং সারা প্রথিবী একটি গ্লোবের মত তার সামনে অবস্থিত, যার আয়ূষ্কাল শেষ হয়ে যায় নিজ স্থানে থেকেই তিনি তার রূহ কব্য করে নেন। তবে মৃত ব্যক্তি নেককার হলে রহ্মতের ফেরেশ্তা আর বদকার হলে আযাবের ফেরেশতা মৃতের নিকট এসে থাকেন এবং মৃত ব্যক্তির রূহ নিয়ে যান।

১. شرح العقائد النسفيه ॥

www.iscalibrary.com

দুনিয়ার প্রতিটি ধর্ম মতেই বিশেষ করে গ্রীক দর্শনেও এ জাতীয় সত্তা সমূহের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। সাবিয়ী ধর্ম মতে এ শ্রেণীর মাখলূককে তারকাপুঞ্জ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। তারা ফেরেশ্‌তাদের উদ্দেশ্যে কুরবানী দিত। তাদের প্রতিকৃতি তৈরী করত এবং তাদেরকে مظهر خدا দৃশ্যমান প্রভু বা "খোদার প্রকাশ" মনে করত। ইউনানী মিশরী (ইসকান্দারী) দর্শনে তাদের নাম রাখা হয়েছে "উকূলে আশারা" (عقول عشرة)বা দশ বুদ্ধি আকল। পার্শিয়ানরা ফেরেশ্‌তাদেরকে "ইমশাস পান্দ" নামে অভিহিত করত এবং তাদের ধারণা মতে ফেরেশ্‌তাদের সংখ্যা অসংখ্য ও অগণিত। পার্শিয়ানরা ফেরেশ্‌তাদেরকে পূজা-অর্চনার যোগ্য বলে মনে করত। তাদের ধর্ম মতে সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতা হলেন ছয়জন। তাদের প্রত্যেকের অধীনে রয়েছে তেত্রিশজন করে ফেরেশ্‌তা। পার্শিয়ানদের ধর্ম মতে ভাল-মন্দের প্রভূ একজন নয় বরং দুইজন এবং তাদের প্রত্যেকের অধীনে রয়েছে অসংখ্য ফেরেশ্‌তা। এই উভয় শ্রেণীর প্রভূ নিজ নিজ সৈন্য সামন্তসহ সর্বদাই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকে। এমনিভাবে তারা নর ও মাদী ফেরেশ্‌তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং তারা বলে, মাদী ফেরেশ্‌তা নর ফেরেশ্‌তার স্ত্রী। ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা ফেরেশ্‌তাদেরকে করভীম বলে এবং বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তাদেরকে জিব্‌রাঈল, মীকাঈল ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। তারা মর্যাদা ও সম্মানের মস্তক অবনত করে তাদেরকে এমন ভাবে আহবান করে যেমনটি আল্লাহ্‌র শানে করা হয়ে থাকে। খৃষ্টান সম্প্রদায়ও ফেরেশ্‌তাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং বিশেষ বিশেষ ফেরেশ্‌তাকে জিব্‌রাঈল রূহুলকুদ্‌স ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে থাকে। হিন্দু ধর্মে ফেরেশ্‌তাদের সম্পর্কে নানান ধরনের উদ্ভট কল্পনা করা হয়ে থাকে। জাহিলী যুগের পূর্বে আরবরা ফেরেশ্‌তাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে অভিহিত করত। তাদের পূজা-আর্চনা করত এবং এমন আকীদাও পোষণ করত যে, তারা আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের জন্য সুপারিশকারীর ভূমিকা পালন করবে।

ইসলাম ফেরেশ্‌তাদের সম্বন্ধে এ সকল মতাদর্শকে ভ্রান্ত ধারণা এবং অসার বলে ঘোষণা করেছে। এ সকল ভ্রান্ত ধারণরা মূলোচ্ছেদ কল্পে কুরআনে কারীমের বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। প্রমাণ করা হয়েছে যে, প্রভূত্ব ও খোদায়ীত্বের কোন গুণ ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে নেই। তারা আল্লাহ্‌র বান্দা। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করা। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাদের নেই। সুতরাং তাদের উদ্দেশ্যে ইবাদত-বন্দেগী করা এবং পূজা-অর্চনা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও না-জায়েয।[১]

৩. নবী ও রাসূল সম্বন্ধে ঈমান

তৃতীয় মৌলিক যে বিষয়ের উপর ঈমান রাখতে হয়, তা হল নবী রাসূলদের প্রতি ঈমান। জিন ও ইনসানের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে যে কিতাব প্রেরণ করেন, সেই কিতাবের ধারক বাহক বানিয়ে, সেই কিতাব বুঝানো ও ব্যাখ্যা দেয়ার

১. ইসলামী আকীদা থেকে গৃহীত ॥

www.iscalibrary.com

জন্য তথা আল্লাহ্‌র বাণী হুবহু পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং আমল করে আদর্শ দেখানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং জিন ও মানব জাতির নিকট তাঁদেরকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদেরকে বলা হয় নবী বা পয়গম্বর।

মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের মতে নবীদের মধ্যে যারা বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদেরকে বলা হয় রাসূল (رسول), যেমন নতুন কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন বা নতুন উম্মতের নিকট প্রেরিত হয়েছেন বা বিশেষভাবে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে মোকাবালার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদেরকে রাসূল বলা হয়। আর যাদের কাছে ওহী আগমন করে তাদেরকে নবী (نبی) বলা হয়।[১] এ হিসেবে নবী ব্যাপক (عام) আর রাসূল বিশিষ্ট্য (خاص)। অর্থাৎ, সব রাসূল নবী তবে সব নবী রাসূল নন। রাসূল হওয়ার জন্য নতুন কিতাব প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা হযরত ইসমাঈল (আঃ) সর্বসম্মতিক্রমে রাসূল ছিলেন কিন্তু তাঁর নিকট কোন নতুন কিতাব আসেনি। তাছাড়া এক হাদীছ থেকে জানা যায় রাসূলদের সংখ্যা ৩১৩ জন। আর কিতাব ও সহীফার সংখ্যা সর্বমোট ১০৪।[২]

নবী ও রাসূল পরিভাষাদ্বয়ের মাঝে এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে নবী, রাসূল, পয়গম্বর সব শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী নবীদের চেয়ে রাসূলদের মর্যাদা অধিক।

সাধারণভাবে সব নবী ও রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখতে হবে তা হল ঃ

১. নবুওয়াত ও রেসালাত আল্লাহ্‌র দান (وہبی)। আল্লাহ যাকে চান তাকেই তিনি নবী রাসূল হিসেবে মনোনীত করেন। নবুওয়াত সাধনা বলে অর্জিতব্য (کسبی) বিষয় নয়। কুর-আনে কারীমে বলা হয়েছে ঃ

الله يصطفى من الملئكة رسلا ومن الناس ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষদের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। (সূরাঃ ২২-হাজ্জঃ ৭৫)

وقال تعالى : والله يختص برحمته من يشاء ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে চান তাঁর রহমতের[৩] জন্য একান্ত (মনোনীত) করেন। (সূরাঃ ২-বাক-ারাঃ ১০৫)

وقال تعالى : الله اعلم حيث يجعل رسالته ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর রিসালাতের ভার কার উপর অর্পন করবেন, তা তিনিই ভাল জানেন। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ১২৪)

দার্শনিকগণ (فلاسفہ) মনে করেন যে, কোন মানুষ যখন আত্মিক সাধনা বলে জড় জগতের আবিলতা থেকে মুক্তি লাভ করে এবং আত্মিক পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হওয়ার ফলে অদৃশ্য বিষয় তার হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হতে শুরু করে এবং সে জাগতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হয়, তখনই সে নবী হয়ে যায়। এটা কুফ্‌রী মতবাদ।[৪]

১. عقائد الاسلام، ادریس کاندھلوی ॥ ২. ایضا ॥ ৩. উল্লেখ্য এখানে 'রহমত' বলে নবুওয়াতকে বুঝানো হয়েছে ॥ ৪. عقائد الاسلام، ادریس کاندھلوی ॥

www.iscalibrary.com

২. নবী রাসূলগণ থেকে কখনও নবুওয়াত ও রেসালাতকে কেড়ে নেয়া হয় না। নবীগণ নবুওয়াত লাভ করার পর নবুওয়াতের পদে চির বহাল হয়ে থাকেন।

৩. তাঁরা মানুষ, তাঁরা খোদা নন বা খোদার পুত্র নন বা খোদার রূপান্তর (অবতার) নন বরং তাঁরা খোদার প্রতিনিধি ও নায়েব-আল্লাহর বাণী অনুসারে জিন ও মানুষ জাতিকে হেদায়েতের জন্য তাঁরা দুনিয়াতে প্রেরিত হন। যারা নবী হযরত ঈসা (আঃ)কে খোদা বা নবী হযরত ঈসা ও উযায়ের (আঃ)কে খোদার পুত্র বলেছে, তাদের খন্ডনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم -

অর্থাৎ, যারা বলে মারয়াম তনয় মসীহই আল্লাহ, তারাতো কুফ্‌রী করেছে। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ১৭)

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذالك قولهم بافواههم -

অর্থাৎ, ইয়াহুদীগণ বলে উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র এবং নাসারাগণ বলে মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা। (সূরাঃ ৯-তাওবাঃ ৩০)

৪. নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন ব্যতীত আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না।

قال تعالى : ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكفرون حقا -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের সাথে কুফ্‌রী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মাঝে তারতম্য করতে চায় ও বলে আমরা কতকের প্রতি ঈমান রাখি এবং কতকের প্রতি ঈমান রাখিনা আর (এভাবে) এর মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারা প্রকৃত পক্ষে কাফের। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ১৫০-১৫১)

৫. নবীগণ আল্লাহ্‌র বাণী হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাঁদের দ্বারা কোন ত্রুটি সংঘটিত হয়নি।[১] ইরশাদ হয়েছে ঃ

الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله -

অর্থাৎ, তাঁরা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহ্‌কে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করত না। (সূরাঃ ৩৩-আহ্‌যাবঃ ৩৯) আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته الاية -

অর্থাৎ, হে রাসূল ! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর; যদি তা না কর, তাহলেতো তুমি তাঁর রেসালাত (বার্তা) পৌঁছে দিলে না। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৬৭)

১. مرقاة جـ١/

www.iscalibrary.com

৬. সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)। নবীদের ছিলছিলা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর শেষ হয়েছে।

নবীদের সংখ্যা কত তা সীমাবদ্ধ করে উল্লেখ না করাই শ্রেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الاية -

অর্থাৎ, তাঁদের কারও কারও কথা তোমার নিকট ব্বিৃত করেছি আর কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। (সূরা ঃ ৪০-মু'মিন ঃ ৭৮)

অতএব নবীদের সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করলে হতে পারে নবী নন তাদের সংখ্যাও এসে গেল কিংবা নবী অথচ তার সংখ্যা বাদ পড়ে গেল।[১]

৭. আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী নবীগণ কবরে জীবিত। শহীদগণের জীবনের চেয়েও তাঁদের জীবন অধিক অনুভূতি সম্পন্ন। তাঁদের কাছে উম্মতের আমল ও দুরূদ সালাম পৌঁছানো হয়। আমাদের নবী (সাঃ)ও কবরে জীবিত আছেন। মুসনাদে আবী ইয়া'লা গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) কতৃক বর্ণিত হাদীছে[২] রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

الانبياء احياء فى قبورهم يصلون - (تسكين الصدور عن شفاء السقام وحياة الانبياء للبيهقى - وهذا حديث صححه المحدثون مثل اليهيثمى والبيهقى والشوكانى والعلى القارى والمنذرى وغيرهم)

অর্থাৎ, নবীগণ কবরে জীবিত, তাঁরা তাঁদের কবরে নামায পড়েন।

وعن انس ان رسول الله ﷺ قال : اتيت وفى رواية مررت على موسى ليلة اسرى بى عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلى فى قبره - (مسلم جـ/٢ واحمد جـ/٣)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ মে'রাজের রাত্রে আমি মূসা (আঃ)-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করি লাল টীলার নিকটে, তখন তিনি স্বীয় কবরে নামায পাঠ করছিলেন।

আল্লামা সামহুদী বলেনঃ নবীগণের কবরে জীবিত হওয়া সম্পর্কিত দলীলাদি থেকে বোঝা যায় তাঁরা দুনিয়ার মতই দৈহিক জীবন-যাপন করে থাকেন, তবে সেখানে তাঁদের খাদ্য-খাবারের প্রয়োজন হয় না।[৩]

১. شرح العقائد النسفيه ॥

২. এ হাদীছটি *خبر واحد* হলেও এজমা ও উম্মতের কবূল করা (تلقى الامة بالقبول)-এর কারণে এ দ্বারা আকীদা প্রমাণিত হতে পারে ॥

৩. تسكين الصدور . *سرفراز خان صفدر* ॥

www.iscalibrary.com

নবী (সাঃ) কবরে জীবিত বিধায় তাঁর রওজায় সালাম দেয়া হলে তিনি শুনতে পান এবং উত্তর প্রদান করে থাকেন। অন্য কোন স্থানে থেকে নবীর প্রতি দুরূদ সালাম পাঠ করা হলে নির্ধারিত ফেরেশতারা নবী (সাঃ)-এর নিকট তা পৌঁছে দেন।

৮. হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত যত পয়গম্বর এসেছেন, তাঁদের সকলেই হক ও সত্য পয়গম্বর ছিলেন, সকলের প্রতিই ঈমান রাখতে হবে। কারও প্রতি ঈমান আনা হবে আর কারও প্রতি ঈমান আনা হবে না, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لا نفرق بين احد من رسله -

অর্থাৎ, আমরা তাঁর রাসূলদের মাঝে (ঈমার আনয়নের ক্ষেত্রে) কোন তারতম্য করি না। (সূরাঃ ২-বাকারা ২৮৫) রাসূল (সাঃ)ও সকল নবীকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

بل جاء بالحق وصدق المرسلين -

অর্থাৎ, সে হক সহকারে আগমন করেছে এবং প্রেরিত রাসূলদের সত্যায়ন করেছে। (সূরাঃ ৩৭-সাফ্ফাতঃ ৩৭)

সকল নবী রাসূলের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক বলে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূল শব্দের বহুবচন ব্যবহার করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

كل امن بالله وملئكته وكتبه ورسله الاية -

অর্থাৎ, তারা সকলে ঈমান এনেছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি। (সূরাঃ ২- বাকারা ২৮৫)

তদুপরি কোন একজন নবীর প্রতি ঈমান না আনা সকলের প্রতি ঈমান না আনার শামিল। কেননা সকলের শিক্ষার মূলনীতিমালা অভিন্ন ছিল। নূহ, আদ, ছামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায় তাদের স্ব স্ব নবী/রাসূলকে অস্বীকার করেছিল অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় এক একজন নবী/রাসূলকে অস্বীকার করেছিল, তবুও সেটা বয়ান করতে গিয়ে কুরআনে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, একজন নবী/রাসূলকে অস্বীকার করা সমস্ত নবী/রাসূলকে অস্বীকার করার নামান্তর। ইরশাদ হয়েছে ঃ

كذبت قوم نوح المرسلين -

অর্থাৎ, নূহের সম্প্রদায় প্রেরিত রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। (সূরাঃ ২৬-শু'আরা ঃ ১০৫)

كذبت عاد المرسلين -

অর্থাৎ, আদ সম্প্রদায় প্রেরিত রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। (সূরাঃ ২৬- শু'আরা ঃ ১২৩)

www.iscalibrary.com

كذبت ثمود المرسلين -

অর্থাৎ, ছামূদ সম্প্রদায় প্রেরিত রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। (সূরাঃ ২৬-শু'আরা ঃ ১৪১)

সকল নবী রাসূলের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল প্রত্যেক নবী রাসূল তাঁদের স্ব স্ব যুগে সত্য ছিলেন, তাঁদের যুগে তাঁদের আনিত দ্বীনের আনুগত্য অপরিহার্য ছিল। তবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের পর অন্য সব নবী রাসূলের শরী'আত রহিত হয়ে গিয়েছে, এখন শুধু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শরী'আত ও তাঁর আনুগত্যই চলবে।

৯. নবী রাসূলদের দ্বারা তাঁদের সত্যতা প্রমাণিত করার জন্য অনেক সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এসব অলৌকিক ঘটনাকে 'মু'জিযা' বলে। মু'জিযায় বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গীভূত। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য আগুন ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্য লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া, হযরত ঈসা (আঃ)-এর দুআয় মৃতদের জীবিত হয়ে যাওয়া, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হাত মুবারকের আঙ্গুল থেকে পানি ফুটে বের হওয়া যার দ্বারা সমস্ত সৈন্যবাহিনী তৃপ্তি সহকারে পান করে নেয়, ইত্যাদি।

মু'জিযা (معجزة) শব্দটি আরবী। এর শাব্দিক অর্থ পরাভূতকারী। আল্লামা তাফ্তাযানী এর পারিভাষিক অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وهى امر يظهر بخلاف العادة على يد مدعى النبوة عند تحدى المنكرين على وجه يعجز المنكر عن الاتيان بمثله -

অর্থাৎ, প্রচলিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বিষয়-যা নবুওয়াতের দাবীদারদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় মহান আল্লাহ পাক নবীদের দ্বারা এ কাজ সংঘটিত করেন। বিষয়টির প্রকৃতি এমন যে, এর মোকাবিলা করা অবিশ্বাসী এবং অস্বীকারকারী লোকদের পক্ষে অসম্ভব।[১]

মু'জিযার সংখ্যা কত? এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন ১ হাজার, কেউ কেউ বলেছেন ১ হাজার ২ শত, কেউ কেউ বলেছেন ৩ হাজার। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী আল-খাসায়িসুল কুব্‌রা গ্রন্থে ১ হাজার মু'জিযার বিবরণ পেশ করেছেন। কাযী ইয়ায বলেনঃ কুর-আনের ছোট্ট একটি সূরার সমান সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছে। অতএব এ পরিমাণ হল একটি মু'জিযা। আর এ সূরায় রয়েছে ১০ টি শব্দ। অতএব এ হিসাবে হিসাব করলে কুরআনের ৬৬৬৬ টি আয়াত ৭ হাজার ৭ শত মুজিযা।

মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য

দার্শনিক আলিমদের মতে যাদু ও মু'জিযার মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান। যথা ঃ

১. কোন ওয়াসিতা বা মাধ্যম প্রয়োগ করে যাদু প্রদর্শন করা হয়। অর্থাৎ, যাদু কোন উপকরণ (اسباب)-এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে মু'যিজার পেছনে কোন উপকরণ

১. شرح العقائد النسفيه ॥

www.iscalibrary.com

(اسباب) থাকে না। কোন উপকরণের মাধ্যমে মু'জিযা প্রদর্শন করা যায় না। বরং আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তখনই তিনি নবী বা রাসূলগণের মাধ্যমে মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এটাই হচ্ছে যাদু ও মু'যিজার মধ্যকার মূল তাৎপর্যগত পার্থক্য।

২. যাদুবিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। পক্ষান্তরে মু'জিযা শিক্ষার মাধ্যমে হাসিল করা যায় না। বরং আল্লাহ্ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে নিজ ইচ্ছায়ই এর প্রকাশ ঘটান।

৩. যাদুর মোকাবিলা করা সম্ভব। তাই এক যাদুকর অন্য যাদুকরের যাদুকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ করে দিতে পারে। পক্ষান্তরে মু'জিযার মুকাবিলা করা কোন মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাই হযরত মূসা (আঃ) এর মু'জিযার সামনে ফিরাউনের আনীত দেড় লক্ষ যাদুকর ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়।

৪. যাদুকরদের যাদুর মধ্যে পরস্পর বৈপরিত্য থাকতে পারে, কিন্তু নবীদের মু'জিযার মধ্যে কোন বৈপরিত্য ছিল না এবং হতে পারে না।

৫. যাদুর কোন বাস্তবতা বা প্রকৃত স্বরূপ নেই। বরং যাদু হচ্ছে একটি অবাস্তব বিষয়। পক্ষান্তরে মু'জিযা হচ্ছে বাস্তব সত্য এক কুদরতী বিষয়। এর বাস্তবতার কথা অমুসলিম ব্যক্তিগণও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

৬. যাদু স্থান ও কালের সাথে সম্পর্কিত নয়। যেমন আল্ কুরআন সর্বকালের ও সর্ব স্থানের মানুষের জন্যই এক মু'জিযানা কিতাব।

৭. যাদু প্রদর্শন করা হয় পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। আর মু'জিযার প্রকাশ ঘটানো হয়েছিল ধর্মীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য।

৮. সাধারণতঃ মূর্খ ও নির্বোধ ধরনের লোকদের মধ্যেই যাদু প্রদর্শিত হয়ে থাকে এবং তারাই তা গ্রহণ করে থাকে। পক্ষান্তরে মু'জিযা প্রদর্শিত হয়েছিল সর্বস্তরের মানুষের সামনে। তারপর বুদ্ধিমান লোকেরাই এর থেকে হেদায়েত গ্রহণ করেছে।[১] এখানে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পরবর্তিতে তা উল্লেখ করা হবে।

৯. সাধারণভাবে সব নবী-রাসূলদের ব্যাপারে যেসব আকীদা রাখতে হয়, তার মধ্যে ৯ (নয়) নং হল - নবী রাসূলগণের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে। এটা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত ইয়াকীনী বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض . الاية -

অর্থাৎ, আমি কতক নবীকে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈল ঃ ৫৫)

তবে খাস করে কোন্ নবী কোন্ নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা ইয়াকীনী বিষয় নয় বরং ظنی।[২] তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রমও রয়েছে।

১০. নবী রসূলগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ-তাঁদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হয় না। নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে তাঁরা পবিত্র ও

১. তথ্যসূত্র ঃ ইসলামী আকীদা, মাওঃ ইসহাক ফরীদী ও - علم الكلام. مولنا ادريس كاندهلوى ॥

১. عقائد الاسلام. از شرح فقه اكبر ॥

www.iscalibrary.com

নিষ্পাপ। শরহে ফেকহে আকবার ও মেরকাত গ্রন্থে একথাটি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

والانبياء عليهم الصلوة والسلام منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح يعنى قبل النبوة وبعدها - (شرح الفقه الاكبر صفحـ١٦٧) وكذا فى المرقاة عصمة الانبياء قبل النبوة وبعدها (جـ١/)

নবীগণের ইস্‌মত বা নিষ্পাপ হওয়ার আকীদা ঈমানের অংশ। এ সম্পর্কে ২য় খণ্ডে "ইসমতে আম্বিয়া প্রসঙ্গ" শীর্ষক আলোচনায় (পৃঃ ৪০৪) ইস্‌মত সর্ম্পকে বিভিন্ন মত, দলীল-প্রমাণ ও ইস্‌মত অস্বীকার কারীদের বক্তব্যের খণ্ডনসহ একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে।

মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য

মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য বিদ্যমান। যথা ঃ

(১) মু'জিযার উদ্দেশ্য হল, নবুওয়াত অস্বীকারকারী লোকদের নিকট নবীর সত্যতা প্রমাণ করা। আর কারামতের উদ্দেশ্য হল, ওলী ও বুযুর্গ ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি করা।

(২) মু'জিযা নবী রাসূলের সাথে খাস। অর্থাৎ, নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কারো থেকে ঘটিত অলৌকিক বিষয়কে মু'জিযা বলা হয় না। পক্ষান্তরে ওলী-দরবেশ সকলের থেকেই কারামত প্রকাশ পেতে পারে।

(৩) ওলী তার অলৌকিক বিষয় গোপন রাখবেন। কিন্তু পয়গম্বরের দায়িত্ব হল, তার অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করে দেয়া।

(৪) ওলী নিজ কারামত সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল নাও হতে পারেন। কিন্তু নবী-রাসূল তার মু'জিযা না জেনে পারেন না।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে আরও বিশেষ যে সব আকীদা রাখতে হবে তা হল ঃ

১. আমাদের নবী (সাঃ)-এর নবুওয়াত বিশেষ কোন দেশ বা গোষ্টির জন্য নয় বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র জাহানের সকল জাতির জন্য নবী।

قال تعالى : وما ارسلنك الا كافة للناس -

অর্থাৎ, আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছি। (সূরাঃ ৩৪-সাবাঃ ২৮)

وقال : قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, হে লোক সকলেরা! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল। (সূরাঃ ৭-আ'রাফ ঃ ১৫৮)

وقال : تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا -

অর্থাৎ, মহান ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে। (সূরাঃ ২৫ - ফুরকান ঃ ১)

www.iscalibrary.com

وقال النبى ﷺ :كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة - (رواه الشيخان)

অর্থাৎ, পূর্বে (কোন কোন) নবী বিশেষভাবে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হতেন আর আমি সমগ্র মানব জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছি।

وقال النبى ﷺ : والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من هذه الامة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى ارسلت به الا كان من اصحاب النار - (مسلم)

অর্থাৎ, ঐ সত্তার কছম যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, এই উম্মতের ইয়াহুদী নাসারা যে কেউ আমার কথা জানার পরও আমার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামী হবে।

২. আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সকল নবীর চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। তিনি নবী রাসূলদের সর্দার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। কুরআন, হাদীছ, ইজ্‌মা ও কেয়াস দ্বারা এটা প্রমাণিত[১]

যেমন ঃ

(এক) এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সব নবী-রাসূল থেকে আমাদের নবী (সাঃ)-এর যুগ পাওয়ার শর্তে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন ও তাঁর নুসরত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتب وحكمة ثم جائكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه - (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ৮১)

(দুই) তাঁর উম্মতকে সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। আর উম্মত শ্রেষ্ঠ হয় দ্বীনী কামালিয়াতের ভিত্তিতে। আর দ্বীনী কামালিয়াত রাসূলের কামালিয়াতের অধীন। অতএব রাসূলের উম্মতের শ্রেষ্ঠ হওয়া তাঁরই শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ।

قال تعالى :كنتم خير امة اخرجت للناس الاية -

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ১১০)

(তিন) হাদীছে এসেছে ঃ

فضلت على الانبياء بست . الحديث - (رواه الشيخان)

অর্থাৎ, অন্যান্য নবীদের উপর ছয়টি বিষয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। (তার মধ্যে একটি হল আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।)

(চার) রাসূল (সাঃ)-এর শরী'আত সকল শরী'আতের চেয়ে কামেল ও পূর্ণাঙ্গ। আর শরীআত পূর্ণাঙ্গ ও কামেল হওয়া নবূওয়াত কামেল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

১. عقائد الاسلام للحقانى نقلا عن الشفاء ॥

www.iscalibrary.com

قال تعالى : اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ـ

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরাঃ ৫ - মায়িদাঃ ৩)

৪. তিনি খাতামুন্নাবীয়্যীন অর্থাৎ, শেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না। অন্য কেউ নবী হওয়ার দাবী করলে সে ভন্ড এবং কাফের।

قال تعالى : ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ـ

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয় বরং সে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ নবী। (সূরাঃ ৩৩ - আহযাব ঃ ৪০)

وقال النبى ﷺ : انا خاتم النبيين لا نبى بعد ى ـ (مسند احمد والطبرانى)

অর্থাৎ, আমি শেষ নবী; আমার পর আর কোন নবী নেই।

খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ দ্বিতীয় খণ্ডে "খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গ" শিরোনামে (দ্র ঃ পৃষ্ঠা ৩১৭) আলোচনা করা হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) সত্য নবী ছিলেন তার প্রমাণ

রাসূল (সাঃ) যে সত্য নবী ছিলেন উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীছ থেকে, বাস্তব ঘটনা থেকে এর প্রমাণ তিন হাজারের মত সংগ্রহ করেছেন। এ বিষয়ের উপর অনেক কিতাবও লেখা হয়েছে।

এই প্রমাণগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

১. নবী (সাঃ) যে সত্য নবী ছিলেন -তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে কুরআন। একজন উম্মী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নবী (সাঃ)-এর মুখ থেকে কুরআনের ন্যায় এরূপ মহাজ্ঞান ভান্ডারের গ্রন্থ প্রকাশ পাওয়াই প্রমাণ করে যে, তিনি মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসব জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন চ্যালেঞ্জও পেশ করেছেন । ইরশাদ করেছেনঃ

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صدقين ـ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا . الاية ـ

অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার উপরে যে কিতাব নাযিল করেছি, এ ব্যাপারে তোমাদের যদি সামান্যতম সন্দেহ থাকে (যে, এটা তাঁর রচনা করা কি-না, তাহলে এই কুরআনের বড় কোন সূরা নয়,) তাহলে এর ছোট্ট সূরার মত একটা সূরা রচনা করে দেখাও। (তোমরা নিজেরা যদি না পার, তাহলে) তোমাদের সব সহযোগীদের ডেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এরকম একটা সূরা রচনা করে দেখাও। (আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ) তবুও তোমরা এর সমকক্ষ রচনা পেশ করতে পারবে না। (বাস্তবেও কোন দিন কেউ কুরআনের সমকক্ষ রচনা পেশ করতে পারেনি)। (সূরাঃ ২ - বাকারা ঃ ২৩)

www.iscalibrary.com

২. নবী (সাঃ)-এর দ্বারা বহু সংখ্যক মু'জিযা প্রকাশ পাওয়া।

৩. নবী (সাঃ)-এর সত্য হওয়ার আর একটি প্রমাণ হল তাঁর মহরে নবুওয়াত। নবী (সাঃ)-এর পিঠে মহরে নবুওয়াত বা নবুওয়াতের সীল মহর ছিল। অর্থাৎ, তাঁর পিঠে বিশেষ একটা চিহ্ন ছিল। এটা ছিল একটু উঁচু কাল একটা মাংসখন্ড। সাহাবায়ে কেরামও এটা দেখেছেন। আগের যুগের কিতাবেও এ সম্বন্ধে বর্ণনা ছিল।

৪. নবী (সাঃ)-এর সত্য হওয়ার আরও একটা বড় প্রমাণ হল- সেই যুগের কাফেররাও, সেই যুগের ঘোর শত্রুরাও রাসূল (সাঃ) কে মিথ্যুক বলতে পারেনি। মুসলমান, অমুসলমান, শত্রু, বন্ধু নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে "আল-আমীন" বলে ডাকত। অর্থাৎ, সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্যবাদী। তিনি যখন নবুওয়াতের দাবী করেছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বাণী প্রাপ্ত হওয়ার দাবী করেছেন, তখনও তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি। বরং তাঁকে সত্যবাদীই মনে করেছে।

তখনকার কাফেরদের একজন বড় নেতা ছিলেন নযর ইবনে হারেছ। তিনি একদিন গোত্রের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট লোকদেরকে ডেকে বললেনঃ এত বৎসর যাবত মুহাম্মাদের পুরো জীবন আমাদের মধ্যে কেটেছে। এতদিন তোমরা সবাই তাঁকে আল-আমীন বলে ডেকে আসছ। আর এখন যখন তাঁর চুল পাকা শুরু হয়েছে, যখন সে নবুওয়াত পাওয়ার দাবী করছে, এখন তোমরা তাঁকে মিথ্যা বলবে কিভাবে? মিথ্যা বলার বয়স তো পার হয়ে গেছে। সেতো পরীক্ষিত সত্যবাদী। এখন সে নবুওয়াতের দাবী করার পর তোমরা তাঁকে মিথ্যুক বলতে পার না। এটা তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষার মুহূর্ত। এখন তোমাদের কি উপায় আছে তা ভেবে দেখ।

রাসূল (সাঃ)কে তারা সকলে সত্যই জানতো। এতদ্বসত্ত্বেও তারা যতটুকু বিরোধিতা করত, তা শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যই করত; একটা ঘটনা - একবার হজ্জের মৌসুমের আগে মক্কার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ পরামর্শের জন্য এক জায়গায় সমবেত হল যে, এখন হজ্জের মৌসুম আসছে। দেশ বিদেশ থেকে বহু লোক আসবে। মুহাম্মাদ তাঁর ধর্মের কথা প্রচার করবে। এভাবে তাঁর ধর্ম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। বহু লোক মুসলমান হয়ে যাবে। এটাকে ঠেকানোর উপায় কি? তখনকার সময় মুশরিকদের মধ্যকার সবচেয়ে প্রবীন নেতা ওলীদ ইব্‌নে মুগীরা। সে একে একে সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করা শুরু করল।

একজন বললঃ আমরা প্রচার করে দিব যে, সে পাগল। সে পাগলের মত আবোল-তাবল বকে চলেছে, তার কথার কোন আগাগোড়া নেই, কোন দিক দিশা নেই। ওলীদ ইব্‌নে মুগীরা বললঃ যদি এটা বল, তাহলে মানুষ যখন তার কথা শুনবে, শুনেই বুঝবে যে, এটা পাগলের কথা নয়। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকেই মানুষে মিথ্যুক জানবে।

আর একজন বললঃ তাহলে আমরা তাকে কবি বলে দিব। আমরা বলব, সে খুব ভাল ভাষা জানে। কাব্য রচনা করে কথার যাদু দিয়ে সে মানুষকে মুগ্ধ করে ফেলে। ওলীদ ইব্‌নে মুগীরা বললঃ এই যুক্তিও চলবে না। আরব দেশের সবাই কবিতা সম্পর্কে ধারণা রাখে। কবিতা কি, কবিতার কথা কি হয়, আর মুহাম্মাদের কথা কি এই দুইয়ের মধ্যে

www.iscalibrary.com

পার্থক্য সবাই বুঝতে পারবে। তখন শেষ পর্যন্ত লোকেরা বলবে তোমরাই মিথ্যুক, তোমরাই মিথ্যা প্রচার করছ। এতে করে তার প্রতি মানুষের ভক্তি আরও বেড়ে যাবে। অতএব এই যুক্তিও চলবে না।

আরেকজন বললঃ তাহলে আমরা তাকে যাদুকর বলে দিব। ওলীদ ইব্নে মুগীরা বললঃ যাদুতো আমরাও জানি। যাদুর কথা আর মুহাম্মাদের কথা এক নয়। আরবের বহু লোকও যাদু জানে। তারা তার বাণী শুনবে। শুনে বুঝবে যে, এটাতো যাদু নয়, এতো আদর্শের কথা বলা হচ্ছে। যাদুর ভিতরতো কোন আদর্শের কথা থাকে না। যাদুর ভিতর কেবল নির্দিষ্ট কিছু শব্দ মন্ত্র পাঠ করা হয়। অতএব মানুষ বুঝবে যে, মুহাম্মাদের কথা যাদু নয়, তোমরাই মিথ্যা প্রচার করছ। তোমাদেরকেই মিথ্যুক বলা হবে। এভাবে তাদের অনেকে অনেক রকম প্রস্তাব দিল কিন্তু তাকে মিথ্যুক বলে দেয়া হবে - এ প্রস্তাব কেউ দিতে পারল না। কারণ, এতদিন তারা তাঁকে আল-আমীন বলে আসছে, এখন তাঁকে মিথ্যুক কিভাবে বলবে? এভাবে কোন দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তুলনা মুলক ভাবে সহজ মনে করে তারা তাঁকে যাদুকর বলেই অপপ্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নিল।

তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নেতাকে লক্ষ্য করে বলেছিল স্যার! যদি মুহাম্মাদের কোন দোষই না থাকে, তাহলে তাঁকে মানতে আমাদের বাঁধা কোথায় ? ওলীদ ইব্নে মুগীরা বলেছিল ঃ তোমরা জানো আমরা হলাম আব্দে মানাফ গোত্রের লোক, আর মুহাম্মাদ হল বনু হাশেম গোত্রের লোক। এই দুই গোত্রের মধ্যে সুদীর্ঘ কাল ধরে একটা প্রতিযোগিতা চলে আসছে। তারা কোন ভাল কাজ করলে আমরাও অনুরূপ একটা ভাল কাজ করে দেখাই। কখনও কোন ব্যাপারে আমরা তাদের থেকে পিছিয়ে থাকি না। এখন ঐ বংশের লোকেরা বলছে তাদের মধ্যে একজন নবী হয়েছেন। আমরা কোন নবী পেশ করতে পারছি না। এ অবস্থায় যদি আমরাও তাঁকে মেনে নেই, তাহলে আমাদের গোত্র ছোট হয়ে যাবে। তাই আমরা তাঁকে মানতে পারছি না। দেখা গেল - নবী (সাঃ) যে সত্য নবী, এটা তারা সকলেই বিশ্বাস করত। কিন্তু শুধু একটা ঠুনকো স্বার্থের কারণে তারা তাঁকে মানত না।

তখনকার কাফেরদের এক বড় নেতা ছিলেন আবু সুফিয়ান। আর এক বড় নেতা আখ্নাছ ইবনে শোরায়ক। একদিন আখ্নাছ ইব্নে শুরায়ক চিন্তা করল যে, আমরা সবাই যখন মুহাম্মাদকে সত্য বলে বিশ্বাস করি, তাহলে তাকে মানি না কেন? এর একটা সুষ্ঠ ফয়সালা হওয়া চাই। সে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে গেল। আবু সুফিয়ানকে বললঃ মুহাম্মাদের মধ্যে যদি কোন দোষ না থাকে, তাহলে আমাদের মেনে নিতে অসুবিধা কি ? আবু সুফিয়ান আমতা আমতা করে শেষ পর্যন্ত বললঃ আমরা তাঁর কোন দোষ দেখাতে পারব না। তারপর সে আর এক নেতা আবু জেহেলের কাছে যেয়ে বললঃ মুহাম্মাদের কোন দোষ না থাকলে আমরা তাঁকে মেনে নেই ? আবু জেহেল বললঃ মুহাম্মাদের মধ্যে কোন দোষ নেই, তবে অসুবিধা একটাই; তা হল মুহাম্মাদ বনু হাশেম গোত্রের লোক। এখন আমরা যদি তাঁকে নবী মেনে নেই, তাহলে আমাদের গোত্র ছোট হয়ে যায়। তাই আমরা তাঁকে মেনে নিতে পারছি না। (معارف القرآن)

www.iscalibrary.com

৫. আরও একটা বড় প্রমাণ হল আগের যুগের আসমানী কিতাব সমূহের বর্ণনা। রাসূল (সাঃ)-এর যুগে আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিল বিশেষ ভাবে দুইটা দল। একটা হল ইয়াহুদী, আরেকটা হল নাসারা বা খৃষ্টান। ইয়াহুদীদের কিতাব হল তাওরাত, আর নাসারা বা খৃষ্টানদের কিতাব হল ইঞ্জীল। এই তাওরাত এবং ইঞ্জীলে পরিষ্কার ভাবে রাসূল (সাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ ছিল। এমনকি তাঁর দেহের গঠন কেমন হবে, তাঁর চোখ কেমন হবে, তাঁর চুল কেমন হবে, কোন্ অবস্থায় তিনি আবির্ভূত হবেন, কোন্ এলাকায় তিনি আবির্ভূত হবেন, কখন কখন তিনি সফরে যাবেন, এইসব অবস্থাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা ছিল। আগের যুগের ঐতিহাসিকরা তাওরাত এবং ইঞ্জীল থেকে এরকম বহু উদ্ধৃতি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, শেষ নবীর আগমন এবং তাঁর গুণাগুণ ইত্যাদি সম্পর্কে কত পরিষ্কার বর্ণনা এসব কিতাবে ছিল। নিম্নে এরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

বাইবেল (ইঞ্জিল) থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে ইঞ্জিলে (বাইবেলে) যেসব প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে তার কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল।[১]

যীশুখ্রীষ্টের সমসময়ে সাধু যোহন (St.John) আবির্ভূত হয়েছিলেন। জেরুজালেম থেকে ইয়াহুদীরা কতিপয় পাদ্রীকে তাঁর পরিচয় নেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। তাঁরা এসে যোহনকে যে-কয়টি প্রশ্ন করেন এবং যোহন তার যে-উত্তর দেন, তাতেই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের খবর পাওয়া যায়। বাইবেলে এরূপ উল্লেখিত হয়েছে ঃ

অর্থাৎ, "যোহন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয়েছে যে, যখন জেরুজালেম থেকে ইয়াহুদীদের দ্বারা প্রেরিত কতিপয় পাদ্রী এসে যোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কে ? তখন যোহন স্বীকার করলেন, আমি যীশুখ্রীষ্ট নই। তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, তবে আপনি কে ? আপনি কি ইলিয়াস ? তিনি বললেন, আমি ইলিয়াস নই। আপনি তবে কি সেই নবী ? যোহন উত্তর দিলেন, না। তখন তারা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, যদি আপনি যীশুখ্রীষ্ট, ইলিয়াস, অথবা সেই নবী না হন, তবে কেন বাপ্তাইজ[২] করছেন ? যোহন উত্তর দিলেন, আমি পানি দ্বারা বাপ্তাইজ করি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছে, যাঁকে তোমরা জান না।

তিনিই সেই জন যিনি আমার পরে এসেও আমা অপেক্ষা সম্মানের অধিকারী হবেন এবং আমি যাঁর জুতার ফিতা খুলবারও যোগ্য নই।"

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, যীশুখ্রীষ্ট এবং ইলিয়াস ছাড়া তৃতীয় আর একজন নবী যে আসবেন, সেকথা ইয়াহুদীরা জানত।

১. উদ্ধৃতিগুলো কবি গোলাম মোস্তফা রচিত বিশ্বনবী গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এর ইংরেজি ইবারত পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ২. "বাপ্তাইজ" (baptism) অর্থ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা; খ্রীষ্টধর্মমতে জলে অবগাহন বা জল সিঞ্চন ও নামকরণ ॥

www.iscalibrary.com

এই 'সেই নবী' যে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ-ই, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই; কারণ যীশুখ্রীষ্টের পরবর্তী পয়গম্বর (এবং সর্বশেষ পয়গম্বর)-ই হচ্ছেন 'হযরত মুাহম্মাদ')। যীশুখ্রীষ্ট নিজেও বলেছেন ঃ

"যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, তবে আমার উপদেশমত কার্য কর, আমি স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করব, যাতে তিনি তোমাদেরকে আর একজন শান্তিদাতা প্রেরণ করেন-যিনি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন।"[২]

তিনি আরও বলেছেন ঃ যা হোক, আমার উচিত যে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি চলে যাই, কারণ আমি না গেলে সেই শান্তিদাতা আসবেন না, কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁকে পাঠিয়ে দিব।[৩]

অন্যত্র আছে ঃ "যা হোক, যখন সেই সত্য-আত্মা, আসবেন, তখন তিনি তোমাদেরকে সর্বপ্রকার সত্যপথে চালিত করবেন, কারণ তিনি নিজের কথা কিছু বলবেননা

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা) বাইবেলের ইংরেজী ইবারত নিম্নরূপঃ

" And this is the record of John, when Jews sent priests and Laits from Jerosalem to ask him, who art thou ?

And he confessed and denied not-I am not the christ.

And they asked him, what then ? Art thou Elias ? And he saith, I am not Art thou THAT PROPHET ? And he answered, No- And they asked him and said unto him, why baptizest thou them, if thou be not the Christ, not Elias, neither that prophet ?

Johin answered them, saying baptize with water, but there standeth one amongst you whom ye know not.

He it is who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose. "

-(John. chap, 1 : 19-27) ॥

২. এর ইংরেজী ইবারত নিম্নরূপ ঃ

" If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever. "

-(John. 14 : 15-16) ॥

৩. এর ইংরেজী ইবারত নিম্নরূপ ঃ

" Nevertheless I tell you the truth. It is expedient for you that I go away ; for if I go not away, the comforter will not come unto you : but if I depart I will send him unto you,"

-(John. 17 : 7-8) ॥

www.iscalibrary.com

কিন্তু যা তিনি (ঈশ্বরের নিকট হতে) শুনবেন, তাই বলবেন, এবং তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা দেখাবেন।"[১]

এই 'শান্তিদাতা' (paraclete) কে ? হযরত মুহাম্মাদকেই কি স্পষ্টাক্ষরে এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে না ? যীশুখ্রীষ্টের পরে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হননি। তা ছাড়া paraclete শব্দের অর্থও হচ্ছে 'শান্তিদাতা', অথবা 'চরম প্রশংসিত'। এই দুটি বিশেষণই হযরত মুহাম্মাদের জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই এ-সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাওরাত থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি

ইয়াহুদীদের ধর্মশাস্ত্র 'তওরাত'-এ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে। কবি গোলাম মোস্তফা রচিত বিশ্বনবী থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ[২]

"তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হতে আমার (মূসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করবেন, তাঁর কথা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে।"[৩]

অন্যত্র আছে ঃ

"(ঈশ্বর বলছেন) আমি তাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হতে তোমার (মূসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করব এবং তাঁর মুখে আমার বাণী প্রকাশ করব। তিনি তোমাদেরকে আমি যা আদেশ করব তা-ই শুনাবেন। এবং এটা অবশ্য ঘটবে যে, তাঁর মুখ-নিঃসৃত আমার সেই বাণী যারা শুনবে না, তাদেরকে আমি শুনতে বাধ্য করব।"[৪]

১. এর ইংরেজী ইবারত নিম্নরূপ ঃ

" How be it, when he the spirit of truth is come, he will guide you unto all truth, for he shall not speak of himself but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come." (John : 13-16) ॥

২. উদ্ধৃতিগুলো কবি গোলাম মোস্তফা রচিত বিশ্বনবী গ্রন্থ থেকে গৃহীত ॥

৩. এর ইংরেজী ইবারত নিম্নরূপ ঃ

" The Lord thy God will raise up unto thee a prophet frm the midst of thy brethren, like unto me. Unto him ye shall hearken " -(Duet. 15 : 18) ॥

৪. এর ইংরেজী ইবারত নিম্নরূপ ঃ

" I will raise them upaa prophet from among ther brithren, like unto thee, and willl put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass hat whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him." -(Duet, 18 ; 18-19) ॥

www.iscalibrary.com

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখুন ঃ

"এবং ঈশ্বরের মনোনীত পুরুষ মূসা মৃত্যুর পূর্বে এই বলে বনী-ইসরাঈলদেরকে আশীর্বাদ করলেন এবং তিনি বললেন ঃ প্রভু (মূসা) সিনাই পর্বত হতে আসলেন এবং সিয়ের (Seir) পর্বত হতে উঠলেন, কিন্তু তাঁর (অর্থাৎ, যিনি আসবেন) জ্যোতি ফারাণ পর্বত হতে বিকীর্ণ হল; তিনি দশ হাজার ভক্ত সঙ্গে আনলেন এবং তাঁর দক্ষিণ হস্ত হতে এক জীবন্ত আইনগ্রন্থ বের হল।"[১]

এই সমস্ত উক্তি যে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তা স্বীকার করবেন।

উল্লেখ্য এখন যে তাওরাত-ইঞ্জীল অর্থাৎ, এখন যে বাইবেল পাওয়া যায়, তাতে সে সব বর্ণনা পাওয়া যায় না। কারণ বর্তমান তাওরাত-ইঞ্জিল বিকৃত তাওরাত-ইঞ্জিল। প্রকৃত তাওরাত এবং ইঞ্জীলের বহুস্থানে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ ছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইয়াহুদী-খৃষ্টান পন্ডিতরা সে সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত ছিল -এর বহু প্রমাণও আছে। যথা ঃ

১. তখন মদীনায় বনূ কুরাইজা এবং বনূ নাজীর নামক দুটো ইয়াহুদী গোত্র বাস করত। ঐ এলাকার অন্যান্য অধিবাসীদের সংগে তাদের সব সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। সেসব যুদ্ধে ইয়াহুদীরা পরাজিত হলে তারা বলতঃ শেষ যামানার নবী এই এলাকায় হিজরত করতে আসবেন, আমরা তাকে চিনতে পারব, তোমরা তাকে চিনতে পারবে না। কারণ তাঁর অবস্থা সম্পর্কে আমাদের কিতাবে বর্ণনা আছে। যার ফলে তাঁকে আমরা চিনতে পারব এবং তাঁকে চিনে আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে যাব এবং তাঁর সংগে মিলে তোমাদের সংগে যুদ্ধ করে তোমাদেরকে পরাজিত করব। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআন শরীফে এটা বর্ণনা করে বলেছেনঃ

فلما جاء هم ما عرفوا كفروا به -

অর্থাৎ, তারপর যখন সেই নবী ঠিকই এসে গেল (এবং সেই কিতাব কুরআন ঠিকই এসে গেল) যা তারা চিনত, তখন তারা অস্বীকার করে বসল। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ৮৯) নিজেদের হীনস্বার্থ রক্ষার জন্যই তাদের মধ্যে অস্বীকার করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছিল। তারা ভেবেছিল এখন আমরা এ নবীর অনুসারী হলে আমাদের নেতৃত্ব আর থাকবে না এবং

১. এর ইংরেজী ইবারত নিম্নরূপ ঃ

" And this is the blessing wherewith Moses, the man of God, blessed the children of Israel before hie death :

And he said, The Lord came from Sinai and rose uo from Seir unto them; he shined from mount paran and he came with thousands of Saints; from his right hand went a fiey law them. "

-(Duet. 33 :1-2) ॥

www.iscalibrary.com

আমাদের অনুসারীদের থেকে যেসব অর্থ-কড়ি পাই, তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এসব ভেবেই তারা নবীকে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তারা চিনতে পেরেছিল যে, ইনি-ই সেই নবী। চিনতে তাদের মোটেই ভুল হয়নি। আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ

الذين اتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون ابناء هم-

অর্থাৎ, এই কিতাবীরা অর্থাৎ, ইয়াহুদী-নাসারারা নবীকে চেনে, যেমন নিজেদের পুত্রকে তারা চেনে। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ২০) নিজের পুত্রকে যেমন তারা চেনে, এই নবীকেও তারা ওভাবেই চেনে। তারা জেনে শুনেই স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সত্যকে অস্বীকার করত এবং সত্যকে গোপন করত।

২. তখনকার যুগে ইয়াহুদীদের মধ্যে একজন বড় পন্ডিত ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে সালাম। তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনারা নবীকে নিজেদের পুত্রের মতই চিনতে পেরেছেন? তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন নিজের পুত্রকে নিয়েও অনেক সময় সন্দেহ হয়, কিন্তু এই নবীকে চেনার ব্যাপারে তার এতটুকুও সন্দেহ ছিল না। নবীকে এরূপ চিনতে পারার কারণ হল তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে এই নবীর গুণাগুণ ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত ছিল।

রাসূল (সাঃ)-এর বয়স যখন ১২ বছর, তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশে যাচ্ছিলেন। বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত বুছরা নামক শহরের কাছে যখন তারা পৌঁছেন, তখন আবু তালিবের বাণিজ্যিক কাফেলা সেখানে বিরতি নিচ্ছিল। পাশে ছিল একজন খৃষ্টান পন্ডিতের আস্তানা। তার নাম ছিল জরজীস। 'বুহায়রা রাহেব' নামে সে প্রসিদ্ধ ছিল। যখন কাফেলা ওখানে অবস্থান নিল, তখন বুহায়রা রাহেব তার আস্তানা থেকে বের হয়ে আসল। খুঁজতে খুঁজতে মুহাম্মাদের কাছে এসে বলল, আমি একেই খুঁজছি। কারণ, যখনই কাফেলা এখানে আসে, আমি লক্ষ্য করেছি সমস্ত গাছপালা, সমস্ত পাহাড়-পর্বত কার উদ্দেশ্যে যেন সাজদা করছে। আমি জানি, আমাদের কিতাবে আছে নবী ছাড়া আর কারও জন্য এরকম সব কিছুতে সাজদা করে না। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে আখেরী যামানার নবী মুহাম্মাদ ছাড়া আর কোন নবী আসবেন না। তাই আমি বুঝলাম অবশ্যই শেষ যামানার নবী এই কাফেলায় আছেন এবং এই হল সেই নবী। প্রমাণ হল তাঁর পিঠে মহরে নবুওয়াত আছে। পন্ডিতজী সকলকে দেখালেন যে, এই দেখ তাঁর পিঠে মহরে নবুওয়াত রয়েছে।

তারপর সেই খৃষ্টান পন্ডিত লোকটি রাসূল (সাঃ)-এর চাচা আবূ তালিবকে ডেকে বললঃ একে দেশে পাঠিয়ে দিন। এটা ইয়াহুদীদের এলাকা, এখানে তাঁর অনেক শত্রু রয়েছে এবং এই সময়ে অত্র অঞ্চলে তাঁর আগমন ঘটবে কিতাবের মাধ্যমে সে সম্বন্ধে তারা সবাই অবগত রয়েছে। অতএব এখানে অবস্থান তাঁর জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সত্বর তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দিন। ইতিমধ্যেই সাতজন লোক সেখানে আসল। তারা এসেছিল রূম দেশ থেকে। তারা ঐ পন্ডিতের কাছে জিজ্ঞাসা করল যে, এদিকে আরবদের

www.iscalibrary.com

কোন কাফেলা এসেছে কি ? তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ তোমরা কেন আরবদের কাফেলা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ ? তারা বললঃ আমাদের এলাকার পন্ডিতগণ আমাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, এই সময়ে অত্র এলাকায় শেষ নবীর আগমন ঘটবে, এই সময় তিনি এই এলাকায় সফরে আসবেন। আমরা তার সন্ধানে এসেছি। আমরা তাকে হত্যা করার জন্য এসেছি। বুহায়রা রাহেব তাদেরকে বললেনঃ যদি তিনি আল্লাহ্‌র নবীই হয়ে থাকবেন, তাহলেতো আল্লাহ্‌ই তাঁকে রক্ষা করবেন, তোমরা তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। অতএব তোমরা ফিরে যাও। তারা বললঃ হ্যাঁ কথা ঠিক। এই বলে তারা ফিরে গেল। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় - সে যুগের খৃষ্টান পন্ডিতরা ভালভাবে জানত যে আখেরী নবীর অবস্থা কি হবে।

নবী (সাঃ)-এর বয়স যখন ২৫ বছর, তখন তিনি খাদীজা (রাঃ)-এর মাল নিয়ে ব্যবসা করার জন্য আরেকবার শাম দেশে সফরে গিয়েছিলেন। তখন ঐ আস্তানার খৃষ্টান পন্ডিত ছিল নাছতূরা। তাকে নাছতূরা রাহেব বলা হত। সেও নবী (সাঃ) কে দেখে চিনে ফেলেছিল যে, ইনি-ই শেষ যামানার নবী এবং সে স্বীকার করেছিল যে, আমাদের কিতাবে আছে যে, এই সময় তিনি এই এলাকায় সফরে আসবেন। এ থেকে বোঝা যায় - তখন এই সব বর্ণনা তাদের কিতাবে ছিল। তবে এখন ইঞ্জীলে এই সব বর্ণনা পাওয়া যায় না। কারণ ইঞ্জীলকে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রেরিত আসল ইঞ্জীল দুনিয়ার কোথাও নেই। যা এখন আছে, তা মানুষের রচিত বিকৃত ইঞ্জীল আছে।

আর একটা ঘটনা - রাসূল (সাঃ) রোমের সম্রাট হেরাক্‌ল-কে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। ইংরেজীতে হেরাক্‌ল-কে বলা হয় হেরাক্লিয়ার্স। হেরাক্লিয়াস সেই পত্র পাঠ করে নবীর সত্যতা যাচাই করার জন্য তখনকার যুগের সবচেয়ে বড় খৃষ্টান পন্ডিত লাটপাদ্‌রী জগাতির-এর কাছে সেই চিঠি পাঠিয়ে দেয়। জগাতির সংবাদ পাঠায় যে, আমাদের জানামতে শেষ নবীর আগমনের সময় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, এই হলেন সে-ই নবী। তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূল (সাঃ) দ্বিতীয়বার দেহ্‌ইয়ায়ে কালবী (রাঃ)-কে দূত বানিয়ে হেরাক্লিয়াসের নিকট পত্র দিয়েছিলেন। হেরাক্লিয়াস বলেছিলঃ আমি কি করব ? আমার লোকজন তো মানবে না। সে দেহ্‌ইয়ায়ে কালবীকে তখনকার লাটপাদ্‌রীর কাছে সত্যতা যাচাই করার জন্য পাঠাল। লাটপাদরী বিস্তারিত জেনে লোকদেরকে ডেকে সকলের সামনে বললঃ শেষ নবীর আগমন ঘটেছে, তোমরা সকলে তার উপর ঈমান আন। আমিও ঈমান আনলাম। সকলের সামনে কালেমায়ে শাহাদাৎ পাঠ করে সে মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু লোকেরা তাকে সেই মজলিসেই শহীদ করে দিল। দেহ্‌ইয়ায়ে কাল্‌বীর মুখে ঘটনা শুনে হেরাক্লিয়াস বলল, বড় লাটপাদরীর যখন এই অবস্থা, তখন আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই, তাহলে আমার লোকজন এবং আমার প্রজারাও আমাকে হত্যা করে দিবে।

অনেক ইয়াহুদী-খৃষ্টান পন্ডিতদের সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা বোঝা সত্ত্বেও মানত না। একবার নাজরান থেকে খৃষ্টানদের একটা প্রতিনিধি দল রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসেছিল। রাসূল (সাঃ) যখন কোন ভাবেই তাদেরকে ইসলামের কথা মানাতে পারলেন না,

www.iscalibrary.com

তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাদেরকে "মুবাহালা" করার জন্য আহবান জানালেন। "মুবাহালা" অর্থ প্রত্যেক পক্ষ আল্লাহ্‌র কাছে এই প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যে পক্ষ মিথ্যা, তাদেরকে ধ্বংস করে দাও। রাসূল (সাঃ) এরূপ দুআ করার জন্য প্রস্তুত হলেন, কিন্তু তারা প্রস্তুত হলনা বরং তারা একে অপরের সাথে পরামর্শ করে জিয্‌য়া কর দিতে রাজী হয়ে ফিরে গেল। তারা মুবাহালা করতে সাহস পেল না।

এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা নবী (সাঃ) যে সত্য তা ভাল করেই জানত। কারণ তাদের কিতাব তাওরাত-ইঞ্জীলে এ জাতীয় বর্ণনা ছিল।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে রাসূল (সাঃ) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদ উপনিষদ ও পুরাণে ঃ

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদ উপনিষদ, পুরাণেতো আল্লাহ্, রাসূল, মুহাম্মাদ এই সমস্ত নামও পরিষ্কারভাবে ছিল। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল ঃ[১]

'অথর্ববেদীয় উপনিষদ'-এ আছে ঃ

অস্য ইল্ললে মিত্রাবরুণো রাজা
তস্মাৎ তানি দিব্যানি পুনস্তং দুধ্যু
হবয়ামি মিলং কবর ইল্ললাং
অল্লো রসুল মহমদকং
বরস্য অল্লো অল্লাম ইল্লোল্লেতি ইল্লাল্লা ॥৯॥

'ভবিষ্য পুরাণে' আছে ঃ

এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিত ঃ।
মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিত ঃ ॥৫॥
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম্
গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্য সমন্বিতৈঃ
চন্দনাদিভিরভ্যর্চ তুষ্টাব মনসা হরম ॥৬॥
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে
ত্রিপুরাসুরনাশায় বহুমায়া প্রবর্তিনে ॥৭॥

ভোজরাজ উবাচ-

ম্লেচ্ছৈর্গুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
ত্বং মাং হি কিঙ্করং বিদ্ধি শরনার্থ মুপাগতম্ ॥৮॥

ভাবার্থ ঃ ঠিক সেই সময় 'মহামদ' নামক এক ব্যক্তি- যাঁর বাস 'মরুস্থলে' (আরব দেশে) আপন সাঙ্গোপাঙ্গসহ আবির্ভূত হবেন। হে আরবের প্রভূ, হে জগতগুরু, তোমার প্রতি আমার স্তুতিবাদ। তুমি জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করার বহু উপায় জান, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ। আমি তোমার দাস। আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও।

১. কবি গোলাম মোস্তফা রচিত "বিশ্বনবী" গ্রন্থ থেকে গৃহীত ॥

www.iscalibrary.com

'অল্লোপনিষদ'-এর একটি স্থানে দেখতে পাওয়া যায় ঃ

হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রা ঃ।

অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণ অল্লাম।।

অল্লোরসুল মহমদকং বরস্য অল্লো অল্লাম।

আদল্লাহ্বুকমে ককম অল্লাবুক নিখাতকম। ॥৩॥

ভাবার্থ ঃ আল্লাহ্ সকল গুণের অধিকারী। তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মুহম্মদ আল্লাহ্র রসূল। আল্লাহ্ আলোকময়, অক্ষয়, এক, চির পরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভূ।

'অর্থবেদ'-এ উল্লেখিত আছে। ঃ

ইদং জনা উপশ্রুত নরাশংসস্তবিষ্যতে ॥

ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চ কৌরম আরুশমেষু দঘহে ॥১॥

ভাবার্থ ঃ হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। 'প্রশংসিত জন' লোকদের মধ্য হতে উত্থিত হবেন। আমরা পলাতককে ৬০,০০০ জন শত্রুর মধ্যে পেলাম।

বলা বাহুল্য এখানে যে হযরত মুহাম্মাদের কথাই বলা হয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই, কারণ মুহাম্মাদের অর্থই হচ্ছে 'প্রশংসিত জন' আর মক্কার অধিবাসীদের তৎকালীন সংখ্যাও ছিল প্রায় ৬০,০০০।

এই কিছুদিন পূর্বে ভারতের ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বেদ প্রকাশ এক গবেষণায় বলেছেন যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদে "কলির অবতার" বলে যার উল্লেখ রয়েছে, যিনি শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন এবং হিন্দুরা যাকে পূজা দেবে বলে প্রতিক্ষায় রয়েছে, তিনি আর কেউ নন -তিনি হলেন মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ইব্নে আব্দুল্লাহ। অধ্যাপক বেদ প্রকাশের এই গবেষণা সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য এই মর্মে ভারতের স্বনামধন্য আটজন গবেষক পন্ডিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পন্ডিত বেদ প্রকাশ তার গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতার পেছনে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বেদ থেকে ৯টি যুক্তি তুলে ধরেছেন।[১] যেমন হিন্দু ধর্মের বাণী অনুযায়ী "কলির অবতার" জন্ম গ্রহণ করবেন একটি দ্বীপদেশে। এটা হল সেই আরব ভূখন্ড যা "জাযীরাতুল আরব" বলে পরিচিত। অতএব এটা মুহাম্মাদ-এর ব্যাপারেই প্রযোজ্য। এমনিভাবে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থে 'কলির অবতার'-এর পিতার নাম 'বিষ্ণু ভাগত' এবং মায়ের নাম 'সোমানির' উল্লেখ রয়েছে। সংস্কৃতিতে 'বিষ্ণু'-এর অর্থ আল্লাহ এবং 'ভাগত'-এর অর্থ দাস। সুতরাং আরবীতে এর অর্থ দাঁড়ায় আব্দুল্লাহ বা আল্লাহ্র দাস। আর 'সোমানির' অর্থ শান্তি; আরবীতে আমীনা অর্থ শান্তি। অতএব এসবের প্রেক্ষিতে কলির অবতার মুহাম্মাদই হবেন, কারণ তার পিতার নাম

১. নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "বাংলা পত্রিকা"-র ১৬-১-১৯৯৮ সংখ্যা ॥

www.iscalibrary.com

আব্দুল্লাহ আর মায়ের নাম আমীনা। পন্ডিত বেদ প্রকাশ এভাবে নয়টি প্রমাণ পেশ করেছেন যে, হিন্দু ধর্মে যে কলির অবতার -এর কথা উল্লেখ আছে, তিনি নিঃসন্দেহে মুসলমানদের নবী মুহাম্মাদ।

উল্লেখ্য ঃ বেদ, উপনিষদ পুরাণের এই অংশ গুলো ছাপা হয় না এবং প্রচারও করা হয় না। এমনিতেই হিন্দু ধর্মমতে একমাত্র ব্রাহ্মণরা ব্যতীত অন্য কারও ধর্মগ্রন্থ পড়ার অধিকার নেই। যে ব্রাহ্মণরা ধর্ম গ্রন্থ পড়ার অধিকার রাখে, তারাও বেদ, উপনিষদ, পুরাণের ঐ অংশগুলি হাতের নাগালে পায় না, যে অংশগুলির মধ্যে আল্লাহ, রাসূল ও মুহাম্মাদ সম্পর্কে এসব কথা লেখা আছে।

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য[১] "আমি কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম" গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমি ব্রাহ্মণ হিসেবে দীক্ষা নেয়ার পর বেদ, উপনিষদ, পুরাণের এই সব অংশগুলো না পাওয়ায় আমার মধ্যে জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হল এ অংশগুলি পড়ি না কেন? এবং এ অংশগুলি পাই না কেন? ঠাকুর দাদাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কিছু গোলমেলে উত্তর দেন, যার ফলে আমার মধ্যে ঐ অংশগুলি সম্বন্ধে জানার ঔৎসুক্য আরও বৃদ্ধি পায়। যা হোক -পরে তিনি অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে, ঐ অংশগুলির মধ্যে ইসলাম ধর্মের কথা বলা হয়েছে, শেষ নবীর আগমনের কথা বলা হয়েছে, শেষ নবীর কথা মানতে বলা হয়েছে, একত্ববাদের কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, ঐ সব অংশ গোপন রেখে তাদের ধর্মকে চালানো হচ্ছে। ঐ সব অংশ সাধারণ্যে জানাজানি হলে তাদের ধর্মের জারী-জুরী ফাঁস হয়ে যাবে। তিনি বুঝলেন ধর্মের নামে এভাবে লুকোচুরি খেলা হচ্ছে। এরপর তিনি মুসলমান হয়ে যান।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এসব ধর্মে শেষ নবীর সম্বন্ধে এসব ভবিষ্যদ্বাণী এল কিভাবে? এ প্রশ্নের জবাব হল - এসব ধর্ম এখন সম্পূর্ণ রূপে ভ্রান্ত। হতে পারে, এসব ধর্মের পূর্বসূরী কোন মনীষী আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্ত ছিলেন বা অন্ততঃ তারা সত্যপন্থী ছিলেন। তারা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে জেনে একথাগুলো বলেছেন, আর তাদের মূল্যবান বাণী হিসেবে এসব কথা তাদের ধর্মগ্রন্থে এসে গেছে। কিংবা বলা যায় আর্য ঋষিগণ ধ্যানবলে হাজার হাজার বৎসর পূর্বেই মুহাম্মাদের স্বরূপ ও আবির্ভাব সম্বন্ধে এসব তথ্য অবগত ছিলেন। কিন্তু আস্তে আস্তে এসব পূর্বসূরীদের সত্য খাঁটি আদর্শগুলো বিকৃত হতে হতে এখন এই পর্যায়ে চলে এসেছে যে, এখন আর এসব ধর্মকে কোনভাবেই খাঁটি ধর্ম বলার উপায় থাকেনি।

১. তিনি ফরিদপুরের একজন বড় ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে মুসলমান হয়ে যান। ইসলাম গ্রহণের পর নাম রাখেন আবুল হোসেন। আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য নামেই তিনি পরিচিত ॥

www.iscalibrary.com

বৌদ্ধ শাস্ত্রে ঃ

বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দিঘা নিকায়া'-য় উল্লেখিত হয়েছে ঃ[১]

"মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে, তখন আর একজন বুদ্ধ আসবেন, তাঁর নাম 'মৈত্তেয়' (সংস্কৃত মৈত্রেয়) অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ।"

আমরা নিম্নে সিংহল হতে প্রাপ্ত[২]একটি প্রমাণের উল্লেখ করছি। তাতেও উপরোক্ত কথার সমর্থন আছে ঃ

আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদিগকে উপদেশ দিবে ?

বুদ্ধ বললেন ঃ আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসবেন-আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত ---- তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করবেন।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে আমরা চিনব কি করে ?

বুদ্ধ বললেন ঃ তাঁর নাম হবে মৈত্রেয়।

এই 'শান্তি ও করুণার বুদ্ধ' (মৈত্রেয়) যে মুহাম্মাদ (সাঃ), তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কুরআন শরীফে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিশেষণও অবিকল এরূপই আছে। মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ তিনি 'রহমাতুল্লিল্ আলামীন' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য মূর্ত করুণা ও আশীর্বাদ।[৩]

পার্শী ধর্মশাস্ত্রে ঃ

পার্শীজাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দাবেস্তা' ও 'দসাতির'। জিন্দাবেস্তায় হযরত মুহাম্মাদের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এমন কি 'আহমদ' নামটি পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে। আমরা ইংরেজী শ্লোকের অনুবাদ পেশ করলাম ঃ[৪]

১. কবি গোলাম মোস্তফা রচিত "বিশ্বনবী" গ্রন্থ থেকে গৃহীত ॥

২. (from Ceylonese sources) ॥

৩. এর ইংরেজী ইবারত নিম্নরূপ ঃ

" Ananda said to the Blessed One, 'Who shall teach us when thou art gone ?'

And the Blessed One replied:

'I am not first Buddha who came on the earth, nor shall I be the last. In one time another Buddha will arise in the world, a holy one, a supremely enlightened one, endowed with wisdom in conduct... He will proclaim a religious life, wholly perfect and pure such as I now proclaim

Anada. said, How shall we know him ?

The Blessed One said He will be known as 'Maitreya

-(The Gospel of Ruddha by Carus, pp. 117-18)"॥

৪. কবি গোলাম মোস্তফা রচিত "বিশ্বনবী" গ্রন্থ থেকে গৃহীত ॥

www.iscalibrary.com

"আমি ঘোষণা করছি, হে স্পিতাম জরথুষ্ট্র, পবিত্র আহমদ (ন্যায়বানদিগের আশীর্বাদ) নিশ্চয়ই আসবেন, যাঁর নিকট হতে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে।[১]

'দসাতির' গ্রন্থেও অনুরূপ আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। তার সারমর্ম এরূপ ঃ

"যখন পার্শীরা নিজেদের ধর্ম ভুলে গিয়ে নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হবে, তখন আরব দেশে এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করবেন-যাঁর শিষ্যেরা পারস্যদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারশিক জাতিকে পরাজিত করবে। নিজেদের মন্দিরে অগ্নিপূজা না করে তারা ইব্রাহীমের কাবা-ঘরের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করবে; সেই কাবা প্রতিমা-মুক্ত হবে। সেই মহাপুরুষের শিষ্যেরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হবে।"

"তারা পারস্য, মাদায়েন, তুস্, বল্খ্ প্রভৃতি পারস্যবাসীদের যাবতীয় পবিত্র স্থান অধিকার করবে। তাদের পয়গম্বর একজন বাগ্মীপুরুষ হবেন এবং তিনি অনেক অদ্ভুত কথা বলবেন।"[২]

৪. আল্লাহ্‌র কিতাব সম্বন্ধে ঈমান

চতুর্থ যে মৌলিক বিষয়ে ঈমান রাখতে হবে তা হল আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি ঈমান। আল্লাহ তা'আলা মানব ও জ্বিন জাতির হেদায়েত এবং দিক নির্দেশনার জন্য নবীদের মাধ্যমে তাঁর বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়ে থাকেন। এই বাণী ও আদেশ নিষেধের সমষ্টিকে বলা হয় কিতাব। আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার মধ্যে অনেকগুলো ছিল সহীফা অর্থাৎ, পুস্তিকা বা কয়েক পাতার কিতাব। এক বর্ণনা মতে সর্বমোট ১০৪ খানা কিতাব ও সহীফা প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে চারখানা হল বড় কিতাব, আর ১০০ খানা সহীফা বা পুস্তিকা। যার মধ্যে হযরত শীছ (আঃ)-এর উপর ৫০ খানা, হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর উপর ৩০ খানা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর ১০ খানা এবং হযরত আদম (আঃ)-এর উপর ১০ খানা সহীফা অবতীর্ণ হয়।[৩] চার খানা বড় কিতাব হল ঃ

(এক) তাওরাত বা তৌরীত ঃ যা হযরত মূছা (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়।

(দুই) যবূর ঃ যা হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়।

(তিন) ইঞ্জীলঃ যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়।

(চার) কুরআনঃ যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর নাযিল হয়। কুরআনকে আল-কুরআন, আল-কিতাব, ফুরকান এবং আল-ফুরকানও বলা হয়।

১. মূল ইংরেজী শ্লোকটি নিম্নরূপ ঃ

" Noid te Ahmad dragoyeitim fram-raomi
Spetame Zarathustra yam dahmam vangnim afritim.
Yunad hake hahi humananghad hvakanghad
Hushyanthnad hudaenad."
-(Zend-Avesta. Part I. Translatid by Max Muller, p. 260)॥

২. Muhammad in World Scriptures. by A. Haq Vidyarthi. p. 47 ॥

৩. مرقاة جـ/١ ॥

www.iscalibrary.com

কুরআনের সংজ্ঞা হল ঃ

هو المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة - وهو الاسم والمعنى جميعا - (قواعد الفقه)

অর্থাৎ, কুরআন বলা হয় যা রাসূল (সাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে, গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে এবং রাসূল (সাঃ) থেকে "তাওয়াতুর পর্যায়ের বর্ণনা"[১] সূত্রে সন্দেহাতীত ভাবে বর্ণিত আছে। শব্দ এবং অর্থ উভয়টার সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, কুরআন ব্যতীত বর্তমানে ইয়াহূদী খৃষ্টানদের নিকট যে তাওরাত ইঞ্জীল রয়েছে তার উপর ঈমান আনা জরূরী নয়। আমরা শুধু এতটুকু বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা যে তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূর সংশ্লিষ্ট পয়গম্বরদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, তা সত্য ছিল এবং সংশ্লিষ্ট সময়ে তার প্রতি ঈমান আনয়ন ও তদনুসারে আমল করা ফরয ছিল।

বর্তমানে আল্লাহ্‌র প্রেরিত আসল তাওরাত ইঞ্জীল দুনিয়ার কোথাও নেই। বর্তমানে ইঞ্জীল বা বাইবেল নামে যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তা মূলতঃ হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্ব আকাশে উঠিয়ে নেয়ার বহু বৎসর পর কিছু লোক রচনা ও সংকলন করেছিল। তারপর যুগে যুগে বিভিন্ন পাদ্রী ও খৃষ্টান পন্ডিতগণ তাতে বহু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করেছে। ফলে এটিকে কোনক্রমেই আর আসমানী ইঞ্জীল বলে মেনে নেয়া যায় না বরং এ হল মানুষের মনগড়া, বিকৃত এবং মানব রচিত ইঞ্জীল-আসমানী ইঞ্জীল নয়। তাওরাতের অবস্থাও অনুরূপ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এ সম্বন্ধে একটি বিশদ প্রবন্ধ পেশ করা হল।

তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূরের ভূত বর্তমান অবস্থা

বাইবেল ঃ

বাইবেল (Bible) শব্দের অর্থ গ্রন্থসমূহের সংকলন। এটি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন ভাষা থেকে গৃহীত। বাইবেল সমগ্র ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সমাজের ধর্মীয় গ্রন্থ। দুইটি অংশের সমষ্টিকে বাইবেল বলা হয়। অর্থাৎ, বাইবেলের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে ঃ

১. পুরাতন নিয়ম (Old Ttestament)। এ অংশটি মূলতঃ তাওরাত। যা ইয়াহুদীদের বিভিন্ন সহীফার সংকলন।

২. নতুন নিয়ম (New Ttestament)। এ অংশটি মূলতঃ ইঞ্জীল ও অন্যান্য সহীফা সম্বলিত।

নূতন নিয়ম-এর তুলনায় পুরাতন নিয়ম বৃহদাকারের। গোটা বাইবেল সমগ্র ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সমাজের ধর্মীয় গ্রন্থ। কিন্তু ইয়াহূদীদের মৌলিক ধর্মীয় গ্রন্থ হলো পুরাতন নিয়ম। ইয়াহূদীগণ নূতন নিয়ম মান্য করে না। কেননা নতুন নিয়মটি ইঞ্জীল ও অন্যান্য সহীফা সম্বলিত, আর খৃস্টানদের নিকট ইঞ্জীল পবিত্র গ্রন্থ বলে বিবেচিত নয়। খৃস্টানগণ প্রথম

১. "তাওয়াতুর পর্যায়ের বর্ণনা" বলে বোঝানো হয় কোন বিষয়ে সর্বযুগে এত অধিক লোকের বর্ণনা যে, পরিকল্পিত ভাবে হলেও এত অধিক লোকের মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়॥

www.iscalibrary.com

থেকেই পুরাতন নিয়মকে তাদের পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে মেনে নিয়েছে, বরং খৃস্টীয় প্রথম/দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাধারণভাবে তাদের পবিত্র গ্রন্থ পুরাতন নিয়মই ছিল। তবে খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দিতে বর্তমান আকারে রক্ষিত নূতন নিয়মকে তারা মেনে নেয়।[১]

তাওরাত ঃ

তাওরাত ঃ (تورات) বর্তমান বাইবেল এর একটি অংশ। এটা বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Ttestament) বলে পরিচিত। পুরাতন নিয়মের এ গ্রন্থটি ইয়াহূদীদের বিভিন্ন পবিত্র সহীফার সংকলন। ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ পুরাতন নিয়মকে নিম্নোক্ত তিন অংশে বিভক্ত করেছেন ঃ

১. তাওরাত (বিধি-বিধান- Law)।

২. আম্বিয়ায়ে কেরাম-এর সহীফাসমূহ (Prophets) ও

৩. পবিত্র সহীফাসমূহ (Hagiographa অথবা কেবল Writings)।

উপরোক্ত বিভক্তি হতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকবে যে, সমগ্র পুরাতন নিয়ম তাওরাত নয়। কেননা তাওরাত ব্যতীত আরও সহীফা রয়েছে যেগুলি ইয়াহূদীদের পবিত্র গ্রন্থের অপরিহার্য অংশ। তবে ঐ সমস্ত সহীফার মধ্যে তাওরাত-এর একটি বিশেষ গুরুত্ব ও পবিত্র আসন রয়েছে।

মূল তাওরাত পাঁচটি সহীফা (পুস্তিকা) সম্বলিত, যেগুলিকে সাহাইফে মূসা (صحائف موسیٰ) বা মূসা (আঃ)-এর সহীফা বলা হয়ে থাকে। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) আদি পুস্তক (Genesis-تکوین) ঃ এতে হযরত মূসা (আঃ)-এর পূর্ববর্তীকাল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হযরত ইয়া'কূব (আঃ)-এর বংশের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং ধর্মে নৈতিক চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের যে মর্যাদা রয়েছে তার সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করা।

(২) যাত্রা পুস্তক (Exodus-خروج) ঃ এই সহীফা হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্ম হতে শুরু হয়। এতে বর্ণনা করা হয়েছে- কিভাবে তিনি বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে সীনাঈ পর্বত (طور سینا) পর্যন্ত নিয়ে যান, যেখানে তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় এবং তাদের নিমিত্তে বিধিসমূহ প্রণীত হয়।

(৩) লেবীর পুস্তক (Leviticus) ঃ এতে বিশেষভাবে বনী ইসরাঈল-এর ইবাদত সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে।

(৪) গণনা পুস্তক (Numbers-اعداد) ঃ এতে বনী ইসরাঈলের সীনাঈ প্রান্তর থেকে বের হয়ে জর্দান ও ট্রান্স-জর্দান (اردن اور ماورائے اردن)-এর এলাকা জয় করার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা রয়েছে। অধিকন্তু এতে বিক্ষিপ্তভাবে বিধি-বিধানসমূহের উল্লেখও রয়েছে।

১. ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র Chambers End Bible শিরো.॥

www.iscalibrary.com

(৫) দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy- تثنيد) ঃ এতে ঐতিহাসিক পটভূমির উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং সমষ্টিগত বিধিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এই সহীফা হযরত মূসা (আঃ)-এর ওফাতের আলোচনার উপর সমাপ্ত হয়েছে।

পূরাতন নিয়ম-এর অবশিষ্ট সহীফাসমূহঃ

পূরাতন নিয়ম-এর তিন অংশের মধ্য থেকে দ্বিতীয় অংশ হল صحائف انبياء বা নবীদের পুস্তক (Prophets)। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক. প্রথম যুগের নবীগণ ঃ

(১) য়ূশা' (যিহোশূয়- Joshua)

(২) বিচারককর্তৃগণ (Judges- قضاة)

(৩) শামূয়েল (شموئيل - Samuel) ও

(৪) রাজাবলী (Kings-ملوک)

খ. শেষ যুগের নবীগণ ঃ

(৫) যিশাইয় (اشعياء-Isaiah)

(৬) যিরমিয় (ارميا-Ieremiah)

(৭) হিযিক্কেল (حزقيل- Ezekiel) ও

(৮) انبياء اصاغر বা অপ্রধান নবীগণ (Minor prophets)। অপ্রধান নবীদের বারটি সহীফা (পুস্তিকা)। কিন্তু সবগুলি মিলিয়ে মোট ১১টি সহীফা গণ্য করা হয়।

পুরাতন নিয়ম-এর তৃতীয় অংশ হল পবিত্র গ্রন্থসমূহ বা صحف مقدسه (Hagiographa)। এতে মোট ১১টি সহীফা রয়েছে, যেগুলি তিন অংশে সম্বলিত ঃ

ক. صحف اشعار বা কাব্য পুস্তক ঃ (১) مزامير গীত সংহিতা বা প্রার্থনা সঙ্গীত (Psalms) মাওলানা রহ্‌মাতুল্লাহ কিরানবী বলেন ঃ ঐতিহাসিকগণ বলেন, বাইবেলের গীত-সংগীত অংশটি যবূর কিতাবেরই বিকৃত রূপ মাত্র। (২) امثال হিতোপদেশ বা নীতি বাক্যমূলক গ্রন্থ (Proverbs) ও (৩) আয়্যুব বা ইয়োব (Job)।

খ. مجلات خمسه বা পঞ্চ পুস্তিকা (Megilloth) (৪) পরম গীত (Song of Songs), (৫) راعوت বা রূতের বিবরণ (Ruth), (৬) বিলাপ (Lamentation), (৭) کتاب جامعۃ سلیمان (Ecclesiastes) ও (৮) ইস্টের (আস্তীর- Esther)।

গ. অবশিষ্ট সহীফা বা পুস্তক ঃ (৯) দানিয়েল (دانيال -Daniel) আযরা (عزرا-عزر- Ezra) ও নহিমিয়া (نحميا- Nehemia) [এই তিনটি মিলে একটি সহীফা গণ্য করা হয়। ও (১০-১১) কালক্রমিক ইতিবৃত্ত (Chronicles- ايام)

এই সবগুলি মিলিয়ে ২৪টি সহীফা হল। এগুলির ভাষা হিব্রু (عبرانی)। দানিয়াল ও আযরা পুস্তক কতিপয় বাক্য ব্যতিরেকে আরামায়িক ভাষায় লিখিত। ইয়াহূদীদের মধ্যে আসল হিব্রু পুরাতন নিয়মই প্রচলিত। ইংরেজী বাইবেলে এই সমস্ত সহীফাকে আরও বিভক্ত করত ৩৯টি সহীফা গণ্য করা হয়ে থাকে। এতে انبياء اصاغر বা অপ্রধান নবীদেরকে

www.iscalibrary.com

পৃথক সহীফা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আযরা (ইয্রা)-কে নহিমিয়া (Nehemia) হতে পৃথক গণ্য করা হয়েছে এবং শামূয়েল, রাজাবলী ও বংশাবলী আরও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে।

কুরআনের বর্ণনা মতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত, হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর যাবূর, হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ইঞ্জীল এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর কুরআন নাযিল করেন। কুরআনে কারীমে দুটি সহীফার উল্লেখ রয়েছে, যথা ঃ صحف ابراهيم وموسى ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)-এর সহীফাসমূহ। এখানে তাওরাতকেও সুহূফ (صحف সহীফার বহু বচন) বলা হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ (بما فى صحف موسى - ৫৩ঃ ৬৩)

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফা অধুনা বিলুপ্ত। আর তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূর কোন না কোন আকারে বিদ্যমান আছে।

কুরআনে কারীমের বর্ণনা মতে তাওরাত হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর তূর পর্বতে চল্লিশ দিনে নাযিল হয় এবং তিনি তা কাষ্ঠ ফলকসমূহ/পাতার উপর লিখে রাখেন। অধিকন্তু এই সমস্ত কাষ্ঠফলক/পাতার উপর আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপদেশ এবং প্রতিটি ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশ লিখে দেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وكتبنا له فى الالواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء -

অর্থাৎ, আমি তাঁর জন্য ফলকসমূহে সবকিছুর উপদেশ এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ লিখে দিয়েছিলাম। (সূরাঃ ৭-আরাফঃ ১৪৫)

কুরআনে কারীম সংক্ষেপে এও বর্ণনা করেছে যে, ইয়াহূদীগণ কিভাবে তাওরাতে রদবদল করত। কোন কোন সময় তারা শব্দের পরিবর্তন করত। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يحرفون الكلم عن مواضعه-

অর্থাৎ, তারা (আল্লাহ্র) কথাগুলিকে তার স্থান থেকে বিকৃত করে। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৪৬) এবং এই বিকৃতি ও পরিবর্তন তারা সঠিক মর্ম অনুধাবনের পর জেনে বুঝেই করত। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه -

অর্থাৎ, তারা সেটা বোঝার পরও সেটাকে বিকৃত করে। (সুরাঃ ২ বাকারাঃ৭৫)

ইয়াহূদীগণ তাওরাতের মর্মের মধ্যেও পরিবর্তন সাধন করত। কখনও কখনও তারা নিজেরাই সহীফা লিখে বলত যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে অবতারিত।

يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله -

অর্থাৎ, তারা নিজ হাতে কিতাব লিখে বলে যে, এটা আল্লাহ্র নিকট থেকে (প্রেরিত)। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ৭৯)

www.iscalibrary.com

এখন ইয়াহূদী ও খৃস্টান বিশেষজ্ঞগণ তাদের গবেষণার ভিত্তিতে এই কুরআনী দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তারা তাওরাতকে শব্দগত ও তাৎপর্যগত ভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতারিত ওহী হিসেবে স্বীকৃতি দান তো দূরের কথা, উল্টো তাদের অনেকেই আজ সুদৃঢ়ভাবে এর ওহী হওয়াকেই অস্বীকার করছেন।

তাওরাতে বিকৃতির সূচনা কখন থেকে হয় ?

পুরাতন নিয়ম-এর বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিকৃতির সূচনা খৃষ্টপূর্ব যুগ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বনী ইসরাঈলের কতিপয় নবীও এর সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং ইয়াহূদীদের এই অপকর্মকে অপরাধ বলে অভিহিত করেছেন ঃ "আর পৃথিবী আপন নিবাসীদের পদতলে অপবিত্র হল, কারণ তারা বিধানসমূহ লঙ্ঘন করেছে বিধির অন্যথা করেছে, চিরন্তন নিয়ম ভঙ্গ করেছে" (যিশাইয় ২৪ ঃ ৫)। "তোমরা চিরঞ্জীব ইশ্বরের, আমাদের ইশ্বর বাহিনীগণের সদা প্রভূর বাক্য বিকৃত করেছ" (যিরমিয় ২৩ ঃ ৩৬) প্রভৃতি।

সম্ভবতঃ Origen (১৮৫-২৫৪ খৃ.)-ই ছিলেন প্রথম খৃস্টান পণ্ডিত যিনি পরিষ্কার-ভাবে ধরতে পেরেছিলেন যে, বাইবেল, বিশেষতঃ পূরাতন নিয়ম-এর ভিতর কতকগুলি বাক্য এমন যা হয়ত অর্থগত দিক থেকে বিশুদ্ধ নয় অথবা নৈতিকতার মানদণ্ডে নিম্নমানের ও নিন্দার্হ।[১] কিন্তু তিনি রূপক বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করত। নিজেকে এভাবে প্রবোধ দেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে বাহ্যিক শব্দ দ্বারা উচ্চতর অর্থ অনুসন্ধান করতে হবে। অগাষ্টিন (৩৫৪-৪৩০ খৃ.) ও টমাস একুইনাস (১২২৫-৭৪ খৃ.) একই মত গ্রহণ করেন (প্রাগুক্ত)।

ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ ১৬ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন (Reformation movement) অবধি কোনরূপ বিশেষ সন্দেহ ও সংশয় পোষণ করেনি। কেবল Porphyry (২৩৩-৩০৪ খৃ.) এর বিপরীতে তার ধারণা ব্যক্ত করেন যে, দানিয়েলের পুস্তক ব্যবিলনের নির্বাসনের যুগে লিখিত হয়নি, বরং চার শতাব্দী পর লিখিত হয়েছে। অনুরূপ স্পেনের ইয়াহূদী পণ্ডিত ইব্‌নে আযরা (১০৯২-১১৬৭ খৃ.) গবেষণান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, صحائف خمسہ বা পঞ্চ পুস্তক (Pentateuch) হযরত মূসা (আঃ) পরবর্তী যুগের রচনা।

ফরাসী দার্শনিক ও পণ্ডিত Capellus (আনু. ১৬২৪ খৃ.) প্রমাণ করেন যে, তাওরাতের যে মূল হিব্রু পাঠ (متن) বর্তমান, তা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। Reimarus নামক একজন জার্মান পণ্ডিত ১৭৪৭ খৃস্টাব্দে এক বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যাতে তিনি বাইবেলকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতারিত (revelation/وحی) হওয়া অস্বীকার করেন। আরও একজন জার্মান পণ্ডিত Lessing (আনু. ১৭২৯-৮১ খৃ.)-ও দাবী করেন যে, বাইবেলে উল্লেখিত ঘটনাবলীর উপর ইতিহাসের বুনিয়াদ রাখা যেতে পারে না। বাইবেলের সমালোচনামূলক গবেষণার দিক দিয়ে খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. Ency. Brit. Bible শিরো ॥

www.iscalibrary.com

কেননা উল্লেখিত পণ্ডিতবর্গ ছাড়াও কতিপয় বিখ্যাত দার্শনিকও এই জাতীয় মতামত পেশ করেন। যাদের মধ্যে দার্শনিক স্পিনোযা (Spinozg) ও হব্‌স (Hobbes)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

কুরআনী সাক্ষ্যের আলোকে এর ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত আসল সহীফাসমূহ বিনষ্ট হওয়ার পর ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতগণ এগুলি আবার নূতনভাবে রচনা ও বিন্যস্ত করেন। ইতিহাস হতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তাওরাত আকস্মিক ঘটনাচক্রে কয়েকবার ধ্বংস হয়।

খৃষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে বাবেল সম্রাট বুখ্‌ত নাস্‌সার (নেবু চাদ নাযার) বনী ইসরাঈলের উপর আক্রমণ করে হাজার হাজার নারী, পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং বন্দী করে নিয়ে যায় তাদের অসংখ্য লোকদেরকে। এসব বন্দিকৃত ইয়াহূদীদেরকে ব্যবিলন রাজ্যে নির্বাসন দেয়া হয়। এ সময় তারা আল্লাহর ঘর মসজিদুল আকসায় হামলা করে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি নাযিলকৃত তাওরাতসহ যাবতীয় গ্রন্থাদি জ্বালিয়ে মেছাখার করে দেয়। জেরুজালেম ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এ ঘটনার দীর্ঘ দিন পর তাওরাতের একটি কপি তাদের হস্তগত হয়। এরপর পুনঃপুনঃ তারা রোমী এবং গ্রীকদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এতে তাওরাতের শেষ কপিটিও জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

৭০ খৃষ্টাব্দে তাইতাস (Titus) রূমী Temple বা Synagogue -সহ জেরুজালেম ধ্বংস করেন। ৯৩২-৩৫ সালে Hadrian ইয়াহূদীদের বিদ্রোহ দমনপূর্বক ফিলিস্তীনে তাদের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেন।

এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে পরিষ্কার হয় যে, ইয়াহূদীদের আসল পবিত্র সহীফাসমূহ কালচক্রে বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং বর্তমান তাওরাত পরবর্তীকালে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। তাই ৩৮ খন্ডে সংকলিত বাইবেলের ওলড্ টেষ্টামেন্ট (পুরাতন নিয়ম)-এর অন্তর্ভুক্ত তাওরাত সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনা শেষাবধি এটাই প্রমাণ করেছে যে, বর্তমান তাওরাত ও পুরাতন নিয়ম-এর অপরাপর সহীফাসমূহ আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত ওহী (وحى منزل من الله) নয়, বরং উল্লেখিত বিভিন্ন সহীফা মানুষ বিভিন্ন যুগে রচনা ও সংকলন করেছেন। এভাবে বাইবেলের প্রতিটি পুস্তক কিংবা সহীফা নির্বিচার ও নির্বিশেষে মানবীয় রচনা, যা সংশ্লিষ্ট নবীদের বহু পরবর্তীকালে প্রণীত হয়।

তাওরাতের সহীফাসমূহ কখন প্রণীত ও সংকলিত হয় ?

এমন কোন অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, বর্তমান তাওরাতের সহীফাসমূহ কখন প্রণীত ও সংকলিত হয় এবং কিভাবে তা নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হয়। সাধারণ ধারণা এই যে, আযরা (عزر-Ezra) নবী পূনর্বার এর অস্তিত্ব দান করেন, নূতনভাবে বিন্যস্ত করেন এবং নির্ভরযোগ্য অভিহিত করেন। এক প্রচলিত বর্ণনা মোতাবেক লেখক দ্বারা পূনর্বার লিপিবদ্ধ করান। তিনি পুরাতন নিয়ম-এর আসল সহীফাসমূহ বিনষ্ট হওয়ার পর সেগুলিকে জনশ্রুতি মতে সংকলন করান, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতারিত আসল

www.iscalibrary.com

সহীফারূপে নয়। ঐতিহাসিক তথ্য হতে এও প্রমাণিত হয় যে, আযরার পর ফিলিস্তীনের উপর কমপক্ষে আরও তিনবার ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছিল। এমতাবস্থায় তার সংকলিত পুরাতন নিয়ম-এর সহীফাসমূহ বিলুপ্ত ও বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার নয়।

পুরাতন নিয়ম (Old Testament)-এর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও উপরোল্লেখিত অভিমতকে প্রমাণিত করে। উল্লেখিত পবিত্র গ্রন্থের হিব্রু মূল পাঠ-যা বর্তমানে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত আকারে বিদ্যমান, যাকে মাসূরী পাঠ (Massoretic Text) বলা হয়, এই হিব্রু পাঠ -সম্ভবতঃ ৬ষ্ট ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সংকলিত। কিন্তু এই সময়কাল স্বীকার করে নিলেও উল্লেখিত মূল পাঠ সুবিন্যস্ত হওয়া ও আসল সহীফাসমূহের লিপিবদ্ধ করবার কালের মধ্যে এক দীর্ঘ বিরতি প্রতিবন্ধক হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে। হিব্রু মূল পাঠ সুসংবদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এজন্য যে, মূল হিব্রু লিপিতে (script)-হরকত (স্বরচিহ্ন) থাকত না। যার অনিবার্য ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, এক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর শব্দ ও বাক্যের মধ্যে অর্থের বিকৃতি দেখা দিতে থাকে। কেননা হরকত না থাকায় ইবারত বিভিন্নরূপে পাঠ করা যেত। এ কারণে ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ খৃস্টীয় ৫ম ও ৯ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আলামত (বিরতি চিহ্ন), হরকত (স্বরচিহ্ন, vowel signs) ও স্বরভঙ্গির চিহ্নাদি (accents) প্রভৃতি উদ্ভাবন করেন। বস্তুতঃ যখন হিব্রু মূল পাঠ এভাবে স্বরচিহ্ন সহযোগে সুসংবদ্ধ করা হয়, তখন স্বভাবতই তাতে অর্থ নির্ধারণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গরমিল পরিলক্ষিত হয়। স্বয়ং ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে, তাওরাতে এমন ১৮টি স্থান রয়েছে যেখানে প্রাথমিক যুগের লেখকগণ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন করেছেন। এটাও সত্য যে, এই মাসূরী পাঠ (Massoretic Text) ছাড়াও প্রাচীনকালে আরও কিছু সংকলন ও অনুলিপি (vetzions, recensions) ছিল, যা অধুনা বিলুপ্ত এবং এ সমস্ত কপিতে একে অন্যের সাথে গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য ছিল।[১]

তাওরাতের বিভিন্ন সহীফার রচনার ইতিহাস

যখন আধুনিক গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রয়াস এটা মেনে নিয়েছে যে, প্রচলিত তাওরাত (সহীফাসমূহ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতারিত নয়, তখন বিভিন্ন সহীফার রচনার ইতিহাস এবং সেগুলির প্রকৃত রচয়িতাদের নাম জানবার চেষ্টা করা হয়েছে। বাইরের সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকায় অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার সংকলনের তারিখসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

(১) তাওরাত বর্তমান আকারে খৃ. পূ. ৪৪৪।

(২) আম্বিয়া বর্তমান আকারে খৃ. পূ. ২০০-২৫০-এর মধ্যে।

(৩) পবিত্র সহীফাসমূহ আকারে ১০০-১৫০-এর মধ্যে।

১.Ency. Brit. Bible শিরো. "diffterially ॥

www.iscalibrary.com

এই সমস্ত সহীফা বিশেষতঃ যেগুলি দীর্ঘ, একজন রচয়িতার রচিত ও সংকলিত নয়, বরং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ঘটেছে এবং পর্যায়ক্রমে তা বর্তমান আকারে পৌঁছেছে।[১]

যাবূরঃ

যাবূরঃ (زبور আরবী) বহুবচন যুবুর (الزبر) ; الزبور অর্থ লিখা; زبور-এর অর্থ مزبور অর্থাৎ লিখিত বিষয় বা বস্তু; এমন গ্রন্থ যা স্পষ্ট লিপিতে লিখিত হয়ে থাকে। কিন্তু পরিভাষায় যাবূর শব্দ দ্বারা ঐ আসমানী কিতাবকে বোঝানো হয় যা হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

যাবূর হযরত দাঊদ (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

واتينا داود زبورا.

অর্থাৎ, আমি দাউদকে যাবূর দান করেছিলাম। (সুরাঃ ৪ -নিসাঃ ১৬৩) এ আয়াতে যে زبور -এর উল্লেখ করা হয়েছে, মুফাস্‌সিরগণের মতে এ দ্বারা হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر . الاية -

অর্থাৎ, আমি যাবূরে উপদেশ-এর পর লিখে দিয়েছি। (সূরাঃ ২১-আম্বিয়াঃ ১০৫)
এ আয়াতে উল্লেখিত যাবূর (زبور)-শব্দটি দ্বারাও হযরত দাঊদ (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেন, "অনেকের মতে যাবূর এমন এক কিতাবের নাম, যা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্বকথা সম্বলিত, তার মধ্যে শরী'আতের কোন আহকাম নেই এবং কিতাব তাকেই বলে, যার মধ্যে শরঈ আহকাম ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের কথা থাকে। হযরত দাউদ (আঃ)-এর যাবূর গ্রন্থে শরী'আতের কোন নির্দেশ ছিল না।" জ্ঞানপূর্ণ তাত্ত্বিক সহীফা হওয়ার কারণে তাকে যাবূর বলা হয়েছে।

খলীফা হারূনুর রশীদের আযাদকৃত গোলাম আহ্‌মাদ ইব্‌নে আবদিল্লাহ ইব্‌নে সালাম থেকে বর্ণিত আছে যে, যাবূর (زبور) দ্বারা ঐ সকল مزامير (মাযামীর/গীত)কে বোঝানো হয়েছে যা ইয়াহূদী ও নাসারাগণ সাধারণভাবে ব্যবহার করত। যার সংখ্যা ছিল ১৫০ টি।

যাবূর নামে বর্তমানে ভিন্ন কোন কিতাবের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ বলেন, বাইবেলের ওল্‌ড টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত গীত-সংগীতা অংশটি যবূর কিতাবেরই বিকৃত রূপ মাত্র।

ওল্‌ড টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত এই যবূর সম্বন্ধে মাওলানা রহমাতুল্লাহ্ কিরানভী (রহঃ) বলেন, এ কিতাবটি কে সংকলন করেছেন এবং কখন সংকলন করা হয়েছে তা

১. Ency. Brit. Bible শিরো.; Rowley, Growth of the O. T, ইসলামী বিঃ কোঃ ১২ খণ্ড, বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান এবং ইসলামী আকীদা প্রভৃতি থেকে গৃহীত ॥

www.iscalibrary.com

সুনির্দিষ্ট কোন সূত্রে প্রমাণিত নয়। বরং এ সম্বন্ধে সমূহ মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। কেউ বলেন, এটি হযরত দাউদ (আঃ)-এর যমানাতেই সংকলন করা হয়েছে। কেউ বলেন, পরবর্তীকালে তার সহচরগণ সংকলন করেছেন। আবার কারো কারো মতে, বিভিন্ন সময়ে তা সংকলন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন লেখক সংকলনের এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তারাও বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এ কারণেই ঐতিহাসিকগণ বলেন, বাইবেলের গীত-সংগীতা অংশটি যাবূর কিতাবেরই বিকৃত রূপ মাত্র।[১]

ইঞ্জীল ঃ

ইঞ্জীল (انجيل) হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের নাম। বর্তমানে বাইবেল নামে পরিচিত। হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন ইসরাঈলী বংশোদ্ভূত। তার মাতৃভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ও ধর্মীয় ভাষা ছিল হিব্রু। কেউ কেউ একে হিব্রু মিশ্রিত সুরিয়ানী ভাষা বলে বর্ণনা করেছেন। অধিকন্তু বলা যায় তার ভাষা ছিল আরামী বা আরামী-র কোন শাখা। ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র বর্ণনা মতে তিনি ও তার শিষ্যগণ আরামী ভাষায় কথা বলতেন। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে মূল ইঞ্জীলের ভাষা ছিল সুরিয়ানী।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, বাইবেল পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের সমষ্টি। অর্থাৎ, বাইবেলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে ঃ

১. পুরাতন নিয়ম (Old Ttestament)। এ অংশটি মূলতঃ তাওরাত। যা ইয়াহূদীদের বিভিন্ন সহীফার সংকলন।

২. নতুন নিয়ম (New Ttestament)। এ অংশটি মূলতঃ ইঞ্জীল ও অন্যান্য সহীফা সম্বলিত।

ইঞ্জীল শব্দটিকে সাধারণ ভাবে একটি গ্রীক শব্দ রূপে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। গ্রীক ভাষায় শব্দটির অর্থ সুসংবাদ। অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হয়েছে শব্দটি anggelos থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ পয়গম্বর। একটি দূর্বল মতানুসারে শব্দটি আরবী (ينجله نجلا) نجل الشئ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ মূল, ভিত্তি, কোন কিছু বের করা। এরূপ হলে ইঞ্জীল শব্দের ভাবার্থ হবে জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থল। তাজুল উরূস গ্রন্থকার ইঞ্জীল শব্দটিকে সুরিয়ানী ভাষা থেকে উদ্ভূত বলেছেন।

সম্ভবতঃ ইঞ্জীলকে ইঞ্জীল (সুসংবাদ) বলার কারণ হল - হযরত ঈসা (আঃ) শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। যেমন কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে ঃ

ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد-

অর্থাৎ, এবং সুসংবাদদাতা রূপে এমন রাসূলের যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমদ। (সূরাঃ ৬১-সাফ্ফঃ ৬)

১. তথ্যসূত্র ঃ ইসলামী বিঃ কোঃ ২১ খণ্ড, ২. ইসলামী আকীদা, মাওঃ ইসহাক ফরীদী ॥

www.iscalibrary.com

আজকাল খৃষ্টানদের নিকট প্রচলিত ইঞ্জীল মূলতঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথিত চার শিষ্য মথি (ST. Mathew) মার্ক (ST. Mark), লুক (ST.Luke) ও যোহন (ST. John) কতৃক রচিত চারটি গ্রন্থকে বোঝায়, যা চারটি সুসমাচার নামে পরিচিত। অভিজ্ঞ লেখকদের মতে এই চারটি সুসমাচার প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে ১৭০ খৃষ্টাব্দের দিকে। উক্ত চারটি ইঞ্জীল ছাড়াও শীষ্যদের রচিত বহু সংখ্যক চিঠি রয়েছে যার সংখ্যা ১১৩ বলে উল্লেখ করা হয়।

কথিত আছে যে, উপরোল্লেখিত চারটি সুসমাচার উপরোক্ত চার শিষ্য কর্তৃক রচিত। কিন্তু মথি, মার্ক, লুক ও যোহন -এর মধ্যে যোহন সম্পর্কে নিশ্চিত যে, তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথী ছিলেন। অবশিষ্ট তিন জন সম্পর্কে গবেষকদের মত হল তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিষ্য নন।

ডঃ মরিচ বুকাইলি লিখেছেন-যোহন যীশুর সঙ্গী ছিলেন, তবে তিনি তার সুসমাচার লিখেছেন অনেক পরে। তার রচিত সুসমাচারের স্বীকৃত পাঠ রচিত হয়েছে প্রথম শতাব্দির শেষ দিকে। সময়ের দিক থেকে যীশুর আবির্ভাবের প্রায় ৬০ বৎসর পর। তদুপরি তার সুসমাচারের অনেক অংশই তার রচনা নয়। বরং অন্য অজ্ঞাত লেখকদের রচনাও এর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ কথা সবাই স্বীকার করেছেন।

আর মার্ক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন -এ কথা সর্ববাদী সম্মত যে, মার্ক কস্মিনকালেও যীশুর শিষ্য ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন জনৈক প্রেরিতের একজন শিষ্য। (ও. ক্যালম্যান)

আর মথি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন- মথি যীশুর শিষ্য ছিল বলে তার যে পরিচিতি ছিল তা এখন মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। মথির সাথে যীশুর সাক্ষাত হয়েছিল এই অভিমত এখন পরিত্যাক্ত হয়েছে। তদুপরি তার রচনায় মার্ক-এর সুসমাচার থেকে প্রচুর বিষয় গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ পূর্বে বলা হয়েছে এ কথা সর্ববাদী সম্মত যে, মার্ক কস্মিনকালেও যীশুর শিষ্য ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন জনৈক প্রেরিতের একজন শিষ্য। (ও. ক্যালম্যান)

আর লুক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন- লুক থিয়াফলের নামে লিখিত উৎসর্গ পত্রে প্রথমেই পাঠকবর্গকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অন্যেরা যীশুখ্রীস্ট সম্পর্কে যা যা লিখেছেন, সে সব অনুসরণ করেই তিনি তার পুস্তকে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণও তুলে ধরেছেন। (এর থেকেই বোঝা যায় লুক নিজে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না) এবং প্রেরিতদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যও তার পুস্তকে ব্যবহার করেছেন। ও. ক্যালম্যানের গবেষণা মতে লুক যীশুর শিষ্য ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন পৌলের সফরসঙ্গী।[১]

ইঞ্জীল শরীফ হিসেবে পরিচিত এই সুসমাচারসমূহ কখন কিভাবে রচিত হয়েছিল সে সম্পর্কে ডঃ মরিচ বুকাইলি বলেন ঃ হযরত ঈসা (আঃ)কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার সত্তর বছর পর নিউ টেষ্টামেন্টের সূসমাচারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ঐশী বাণীসমূহ জনকথা তথা মানুষের স্মৃতি-নির্ভর কাহিনী ছিল মাত্র।

১. দ্র ঃ বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞানঃ ডঃ মরিস বুকাইলী ॥

www.iscalibrary.com

ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ১১ সংস্করণে বলা হয়েছে ঃ যতদূর জানা যায় হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সহচরগণ তাদের জীবদ্দশায় পুরাতন নিয়মকে নিজেদের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। ফলে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর ২০ বৎসর পর্যন্ত কেউই নতুন গ্রন্থ সংকলনের প্রয়োজন অনুভব করেনি। তারপর প্রয়োজন দেখা দিলে আদি পুস্তক (old Testament) কে নমূনা হিসেবে সামনে রেখে ধীরে ধীরে ইঞ্জীল সংকলনের কাজ আরম্ভ করা হয়।

এ সুসমাচার সমূহের মধ্যে কতটুকু ঈসা (আঃ)-এর বাণী বা ঐশী বাণী রয়েছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে "ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল" এর অনুবাদকগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের তাগিদে, ধর্মপ্রচারকগণ যে সব কাহিনী ও বিবরণ পেশ করতেন, তাই লোকমুখে প্রচারিত হত। আবার লোকমুখে প্রচারিত এ সব কাহিনী সংকলিত করে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত। বাইবেলের নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলো এমন ধরনেরই সংকলন। এভাবে অসংখ্য ধর্মপ্রচারকগণ অসংখ্য বাইবেল সংকলন করে নেয়।

খৃষ্টীয় প্রাথমিক যুগে ইঞ্জীলের অনেক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল। এ গুলোর কোন্‌টি বিশুদ্ধ তা নিরুপণের জন্য পূর্ব রোমের ফীলস শহরে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে পাদ্রীদের এক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিন শতাধিক পাদ্রী অংশ গ্রহণ করে। Athanasius-এর প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত উক্ত Nieca সম্মেলনের পর ইঞ্জীলের উপরোক্ত চারটি পাণ্ডুলিপি ছাড়া অবশিষ্ট ইঞ্জীল সমূহকে অপ্রামাণ্য অংশরূপে অভিহিত করে পরিত্যাগ করা হয়। প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য অংশ পৃথক করার জন্য পাদ্রীগণ এ যাবত যত সুসমাচার লেখা হয়েছে তা একত্রিত করে একটি স্তুপ দেয়। তারপর সর্বজনমান্য এক পাদ্রী সিজদাবনত অবস্থায় মন্ত্র আওড়াতে থাকে যে, "যেটি অসত্য তা যেন পড়ে যায়, যেটি অসত্য তা যেন পড়ে যায়"। এভাবে বলতে বলতে চারটি সুসমাচার ব্যতীত বাকি সব কটি মাটিতে পড়ে যায়। আর এ চারটি হল- মার্ক, মথি, লুক ও যোহনের সুসমাচারসমূহ।

বস্তুতঃ সুসমাচারসমূহ হচ্ছে সেই রচনার সমাহার "যেসব রচনার দ্বারা বিভিন্ন মহলকে সন্তুষ্ট করা হয়েছে, গির্জার প্রয়োজন মিটানো হয়েছে, ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত নানা বক্তব্যের জওয়াব দেয়া হয়েছে, প্রচলিত ধর্মীয় ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করা হয়েছে এবং এমনকি প্রয়োজনে বিরুদ্ধপক্ষীদের উত্থাপিত নানা অভিযোগের দাঁতভাংগা জওয়াবও সেসব পুস্তকের মাধ্যমে দেওয়ার প্রয়াস দেখা গেছে। সুসমাচারের লেখকগণ এভাবে স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে লোককাহিনী হিসেবে যেসব রচনা হাতের কাছে পেয়েছেন, তা থেকে উপাদান নিয়ে নিজ নিজ পুস্তক সংকলন ও প্রণয়ন করেছেন।" (ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল)

এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এ সব সুসমাচার হচ্ছে বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার এলোমেলো এক সাহিত্য কর্ম তো বটেই, সে সাথে এগুলোতে রয়েছে অতুলনীয় বৈপরিত্যের সমাহার। এ মন্তব্য আমাদের নয়। এ মন্তব্য করেছেন, "ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি

www.iscalibrary.com

বাইবেল"-এর শতাধিক বিজ্ঞ ভাষ্যকার। তারা বলেন, যে সব বাইবেল আমাদের হাতে এসেছে, এর সবগুলোর রচনা ও বক্তব্য এক নয়। বরং একটির সাথে আরেকটির পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রাপ্ত বিভিন্ন বাইবেলের মধ্যে এই যে তফাৎ তাও বিভিন্ন ধরনের। সংখ্যার দিক থেকেও সে পার্থক্য কম নয়, বরং প্রচুর। কোন কোন বাইবেলের মধ্যে ব্যাকরণ সংক্রান্ত ভাষাগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শব্দ চয়নে কিংবা শব্দের অবস্থানের ভিন্নতাও কম নয়। কোন কোন পান্ডুলিপিতে এমন ধরনের পার্থক্যও বিদ্যমান, যার ফলে দু'টি বাইবেলের গোটা একটা অনুচ্ছেদের অর্থ পুরোপুরি ভিন্ন রকম হয়ে দাঁড়ায়। এতে সুস্পষ্ট ভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, বাইবেলের সুসমাচার সমূহ মূলতঃ মানুষের রচনা। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ঐশী বাণী নয় এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাণী সমূহের হুবহু বর্ণনাও নয়।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বাইবেলের নতুন নিয়মের সুসমাচার চারটি যদি 'প্রেরিত' তথা যীশুর সহচরদের 'স্মৃতিকথা' না হয়ে থাকে, তাহলে এসব এলো কোত্থেকে ?

ও. ক্যালমান বলেছেনঃ "সুসমাচারের লেখকবৃন্দ ছিলেন প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র। কেউ কেউ তখন লোক মুখে প্রচলিত ঐতিহ্যভিত্তিক কাহিনী লিখিত আকারে ধরে রাখতেন। প্রায় ৩০/৪০ বছর ধরে এই সব সুসমাচার শুধুমাত্র লোক-কাহিনী হিসেবে জারী থাকে। পরবর্তীকালে এইসব রচনার সাথে বিভিন্ন বাণী ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী জুড়ে দেয়া হয়। সুসমাচার লেখকগণ নিজেদের ধ্যান-ধারণা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয় ধর্মীয় উদ্দেশ্য পুরণের জন্য ওইসব কাহিনীকে এক সূত্রে গ্রথিত করেন। তার আগে লোকজনের নিকট থেকে প্রাপ্ত বাণী ও বিবরণগুলিকে তারা একটার সাথে আরেকটা জুড়ে নিতেও ভুল করেন নি। এভাবে জুড়ে-গেঁথে নেওয়ার পরে, যীশুখ্রীষ্টের মুখে কোন বাণী তুলে দিতে গিয়ে কিংবা কোন ঘটনার বিবরণ পেশ করতে গিয়ে 'এর পরের ঘটনা' বা 'তিনি যখন বলেন' কিংবা তিনি যখন করলেন' শব্দগুলি সুকৌশলে তাঁদের ব্যবহার করতে হয়েছে। আর এভাবেই সিনোপটিক গসপেলস অর্থাৎ, মার্ক, মথি ও লুক লিখিত সুসমাচার তিনটির বর্ণনাভঙ্গি নিখুঁত সাহিত্যগুণসম্পন্ন হতে পেরেছে। কিন্তু কোন বর্ণনারই ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই।"

ইসলামী বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ডে বলা হয়েছে ঃ প্রকৃত পক্ষে ৬৯২ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান বিশ্বের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ পূর্ণাঙ্গ বাইবেলের উপর একমত হন। এর পূর্ব পর্যন্ত কোন একটি সম্প্রদায় একটি সংকলন প্রস্তুত করত, অন্য একটি সম্প্রদায় এর বিপরীতে আর একটি ভিন্ন সংকলন উপস্থিত করত।

তবে ৬৯২ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান বিশ্বের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ বাইবেলের উপর একমত হওয়া সত্ত্বেও এখনও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাইবেলের অধ্যায়ের সংখ্যা বিভিন্ন। ক্যাথলিকদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা ৭২ আর প্রোটেস্টানদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা ৬৬।

ডঃ মরিস বুকাইলী সুসমাচার সমূহের ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা হিসেবে বলেন, "সুসমাচার সমূহের কোন বর্ণনাই আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার মত নয়।" "ওসব পরিস্থিতির

www.iscalibrary.com

পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।" "তাদের নিজেদের সমাজে লোকের মুখে-মুখে যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে যেসব কাহিনী প্রচলিত ছিল, সুসমাচারের লেখকবৃন্দ সেগুলি সংকলন করেছেন মাত্র।" (ফাদার কানেনগিয়েসার)

ডঃ মরিস বুকাইলী আরও বলেন, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, বাইবেলের এসব গ্রন্থে বিভিন্ন পয়গম্বর কর্তৃক প্রাপ্ত ওহী বা প্রত্যাদেশের সংমিশ্রণ অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, এ সব প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত বাণীর ভিত্তিতে সেকালের লেখকরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে সব রচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন তা আমরা ওলড টেস্টামেন্ট বা তওরাত নামে পাচ্ছি। সেকালের লেখকরা বিভিন্ন নবীর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত বাণীর মধ্যে পরিবর্তন তো করেছেনই, অধিকন্তু তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে নিজস্ব যুগের এবং পরিবেশের প্রয়োজনে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ব্যাপক অদল বদল, এমনকি সংযোজন ঘটাতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত সমস্ত বাইবেলেই এ ধরনের বিভ্রান্তিকর কর্মকান্ড বিদ্যমান। বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত সব পুস্তকই বেশ কয়েকবার করে সংশোধন ও সম্পাদনা করা হয়েছে এবং প্রতিবারই বর্জিত বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওই সব বাড়তি বিষয় সম্ভবতঃ পরবর্তী সময়ের সংযোজন। বস্তুতঃ বাইবেলের কোথাও রয়েছে ঐতিহাসিক তথ্যের বিভ্রান্তি, কোথাও পুনঃরাবৃত্তির দোষ, কোথাও কাহিনীগত গরমিল এবং কোথাও রচনাগত তারতম্য। এক কথায় ইয়াহূদীদের গির্জার যেমন বিভিন্নতা রয়েছে তেমনি গির্জা ভিত্তিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বাইবেল। কেননা বাইবেল সম্পর্কে একেক গির্জার ধারণা একেক রকম। আর পারস্পরিক বিভিন্ন ধারণার কারণেই অন্য ভাষায় বাইবেল তরজমা করতে গিয়েও তাদের পক্ষে একমতে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতি এখনো অব্যাহত রয়েছে।[১]

আমরা আবার মূল আলোচনায় ফিরে আসছি।

আল্লাহর কিতাব বা আসমানী কিতাব সম্বন্ধে ঈমান রাখার মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ঃ

আল্লাহ্‌র কিতাব বা আসমানী কিতাব সম্বন্ধে ঈমান রাখার অর্থ হল প্রধানতঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশ্বাস করা ঃ

১. এ সমস্ত কিতাব আল্লাহ্‌র বাণী, মানব রচিত নয়।

২. আল্লাহ যেমন অনাদি (قديم) ও চিরন্তন, তাঁর বাণীও তদ্রূপ অনাদি ও চিরন্তন। কুরআন অনিত্ব-সৃষ্টি (حادث/مخلوق) নয়।[২]

৩. আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ।

১. তথ্যসূত্র ঃ (১) বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞানঃ ডঃ মরিস বুকাইলী। (২) ইসলামী আকীদা, মাওঃ ইসহাক ফরিদী। (৩) ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড ॥

২. এ ব্যাপারে মু'তাযিলাদের ভিন্ন মত রয়েছে, দেখুন "মু'তাযিলা" শিরোনাম, পৃঃ ২৭৬ ॥

www.iscalibrary.com

৪. কুরআন সর্বশেষ কিতাব-এর পর আর কোন কিতাব নাযিল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের বিধানই চলবে। কুরআনের মাধ্যমে অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধান রহিত (منسوخ) হয়ে গিয়েছে। যেমন ইঞ্জীলের মাধ্যমে তাওরাতের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছিল।

৫. কুরআনের হিফাযতের জন্য আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন, কাজেই এর পরিবর্তন কেউ করতে পারবে না। কুরআনকে সর্বদা অবিকৃত বলে বিশ্বাস করতে হবে।[১]

قال تعالى : انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون - (সূরাঃ ১৫-হিজ্‌রঃ ৯)

অর্থাৎ, আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তার হেফাজতকারী।

* যারা বলে বর্তমান কুরআন মূল কুরআনের এক তৃতীয়াংশ, অপর দুই তৃতীয়াংশ গায়েব, তারা কুরআনের হক্কানিয়্যাত অস্বীকারকারী। রাফিযীগণ (শী'আগণ) এরূপ বলে থাকেন। এটা স্পষ্ট কুফ্‌রী।[২]

কুরআন সত্য তার প্রমাণ

কুরআন যে সত্য, তার আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি প্রমাণ হলঃ

১. একজন উম্মী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নবী (সাঃ)-এর মুখ থেকে কুরআনের ন্যায় এরূপ মহা জ্ঞান ভান্ডারের গ্রন্থ প্রকাশ পাওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসব জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন।

২. কুরআন মানব রচিত হলে কুরআনের অনুরূপ আর একটি রচনা পেশ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হত। কিন্তু কুরআনের অনুরূপ রচনা পেশ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন চ্যালেঞ্জও পেশ করেছেন। ইরশাদ করেছেনঃ

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صدقين- فان لم تفعلوا ولن تفعلوا . الاية

অর্থাৎ, আমি আমার এই বান্দার উপরে যে কিতাব নাযিল করেছি, এ ব্যাপারে তোমাদের যদি সামান্যতম সন্দেহ থাকে (যে, এটা তাঁর রচনা করা কি না,) তাহলে এই কুরআনের (বড় কোন সূরা নয়, ছোট্ট) সূরার মত একটা সূরা রচনা করে দেখাও। তোমরা (একারা নয়) তোমাদের সব সহযোগীদের ডাক (ডেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এরকম একটা সূরা রচনা করে দেখাও।) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ তবুও তোমরা এর সমকক্ষ রচনা পেশ করতে পারবে না। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ২৩) বাস্তবেও কোন দিন কেউ কুরআনের সমকক্ষ রচনা পেশ করতে পারেনি।

এখানে চিন্তা করার বিষয় হল- ইসলামের মিশনকে ব্যর্থ করার জন্য কাফের শক্তিরা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ডলার পাউণ্ড ব্যয় করে। শত রকম ষড়যন্ত্র করে। অথচ কুরআনের মোকাবিলা করার জন্য সামান্য একটা সূরা রচনা করে তা পেশ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে না।

১. এ ব্যাপারে বার ইমামপন্থী শি'আদের ভিন্ন মত রয়েছে, দেখুন পৃঃ ২৫৪-২৫৯ ॥

২. مولانا المفتى يوسف التاؤلوى. بدائع الكلام থেকে গৃহীত ॥

www.iscalibrary.com

৩. কুরআন অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মনের কথা বলে দিয়েছে, যা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এটাও কুরআনের সত্য হওয়ার প্রমাণ। একটা ঘটনা -আব্দুল্লাহ ইব্নে উবাই একজন মুনাফিক ছিল। সে ধোকা দিয়ে, প্রতারণা করে মুসলমানদেরকে ওহুদ যুদ্ধ থেকে সরাতে চেয়েছিল। যাতে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়ে যায়। তার ষড়যন্ত্রে পড়ে মুসলমানদের দুটো গোত্র -বনূ হারেছা এবং বনূ সালামার লোকেরা সংশয়ে পড়ে গিয়েছিল যে; তারা যুদ্ধে থাকবে, না চলে যাবে। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়ে গেলঃ

اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما . الاية -

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে দুটো দল যুদ্ধ থেকে সরে যাবে কি না -এই চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত হয়েছিল, তবে আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তাদের অভিভাবক। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ১২২) আয়াত নাযিল হওয়ার পর উক্ত দুই গোত্রের লোকেরা স্বীকার করল যে, তারা এরূপ চিন্তা-ভাবনা করেছিল।

৪. কুরআন সত্য হওয়ার আর একটা প্রমাণ হলঃ কুরআনে অনেক বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। একটা ঘটনা-একবার রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে খৃষ্টানদের একটা প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল। ঐ মজলিসে কিছু ইয়াহূদীও উপস্থিত হল। ইয়াহূদী খৃষ্টানদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হল। ঝগড়ার এক পর্যায়ে ইয়াহূদী-গণ দাবী করল একমাত্র আমরাই হকপন্থী, আর কোন দল হকপন্থী নয়। আমাদের জন্যই জান্নাত নিশ্চিত, আর কারও জন্য নয়। খৃষ্টানরাও দাবী করল একমাত্র আমরাই হকপন্থী অন্য কেউ নয়, জান্নাত একমাত্র আমাদের জন্যই নিশ্চিত আর কারও জন্য নয়। উপরন্তু ইয়াহূদীরা দাবী করত যে, আমরা হলাম আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, অতএব আমাদের জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত। এরূপ দাবী করনেওয়ালা ইয়াহূদীদেরকে বলা হয়েছিলঃ

قل يايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صدقين -

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! তুমি এদেরকে বলে দাওঃ যদি তোমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্রই হয়ে থাকবে, মরলেই জান্নাত নিশ্চিত একথা যদি সত্য হয়, এটা যদি মনের কথা হয়, তাহলে মৃত্যু কামনা করে দেখাও। (সূরাঃ ৬২-জুমুআঃ ৬) আল্লাহ্ তা'আলা সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছেন যে,

ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم -

অর্থাৎ, কখনোই ওরা এ সাহস করবে না, ওরা মৃত্যু কামনা করবে না। (সূরাঃ ৬২-জুমুআঃ ৭) এ আয়াত তাদের পড়ে শোনানো হল, কিন্তু তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করতে সাহস পেল না। কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই প্রমাণিত হল।

আর একটা ঘটনা-নবী (সাঃ)-এর হিজরতের পাঁচ ছয় বছর পূর্বের ঘটনা। তখনকার দুই পরাশক্তি -রূম আর পারস্য সম্রাটের মধ্যে যুদ্ধ লাগল। যুদ্ধে পারস্য সম্রাট বিজয়ী হয়ে

www.iscalibrary.com

গেল। রোমকরা পরাজিত হল। মক্কার মুশরিকরা ছিল পারস্যের সমর্থক। কারণ পারস্য বাসীরাও মক্কাবাসীদের মত কোন আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করত না। তাদেরও কেউ কেউ মক্কাবাসীদের মত মূর্তি পূজা করত, কেউ আগুন পূজা করত। তাই মক্কার মুশরিকরা পারস্যের লোকদেরকে নিজেদের পক্ষশক্তি মনে করত। আর মুসলমানরা তুলনামূলক ভাবে রোমকদেরকে পছন্দ করত। কারণ রোমকরা ছিল খৃষ্টান। তারা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করত। এদিক থেকে তারা মুসলমানদের কাছাকাছি ছিল। পারস্যের বিজয়ে মক্কার মুশরিকরা খুব খুশি হল এই ভেবে যে, আমাদের পক্ষশক্তির বিজয় শুরু হল। তারা মুসলমানদেরকে বললঃ হে মুসলমানরা, পারস্যবাসীরা যেমন রোমকদেরকে পরাজিত করেছে, ভবিষ্যতে আমরাও তোমাদেরকে ওরকম পরাজিত করব। মুসলামানরা কিছুটা মনক্ষুন্ন হল। আয়াত নাযিল হয়ে গেলঃ

الم غلبت الروم فى ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون -

অর্থাৎ, রোমকরা পরাজিত হয়েছে। আগামী তিন বছর থেকে নয় বছরের ভিতরে আবার রোমকরা বিজয়ী হবে। সেদিন মুসলমানরা আনন্দিত হবে। (সূরা ঃ ৬২-রূম ঃ ১-৪) আয়াত শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) দৌড় দিয়ে মুশরিক নেতৃবৃন্দের কাছে চলে গেলেন। বললেনঃ তোমাদের খুশি হওয়ার কিছু নেই, কিছুদিন পরেই তোমাদের লোকেরা অর্থাৎ, পারস্যবাসীরা পরাজিত হবে, রোমকরা বিজয়ী হবে। কাফেরদের নেতা উবাই ইব্নে খাল্ফ বললঃ না, এটা কখনো হবে না, তাহলে বাজি ধর। বাজি ধরা হল। ঘটনা বেশ দীর্ঘ। শেষ পর্যন্ত একশত উট বাজি ধরা হল। কথা হল - যদি আগামী নয় বছরের ভিতরে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তাহলে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) একশত উট দিবেন উবাই ইব্নে খাল্ফকে, আর বিজয়ী হলে উবাই ইব্নে খাল্ফ আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে একশত উট দিবে। এর সাত বছরের মাথায় যখন বদর যুদ্ধ হয়, তখন একদিকে বদর যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হল, অপর দিকে রোম পারস্যের মধ্যকার যুদ্ধে রোকমরা বিজয়ী হল। এভাবে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য-প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হল।

৫. কুরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, সেকালের শরী'আত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে যুগের ইয়াহূদী খৃষ্টানদের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণও ততটা অবগত ছিল না। অথচ রাসূল (সাঃ)-এর কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না।

৬. কুরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে কোন বিরক্তি আসে না। বরং যতই তিলাওয়াত করা হয়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। অথচ দুনিয়ার কোন আকর্ষণীয় থেকে আকর্ষণীয় পুস্তকের বেলায়ও দেখা যায় দুচার বার পাঠ করার পর আর তা পাঠ করতে মন চায় না।

৭. কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজে নিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে কেউ বিন্দু বিসর্গ পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। লক্ষ লক্ষ হাফেযে কুরআন

www.iscalibrary.com

সৃষ্টি হওয়া ও থাকার ফলে এই কিতাবে কোনরূপ পরিবর্তনের সম্ভাবনাও কেউ কল্পনা করতে পারে না।

৮. কুরআনে জ্ঞানের যে মহাভান্ডার পুঞ্জিভূত করা হয়েছে, তা অন্য কোন কিতাবে আজ পর্যন্ত করা হয়নি এবং ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

৯. কুরআন পাঠের ফলে মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

১০. রাসূল (সাঃ)- এর সত্য নবী প্রমাণিত হওয়া কুরআনেরও সত্য কিতাব হওয়ার প্রমাণ।

৫. আখেরাত সম্বন্ধে ঈমান

মৌলিক যে সব বিষয়ে ঈমান আনতে হয়, তার মধ্যে একটি হল আখেরাত সম্বন্ধে ঈমান। এই জগতের যেমন শুরু আছে তেমনি এর একটা শেষও রয়েছে। মৃত্যুর পর পুনরায় সকলে জীবিত হবে। দুনিয়ায় কৃত সকল কর্মের জবাবদিহী করতে হবে এবং কর্মের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি হবে। সকল আসমানী কিতাব পরকালে বিশ্বাসের ব্যাপারে একমত। পরকালে অবিশ্বাস করলে তার ঈমান থাকে না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, তাদের সাথে যুদ্ধ কর। (সূরাঃ ৯-তাওবাঃ ২৯)

প্রসঙ্গঃ পুনর্জন্মবাদ

হিন্দুগণ মুসলমানদের ন্যায় পরকালে বিশ্বাস করে না। তারা পুনর্জন্মবাদ (تناسخ)-এর প্রবক্তা। তারা বলে ঃ যারা ইহজগতে পূণ্য অর্জন করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে, তারা তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী আবার অন্য কোন দেহে পুনরায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। যেমন বাহাদুর ব্যক্তি বাঘের দেহে, কাপুরুষ খরগোসের দেহে আবির্ভূত হয়। এভাবে প্রত্যেকে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করার জন্য আবার অন্য কোন দেহে পৃথিবীতে আবির্ভূত হতে থাকে। এক সময় যখন সে পূণ্য অর্জন করে এবং আবিলতা থেকে মুক্তি [illegible], তখন তার আত্মা স্বর্গলোকে আত্মিক সুখে মগ্ন হয়। এর বিপরীত যে দেহ শারীরিক আবিলতা তথা অজ্ঞতা ও অসৎচরিত্র থেকে মুক্তি অর্জন করতে না পারে তার আত্মা পরকালে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। এটাকেই তারা পুনঃজন্মবাদ বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

কিন্তু পরজন্মে কে কোন্ অপরাধের কারণে কোন্ দেহে আবির্ভূত হল তা যখন জানতে পারল না, তখন সংশোধনের এই প্রক্রিয়া যুক্তিসংগত ও মনস্তাত্বিক নীতি সমৃদ্ধ নয়। কেননা মনস্তাত্বিক ভাবে কারও সংশোধন তখনই হয় যখন সে জানতে পারে তার অপরাধ কি ? সংশোধনের জন্য কাউকে প্রেরণ করা হল অথচ সে জানতেই পারলনা তার অপরাধ কি, এটা কোনক্রমেই যুক্তিসংগত নয়। তদুপরি মানুষকে যদি অপরাধের কারণে

www.iscalibrary.com

বাঘ ভল্লুক বা শিয়াল কুকুরের আকারে পুনরায় আবির্ভূত হতে হয়, তাহলে তার সংশোধন কিভাবে হবে? পুর্ব জন্মে তার যে অপরাধ হয়েছিল সেটা ছিল মনুষ্য সংক্রান্ত; এখন বন্য প্রাণী হয়ে তার পক্ষে মনুষ্য চরিত্রের ত্রুটি সংশোধন হবে কিভাবে ? এটা কোন যুক্তিতেই বোধগম্য নয়।

পুনঃজন্মবাদের প্রবক্তা দার্শনিকদের কেউ কেউ পুনর্জন্মবাদের পক্ষে ঐ সব হাদীছ থেকে প্রমাণ পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে জাহান্নামীর দেহ ওহুদ পাহাড়ের মত বড় হবে, তাদের শরীরের চামড়া কয়েক গজ পুরু হবে ইত্যাদি। এমনিভাবে জান্নাতীদের দেহও হযরত আদম (আঃ)-এর দেহের মত ৬০ হাত দীর্ঘ হবে। তারা বলতে চায় দুনিয়াতে তাদের এই দেহ ছিল না, অথচ এই দেহে তাদের পৃথিবীর আত্মা প্রবিষ্ট হচ্ছে। এটাই হল এক আত্মার অন্য দেহে আবির্ভাব। এটাকেই তো পুনঃজন্মবাদ বলা হয়। কিন্তু এই যুক্তি ভ্রান্ত। কারণ ঃ

১. পুনর্জন্মবাদ বলা হয় আত্মার এক দেহ থেকে অন্য দেহে আবির্ভাব। আর এখানে যে দেহে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের আত্মার আবির্ভাব হচ্ছে, তা ভিন্ন কোন দেহ নয় বরং তারই দেহ, তবে সেটাকে বর্ধিত করে দেয়া হয়েছে। এই বর্ধিত দেহে তার দুনিয়ার আত্মা আবির্ভূত হচ্ছে। বর্ধিত দেহ আর ভিন্ন দেহের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার কারণেই জান্নাতী ও জাহান্নামীদের বড় দেহে দুনিয়ার আত্মার আবির্ভাবে পুনর্জন্মবাদের ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

২. তাছাড়া পুনঃজন্মবাদের সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে, আর জান্নাত বা জাহান্নামের দেহ পরকালীন জগতের বিষয়। পরকালীন জগতের বিষয় দিয়ে দুনিয়ার বিষয়ে দলীল দেয়া চলে না।

পুনর্জন্মবাদীরা আরও একটি হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়ে থাকে; যাতে বলা হয়েছেঃ

انما نسمة المؤمن طير تعلق فى شجرة الجنة -

অর্থাৎ, মুমিনের আত্মা পাখীর আকৃতি ধারণ করে জান্নাতের বৃক্ষে বিচরণ করবে। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ দেয়া চলবে না। কেননা, এ হাদীছের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

حتى يرجع الله فى جسده يوم بعثته -

অর্থাৎ, তারপর পুনরুত্থানের সময় আল্লাহ তাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেবেন। বোঝা গেল অন্তবর্তীকালীন সময়ে যে পাখির মধ্যে সে ছিল সেটা তার দেহ নয় বরং তা হল একটা বাহনের মত।[১]

আখেরাতে ঈমান রাখার মধ্যে যে যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত ঃ

আখেরাত বা পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস করার অর্থ হল - মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কবর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, হাশর-নাশর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় জান্নাত

১. عقائد الاسلام. عبد الحق حقانى ও অন্যান্য গ্রন্থের আলোকে ॥

www.iscalibrary.com

জাহান্নাম ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়- যেগুলো সম্পর্কে ঈমান আনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে তার সব কিছুতেই বিশ্বাস করা।[১] অতএব এ পর্যায়ে মোটামুটি ভাবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে বিশ্বাস রাখতে হবে।

(এক) কবরের সওয়াল জওয়াব সত্যঃ

কবরে প্রত্যেক মানুষের সংক্ষেপে কিছু পরীক্ষা হবে। মুনকার ও নাকীর নামক দুজন ফেরেশতা কবরবাসীকে প্রশ্ন করবে তোমার রব কে ? তোমার দ্বীন কি ? তোমার রাসূল কে? সে নেককার হলে এ প্রশ্নাবলীর উত্তর সঠিক ভাবে দিতে সক্ষম হবে। তখন তার কবরের সাথে এবং জান্নাতের সাথে দুয়ার খুলে যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়া হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে সুখে বসবাস করতে থাকবে। আর নেককার না হলে (অর্থাৎ, কাফের বা মুনাফিক হলে) প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে সে বলবে هاه هاه لا ادرى অর্থাৎ, হায় হায় আমি জানি না! তখন জাহান্নাম ও তার কবরের মাঝে দুয়ার খুলে দেয়া হবে। এবং বিভিন্ন রকম শাস্তি তাকে দেয়া হবে।[২] কবরে মুনকার নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয়ের আগমন ও প্রশ্ন করা সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

قال عليه الصلاة والسلام : اذا قبر الميت ، او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير . الحديث - (رواه الترمذى وصححه واخرجه ايضا كثيرون)

অর্থাৎ, যখন মাইয়্যেতকে কবরস্থ করা হবে, তখন তার কাছে কাল রংয়ের নীল চক্ষু বিশিষ্ট দুজন ফেরেশতা আগমন করবে, যাদের একজনকে বলা হয় মুন্‌কার, অন্যজনকে বলা হয় নাকীর। ।

জমহুরের মতে এই সওয়াল জওয়াব মু'মিন গায়রে মু'মিন নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই হবে। তবে সহীহ মত অনুসারে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও শহীদগণকে তাঁদের উচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে কবরে প্রশ্ন করা হবে না। সহীহ মুসলিম ও নাসায়ী শরীফের হাদীছ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।[৪]

দুনিয়ার মানুষ সওয়াল জওয়াব শুনতে পায়না বলে সেটাকে অস্বীকার করা যায়না। একজন ঘুমন্ত মানুষ বহু কিছু স্বপ্নে দেখে এবং শোনে, অথচ তার পার্শ্ববর্তী লোকটি তা কিছুই টের পায়না। রাসূল (সাঃ) হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর কথা শুনতেন এবং তাকে দেখতেন অথচ পাশে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তা কিছুই শুনতে পেতেন না, দেখতে পেতেন না। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

১. مرقاة جـ١/ ॥

২. জাহমিয়া ও মু'তাযিলাগণ কিয়ামতের পূর্বে মুর্দার জীবিত হওয়া এবং মুনকার নাকীরের সওয়াল জওয়াব ও কবরের আযাবকে অস্বীকার করে। দ্রঃ ২য় খণ্ড, জাহ্‌মিয়া ও মু'তাযিলা শিরোনাম ॥ ৪. الاتحاف جـ٢ ॥

www.iscalibrary.com

ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء -

অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না, তিনি যতটুকু চান তা ছাড়া। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ২৫৫)

(দুই) কবরের আযাব সত্য ঃ

কবর মূলতঃ শুধু নির্দিষ্ট গর্তকে বলা হয় না, কবর বলতে আসলে বুঝায় মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালীন জগতকে। এ জগতকে কবর জগত (عالم القبر), আলমে বরযখ (عالم البرزخ) বা বরযখের জগত বলা হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون -

অর্থাৎ, তাদের পশ্চাতে রয়েছে বারযাখ তাদের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (সূরাঃ ২৩ মু'মিনুনঃ ১০০)

মুর্দাকে কবরস্থ করার পর তার দেহে রূহ প্রত্যাবর্তন করে। জমহুর এবং অধিকাংশের মতে রূহের প্রত্যাবর্তন পূর্ণাঙ্গভাবে হয়না বরং দেহ বা দেহের অংশ বিশেষের উপর তার প্রভাব পড়ে। যাকে পরিভাষায় اشراق এবং اسراف বলা হয়।[১]

মৃত্যুর পর মানুষের মরদেহ যেখানেই যেভাবে থাকুক না কেন সে কবর জগতের অধিবাসী হয়ে যায় এবং বদকার হলে তার উপর আযাব চলতে থাকে।[২] কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب -

অর্থাৎ, সকাল-সন্ধা তাদের কাছে আগুন পেশ হয়। আর কিয়মতের দিন বলা হবে হে ফিরআউনী সম্প্রদায়! তোমরা কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ কর। (সূরাঃ ৪০-মু'মিনঃ ৪৬) কুরআনে কারীমে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا -

অর্থাৎ, তাদের পাপের কারণে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়। অনন্তর তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করানো হয়। (সূরাঃ ৭১-নূহঃ ২৫) হাদীছে ইরশাদ হয়েছে ঃ

انكم تفتنون او تعذبون فى قبوركم - (رواه الشيخان عن عائشة)

অর্থাৎ, তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষায় ফেলানো হবে, অথবা তোমাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে। অন্য এক হাদীছে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ

تعوذوا بالله من عذاب القبر - (مسلم)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে কবরের আযাব থেকে পানাহ কামনা কর।

১. تسكين الصدور . محمد سرفراز خان صفدر ॥

২. খাওয়ারিজ, মু'তাযিলা ও কতক মুরজিয়া কবর আযাবকে অস্বীকার করে। তাদের বিষয়ে জানার জন্য সংশ্লিষ্ট শিরোনাম দেখুন ॥

www.iscalibrary.com

কবরের এ আযাব মূলতঃ হয় রূহের উপর এবং রূহের সাথে দেহও সে আযাব উপলব্ধি করে থাকে। তাই দেহ যেখানেই যেভাবে থাকুক না কেন, জ্বলে পুড়ে ছাই বা পঁচে গলে মাটি হয়ে যাক না কেন, তার যে অংশ অবশিষ্ট থাকবে, সেটুকু আযাব উপলব্ধি করবে।[১] আর মৌলিক ভাবে আযাব যেহেতু রূহের উপর হবে, তাই কবরের আযাব হওয়ার জন্য এই দেহ অবশিষ্ট থাকাও অপরিহার্য নয়।

যিন্দা মুসলমানদের দুআ, দান-খয়রাত ও নামায তিলাওয়াত দ্বারা মুর্দা মুসলমানদের উপকার হয়। তবে কাফেরগণ কারও দুআ খয়রাত দ্বারা উপকৃত হয় না। এর দ্বারা তাদের শাস্তিও লাঘব বা লঘু হয় না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون -

অর্থাৎ, তাদের থেকে আযাব লঘু করা হবে না। আর না তারা সাহায্যপাপ্ত হবে। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ৮৬)

(তিন) পুনরুত্থান ও হাশর ময়দানের অনুষ্ঠান সত্য ঃ

কিয়ামতের সময় শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর সবকিছু নেস্ত-নাবূদ হয়ে যাবে।[২] কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেনঃ একমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩] আবার আল্লাহ্‌র হুকুমে এক সময় শিংগায় ফুঁক[৪] দেয়া হলে আদি অন্তের সব জিন ইনছান ও যাবতীয় প্রাণী পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ونفخ فى الصور فصعق من فى السموت ومن فى الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون -

অর্থাৎ, শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাদেরকে চান তারা ছাড়া সকলে বেহুশ হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। (সূরাঃ ৩৯-যুমারঃ ৬৮)

যুক্তিগতভাবেও পুনরুত্থান সম্ভব। কারণ পুনরুত্থান হল পুনর্বার সৃষ্টি। আর যে খোদা প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি পুনর্বার সৃষ্টি করতে আরও বেশী সক্ষম। যেমন কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

১. وفى الفتاوى البزازية حتى لو اكله السبع فالسؤال فى بطنه - ॥

২. কোন কোন উলামায়ে কেরামের মতে ৮টি জিনিস এই ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। তা হল ঃ আরশ, কুরসী, লওহ, কলম, বেহেশ্‌ত, দোযখ, শিংগা ও রূহ। তবে রূহের উপর এক ধরনের বেহুশী আপতিত হবে ॥

৩. عقائد الاسلام. عبد الحق حقانى ॥

৪. এটা হবে দ্বিতীয় ফুঁক। দুই ফুঁকের মাঝখানে ৪০ বৎসরের ব্যবধান হবে। عقائد الاسلام . عبد الحق حقانى ॥

www.iscalibrary.com

قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذى انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم -

অর্থাৎ, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন তা পচে গলে যাবে? তুমি বলে দাও, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনি, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরাঃ ৩৬ -ইয়াসীনঃ ৭৮-৭৯)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه -

অর্থাৎ, তিনি ঐ সত্তা যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। অনন্তর আবার তাকে সৃষ্টি করবেন। পুনর্বার সৃষ্টি করা তার জন্য আরও সহজ। (সূরাঃ ৩০-রূমঃ ২৭)

আরও বলা হয়েছেঃ

كما بدأنا اول خلق نعيده -

অর্থাৎ, যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনর্বার সৃষ্টি করব। (সূরাঃ ২১-আম্বিয়াঃ ১০৪)

কুরআন শরীফে উল্লেখিত সূরা বাকারায় বনী ইসরাঈলের একটি ঘটনায় গাভী যবেহ করতঃ তার এক অংশের ছোয়ায় মৃতের জীবিত হওয়া, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে চারটি পাখি যবেহ করার পর পুনরায় তাদের জীবিত হওয়া, হযরত উযায়ের (আঃ)-এর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া এবং আসহাবে কাহাফের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম তার চাক্ষুস প্রমাণ দেখিয়েছেন।

পুনরুত্থান শারীরিক, না শারীরিক-আত্মিক উভয়ভাবে

পুনরুত্থান শারীরিক না শারীরিক-আত্মিক উভয়ভাবে সংঘটিত হবে, এ সম্বন্ধে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মুতাকাল্লিমীনের অধিকাংশের মতে পুনরুত্থান হবে শারীরিক ভাবে। তাদের মতে রূহ বা আত্মাও একটি সুক্ষ্ম দেহ বিশেষ যা শরীরের সর্বত্র মিশে আছে। যেমন গোলাবের পানি গোলাবের সর্বত্র মিশে থাকে। অতএব রূহ ও দেহ উভয়ের সমভিব্যাহারে পুনরুত্থান হল শারীরিক। (الاتحاف جـ/٢)

দলীল কুরআনে কারীমের আয়াত ঃ

يايتها النفس المطمئنة- ارجعى الى ربك راضية مرضية- فادخلى فى عبادى - وادخلى جنتى-

অর্থাৎ, হে নফ্‌ছে মুতমায়িন্না (প্রশান্ত আত্মা)! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরাঃ ৮৯-ফাজ্‌রঃ ৩০)

www.iscalibrary.com

এক শ্রেণীর দার্শনিক এই বলে শারীরিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে যে, পরকালে এরূপ আসমান যমীন থাকবে না তাই সেখানে এরূপ শরীর নিয়ে জীবন ধারণ সম্ভব নয়। এরূপ সন্দেহের জওয়াব দিয়ে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

او ليس الذى خلق السموت والارض بقدر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم -

অর্থাৎ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (সূরাঃ ৩৬-ইয়াসীনঃ ৮১)

পুনরুত্থান কোন্ দেহের উপর হবে?

পুনরুত্থান হবে শরীরের মৌলিক অংশের উপর ভিত্তি করে যা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে। খাদ্য-খাবার দ্বারা যার প্রবৃদ্ধি ঘটে কিংবা রোগ-ব্যধিতে যার হ্রাস ঘটে তার নয়। অতএব দেহ যেখানেই যেভাবে থাকুক না কেন, কোন প্রাণীর পেটে চলে যাক, জ্বলে পুড়ে ছাই বা পঁচে গলে মাটি হয়ে যাক না কেন, তার যে অংশ অবশিষ্ট থাকবে সেটুকু আযাব উপলব্ধি করবে। আর মৌলিক ভাবে আযাব যেহেতু রূহের উপর হবে, তাই কবরের আযাব হওয়ার জন্য এই দেহ অবশিষ্ট থাকা অপরিহার্য নয়।

শরীরের মৌলিক অংশের উপর ভিত্তি করে পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার নির্দেশনা পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে ঃ

كل ابن ادم يفنى الا عجب الذنب ، منه خلق ومنه يركب - (الاتحاف جـ/٢ نقلا عن شارح الحاجبية)

অর্থাৎ, সকল বনী আদম ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে তার প্রথম অংশ ব্যতিক্রম; তার থেকে তার সৃষ্টি হয়েছে এবং তার থেকেই তার পুনর্গঠন হবে।

(চার) আল্লাহ্‌র বিচার ও হিসাব নিকাশ সত্য ঃ

পুনর্জীবিত হওয়ার পর সকলকে আল্লাহ তা'আলার বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم -

অর্থাৎ, অনন্তর সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরাঃ ১০২ তাকাছুরঃ ৮) অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ان السمع والبصر والفواء كل اولئك كان عنه مسئولا -

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর-এগুলোর সবটা সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ৩৬)

www.iscalibrary.com

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لا تزول قدما ابن ادم يوم القيمة حتى يسأل عن خمس- عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وما ذا عمل فيما علم -

(الترمذى)

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন পাঁচটা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার (অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশের) আগে কোন বনী আদমের পা নাড়ানোরও ক্ষমতা থাকবে না। তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছিল, তার যৌবন কোথায় ক্ষয় করেছিল, সম্পদ কোথা থেকে আয় করেছিল এবং কোথায় ব্যয় করেছিল আর যা জেনেছিল তার কতটুকু আমল করেছিল।

(পাঁচ) কিয়ামতের দিন আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে সওয়াল করা সত্য ঃ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষকে সওয়াল করবেন এটা সত্য।[১] হাদীছে এসেছে ঃ

الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويقره فيقول اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا ؟ فيقول نعم اى رب حتى اذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه انه قد هلك قال سترتها عليك فى الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته الحديث

অর্থাৎ, আল্লাহ মু'মিনকে কাছে আনবেন অতঃপর তার দিকে ঝুকে তার থেকে তার পাপের স্বীকৃতি নিবেন। তাকে জিজ্ঞাসা করবেন অমুক অমুক পাপ চেন কি? (অর্থাৎ, তুমি এগুলো করেছকি ?) সে বলবে হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক। অবশেষে যখন তার থেকে তার পাপের স্বীকৃতি নেয়া হবে এবং সে মনে মনে ভাববে আমার ধ্বংসতো অনিবার্য। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ আমি দুনিয়ায় তোমার এ সব পাপ গোপন করে রেখেছিলাম, আজও আমি তা ক্ষমা করে দিব। অতঃপর তাঁর নেক আমলনামা তার হাতে দেয়া হবে।।

(ছয়) নেকী ও বদীর ওজন সত্যঃ

কিয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য মিযান (ميزان) বা দাড়িপাল্লা (মাপযন্ত্র) স্থাপন করা হবে এবং তার দ্বারা নেকী বদী ওজন করা হবে ও ভাল-মন্দ এবং সৎ-অসতের পরিমাপ করা হবে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

ونضع الموازين القسط ليوم القيمة . الاية -

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি ইন্সাফের দাড়িপাল্লা স্থাপন করব। (সূরাঃ ২১-আম্বিয়াঃ ৪৭)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بايتنا يظلمون -

১. شرح العقائد النسفيه ॥

www.iscalibrary.com

অর্থাৎ, সেদিনকার ওজন সত্য। তখন যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তারা সফলকাম। আর যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারা এমন লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এভাবে যে, তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অবিচার করত। (সূরাঃ ৭-আ'রাফঃ ৮-৯)

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট সহীহ মত হল- কিয়ামতের দিন আমলকে দেহে রূপান্তরিত করে সেই দেহ ওজন দেয়া হবে কিংবা কোন দেহে রেখে আমলকে ওজন দেয়া হবে। তখন নেককার লোকদের আমল সুন্দর এবং বদকার লোকদের আমল কুৎসিত আকার ধারণ করবে। আল্লামা যাবীদী বলেনঃ আমল ওজন হবে এই মতটিই সহীহ। দলীল নিম্নোক্ত হাদীছ সমূহ ঃ

حديث ابى الدرداء : ما يوضع فى الميزان يوم القيامة اثقل من خلق حسن - اخرجه ابو داؤد والترمذى وصححه ابن حبان - (الاتحاف جـ٢/)

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দরদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত - রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী কিছু ওজনের পাল্লায় রাখা হবে না। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে হযরত জাবের (রাঃ) আছে ঃ

وفى حديث جابر توضع الموازين يوم القيمة فتوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة ، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار ، قيل فمن استوت حسناته وسيئاته ؟ قال : اولئك اصحاب الاعراف - (المصدر السابق)

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন ওজনের পাল্লা স্থাপন করা হবে। অতঃপর নেকী ও বদী ওজন দেয়া হবে। বদীর চেয়ে যার নেকী সরিষার দানা পরিমাণও বেশী হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যার নেকীর চেয়ে বদী সরিষার দানা পরিমাণও বেশী হবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ

وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس ان الله تعالى يقلب الاعراض اجساما فيزنها - (المصدر السابق)

অর্থাৎ, দেহহীন আমলগুলোকে দেহে রূপান্তরিত করে তা ওজন দেয়া হবে।

মু'তাযিলাগণ আমলের দেহ না থাকায় তার ওজন হওয়াকে অসম্ভব মনে করেছেন। এর জওয়াব অতিবাহিত হল যে, আল্লাহ তা'আলা আমলকে দেহে রূপান্তরিত করবেন। তদুপরি এই যুগে দেহহীন আলো, বাতাস, তাপ ইত্যাদির ওজন হওয়ার বাস্তবতা সামনে এসে যাওয়ায় মু'তাযিলাদের যুক্তি এ যুগে অচল বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

(সাত) শাফাআত সত্যঃ

শাফা'আত মশহুর হাদীছ (خبر مشهور) দ্বারা প্রমাণিত। মু'তাযিলাগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেননা তাদের ধারণায় পাপীকে ক্ষমা করা আল্লাহ্র পক্ষে সম্ভব

www.iscalibrary.com

নয়।[১] আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট আল্লাহ তা'আলা কবীরা গোনাহ্ ক্ষমা করতে পারেন যদি সে গোনাহকে হালাল মনে করে করা না হয়। পক্ষান্তরে কোন সগীরা গোনাহ করার কারণেও তিনি বান্দাকে শাস্তি দিতে পারেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ان الله لا يغفر ان يشرک به ويغفر ما دون ذلک لمن يشاء -

অর্থাৎ, আল্লাহ্র সাথে শরীক করাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। অন্য গোনাহ যাকে তিনি ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরাঃ ৪ নিছাঃ ১১৬)

مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصها -

অর্থাৎ, এ কি অদ্ভুত আমলনামা ছোট-বড় কোন কিছুকে বাদ দেয়না; বরং সবই হিসাব রেখেছে ! (সূরাঃ ১৮-কাহ্ফঃ ৪৯)

পরকালে রাসূল (সাঃ), আলেম, হাফেয প্রমুখদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে। রাসূলে কারীম (সাঃ) অনেক প্রকারের শাফা'আত বা সুপারিশ করবেন। তন্মধ্যেঃ

১. হাশরের ময়দানের কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য। হাশরের ময়দানে কষ্টে সমস্ত মাখলূক যখন পেরেশান হয়ে বড় বড় নবীদের কাছে আল্লাহ্র নিকট এই মর্মে সুপারিশ করার আবেদন করবে যেন আল্লাহ পাক বিচার কার্য শুরু করে হাশরের ময়দানের কষ্ট থেকে সকলকে মুক্তি দেন, তখন সকল নবী অপারগতা প্রকাশ করবেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা সেদিন অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। অবশেষে রাসূল (সাঃ) সুপারিশ করবেন। এটাকে শাফা'আতে কুব্রা (شفاعت كبرى) বা বড় সুপারিশ বলা হয়। এ ছাড়াও নবী (সাঃ) আরও বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ করবেন। যেমন ঃ

২. হিসাব ও সওয়াল সহজ করার জন্য।

৩. কোন কোন কাফেরের আযাব সহজ করার জন্য। যেমন রাসূলের চাচা আবূ তালেবের জন্য এরূপ সুপারিশ হবে।

৪. কোন কোন মু'মিনকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য।

৫. যে সব মু'মিন বদ আমল বেশী হওয়ার কারণে জাহান্নামের যোগ্য হয়েছে- এরূপ মু'মিনদের কতকের জাহান্নামে না পাঠানো বরং ক্ষমা করে দেয়ার জন্য।

৬. কোন কোন মু'মিনকে বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করানোর জন্য।

৭. আ'রাফ তথা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত প্রাচীরে যারা অবস্থান করবে তাদের মুক্তির জন্য।

৮. বেহেশ্তে কতক মু'মিনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

মু'তাযিলাগণ প্রথম ও শেষোক্ত প্রকার ব্যতীত অন্য সব প্রকার সুপারিশকে অস্বীকার করেন। কারণ তাদের ধারণায় পাপ করলে কেউ মু'মিন থাকে না আর মু'মিন না হলে তার ক্ষমা হতে পারবে না। অতএব তার জন্য সুপারিশ অর্থহীন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "মু'তাযিলা" শিরোনাম।

১. شرح العقائد النسفيه ॥

www.iscalibrary.com

(আট) আমল নামার প্রাপ্তি সত্য ঃ

* রাসূল (সাঃ)-এর সুফারিশের পর কিয়ামতের ময়দানে আমল নামা উড়িয়ে দেয়া হবে। প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে গিয়ে পড়বে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وكل انسان الزمنه طئره فى عنقه ونخرج له يوم القيمة كتبا يلقه منشورا ـاقرأ كتبك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ـ

অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক মানুষের কর্ম তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব (আমলনামা) যা সে উন্মুক্ত পাবে। (সূরাঃ ১৭ বানী ইসরাঈলঃ ১৩)

* নেককারের আমলনামা তার ডান হাতে গিয়ে পৌঁছবে, আর বদকারের আমলনামা বাম হাতে গিয়ে পড়বে।

فاما من اوتى كتبه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتبيه واما من اوتى كتبه بشماله فيقول يليتنى لم اوت كتبيه الاية ـ

অর্থাৎ, তখন যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ..... আর যাকে তার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায় আমাকে যদি আমার আমলনামা দেয়াই না হত! (সুরাঃ ৬৯-হাক্কাঃ ১৯-২৯)

* প্রত্যেকে তার জীবনের ভাল-মন্দ ক্ষুদ্র বৃহৎ যা কিছু করেছে সব তার আমলনামায় লিখিত অবস্থায় পাবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ويقولون يويلتنا ما لهذا الكتب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ـ

অর্থাৎ, তারা বলবে হায় আমাদের দূর্ভোগ এ কি অদ্ভুত আমলনামা ছোট-বড় কোন কিছুকে বাদ দেয়না; বরং সবই হিসাব রেখেছে ! তারা তাদের যাবতীয় আমল উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি জুলুম করেন না। (সূরাঃ ১৮-কাহ্‌ফঃ ৪৯)

* প্রত্যেককে তার আমলনামা পড়তে দেয়া হবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اقرأ كتبك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ـ

অর্থাৎ, তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ কর। আজ তোমার হিসাব নেয়ার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ঠ। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈল ১৪)

(নয়) হাউযে কাউছার সত্য ঃ

কবর থেকে উঠার পর কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেকে পিপাসার্ত থাকবে। তাদেরকে পানি পান করানোর জন্য প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মর্তবা অনুযায়ী একটি একটি হাওয দান করবেন। এই হাউয থেকে তাঁরা তাদের উম্মতকে পানি পান করাবেন, যার ফলে পিপাসা আর তাদেরকে কষ্ট দিবে না। আমাদের নবী (সাঃ) কে যে হাউয দান

www.iscalibrary.com

করা হবে তার নাম হাউযে কাউছার। হাউযে কাউছার অন্যান্য সকল হাউয থেকে বড় হবে।[১]

হাউযে কাউছার কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

انا اعطينک الكوثر ـ

অর্থাৎ, আমি তোমাকে কাউছার দান করেছি। (সূরাঃ ১০৮-কাউছারঃ ১)

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে ঃ

حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء مائه ابيض من اللبن و ريحه اطيب من المسک وكيزانه اكثر من نجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ ابدا ـ

অর্থাৎ, আমার হাউয এক মাস সফর করা পরিমাণ বিস্তৃত। তার কোণগুলো সমান। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা। তার সুগন্ধি মেশ্‌কের চেয়ে উত্তম। তার পেয়ালা আকাশের নক্ষত্রের চেয়ে বেশী সংখ্যক। কেউ একবার তা থেকে পান করলে আর কখনও সে পিপাসার্ত হবে না।

(দশ) পুলসিরাত সত্য ঃ

* হাশরের ময়দানের চতুর্দিক জাহান্নাম দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে। এই জাহান্নামের উপর একটি পুল স্থাপন করা হবে, যা চুলের চেয়ে সরু এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো হবে। এটাকে বলা হয় পুলসিরাত। সকলকেই এই পুল পার হতে হবে। যে খোদা পাখিকে হাওয়ায় উড়াতে সক্ষম, তিনি এমন পুলসিরাতের উপর দিয়ে মানুষকে চালাতেও সক্ষম।

* এই পুরসিরাত হল দুনিয়ার সিরাতে মুসতাকীমের স্বরূপ। দুনিয়াতে যে যেভাবে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলেছে, সে সেভাবে পুরসিলাত পার হয়ে যাবে। কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ চোখের পলকে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ হেটে, আবার কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে। মোটকথা, যার যে পরিমাণ নেকী সে সেরকম গতিতে উক্ত পুল পার হবে। আর পাপীদেরকে জাহান্নামের আংটা জাহান্নামের মধ্যে টেনে ফেলে দিবে। পুলসিরাত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে ঃ

ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم ـ قيل يا رسول الله وما الجسر ؟ قال دحض مزلة فيها خطاطيف وكلاليب فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكاجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس فى نار جهنم . الحديث ـ (مسلم جـ١)

অর্থাৎ, অনন্তর জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে। শাফা'আত সংঘটিত হবে। লোকেরা বলবে হে আল্লাহ! নিরাপত্তা দাও নিরাপত্তা দাও। রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা

১. عقائد الاسلام. ادريس كاندهلوى ـ ॥

www.iscalibrary.com

হল পুল কি? তিনি বললেন ঃ পদস্খলন ঘটার এক পিচ্ছিল স্থান। তাতে থাকবে সাঁড়াশি ও আংটা। তখন মু'মিনরা কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ পাখির মত, কেউ দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় এবং কেউ সাধারণ সওয়ারীর গতিতে সে পুল পার হয়ে যাবে। তখন কেউ অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পাবে, আর কেউ জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

* রাসূল (সাঃ) এবং এই উম্মত সর্বপ্রথম এই পুল পার হবে। তারপর অন্যান্যরা পার হবে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فاكون انا واستى اول من يجيز . الحديث - (مسلم جـ١)

অর্থাৎ, তখন আমি এবং আমার উম্মত সর্বপ্রথম পার হবো।

(এগার) আ'রাফ সত্য ঃ

* আ'রাফ সত্য। আ'রাফ বলা হয় জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত প্রাচীরকে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الاية

অর্থাৎ, তাদের উভয়ের (জান্নাতী ও জাহান্নামীদের) মাঝে থাকবে আঁড়। এবং আ'রাফে কিছু লোক অবস্থান করবে, যারা সকলকে তাদের চিহ্ন দেখে চিনতে পারবে। (সূরাঃ ৭-আ'রাফঃ ৪৬)

* এটা কোন স্থায়ী জায়গা নয়। যাদের নেকী বদী সমান হবে তাদেরকে সাময়িক এখানে অবস্থান করানো হবে। অবশেষে আল্লাহ্‌র মঞ্জুরী হলে তাদের পাপ ক্ষমা করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون -

অর্থাৎ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা দুঃখিতও হবে না। (সূরাঃ ৭-আ'রাফঃ ৪৯)

(বার) জান্নাত বা বেহেশ্‌ত সত্য ঃ

* আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের জন্য আল্লাহ এমন সব নেয়ামত তৈরী করে রেখেছেন যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কারও অন্তরে তার পূর্ণ ধারণাও আসতে পারে না। এই সব মহা নেয়ামতের স্থান হল জান্নাত বা বেহেশ্‌ত। এর কিছুটা বিবরণ দিয়ে এক হাদীছে কুদছীতে বলা হয়েছে ঃ

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ قال : الله تعالى اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين - (متفق عليه)

অর্থাৎ, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, আর না কোন মানুষের হৃদয়ে তার কল্পনাও আসতে পারে। তোমরা

www.iscalibrary.com

(এর প্রমাণ স্বরূপ) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে পার (যাতে বলা হয়েছে ঃ) কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে।

এখানে اعددت (আমি প্রস্তুত রেখেছি) শব্দটি স্পষ্টতঃই দলীল যে, জান্নাতের নেয়ামতরাজি পূর্বাহ্নেই সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। মু'তাযিলাগণ বিচার দিবসের পূর্বে এর সৃষ্টিকে ফায়দাহীন মনে করে এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এর উত্তর হল পূর্বাহ্নেই সৃষ্টি হওয়া ফায়দাহীন-এটা ঠিক নয়। বর্তমানেও সেখানে হুর গেলমানদের অবস্থান রয়েছে। তদুপরি পূর্বাহ্নেই সৃষ্টি করার মধ্যে অন্য কোন হেকমতও নিহিত থাকতে পারে যা আমাদের বোধগম্য নয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون -

অর্থাৎ, তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, বরং তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরাঃ ২১ আম্বিয়াঃ ২৩)

* জান্নাত কোন কল্পিত বিষয় নয় বরং সৃষ্ট রূপে ও অস্তিত্বশীল হিসেবে তা বিদ্যমান আছে[১] এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে[২] মু'মিনগণও অনন্তকাল সেখানে থাকবেন। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত মত হল জান্নাত জাহান্নাম এখনই সৃষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। এমন নয় যে, পরবর্তীতে তা সৃষ্টি করা হবে। দলীল -

১. কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموت والارض اعدت للمتقين -

অর্থাৎ, তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়; যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ১৩৩)

২. পূর্বে বর্ণিত যে হাদীছে জান্নাতের নেয়ামতরাজি প্রস্তুত রাখার কথা বলা হয়েছে, তাও জান্নাত সৃষ্টরূপে বিদ্যমান থাকার দলীল।

* জান্নাতের অবস্থান এখন কোথায় এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে জান্নাত আকাশসসূহের উপর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الاية -

অর্থাৎ, আর সে তাকে (জিব্রাঈলকে) দেখেছিল সিদরাতুল মুন্‌তাহা-র কাছে; যার নিকট জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত। (সূরাঃ ৫৩ নাজ্‌মঃ ১৩-১৫)

নবী করীম (সাঃ) জান্নাতুল ফিরদাউসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

سقفها عرش الرحمن - (الاتحاف جـ/২)

অর্থাৎ, তার (জান্নাতের) ছাদ হল আল্লাহ্‌র আরশ।

১. এ ব্যাপারে ন্যাচারিয়া দলের মতবিরোধ রয়েছে। দেখুন "ন্যাচারিয়া দল" শিরোনাম ॥

২. এ ব্যাপারে ফিরাকায়ে জাহ্‌মিয়া-এর ভিন্ন মত রয়েছে। দেখুন ২৮৭ পৃঃ ॥

www.iscalibrary.com

* জান্নাতবাসীদের কখনও মৃত্যু হবে না। জান্নাতবাসীগণ যা পেতে ইচ্ছা করবেন, তাই পাবেন। তাদের জন্য হুর গেলমান ও খাদেম থাকবে।

(তের) জাহান্নাম বা দোযখ সত্য ঃ

* পাপীদেরকে আল্লাহ আগুন ও আগুনের মধ্যে অবস্থিত সাপ, বিচ্ছু, সৃঙ্খল প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্তির উপরকণ দ্বারা আযাব দেয়ার জন্য যে স্থান প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে বলা হয় জাহান্নাম বা দোযখ। দোযখ আল্লাহর সৃষ্ট রূপে বিদ্যমান রয়েছে।[১] এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে।[২] কাফেররা অনন্তকাল তাতে অবস্থান করবে।

* কবীরা গোনাহ কারীগণ তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলেও অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে না। এক সময় শাস্তি ভোগ করার মাধ্যমে পাপ মোচন হওয়ার পর কিংবা পাপ মোচন হওয়ার পূর্বেই নবীর সুপারিশ ক্রমে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩]

* জাহান্নামের সাতটি স্তর বা দরজা থাকবে। একেক স্তরের শাস্তির ধরন হবে একেক রকম। অপরাধ অনুসারে যে যে স্তরের উপযোগী হবে তাকে সে স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। স্তরগুলোর পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। যথাঃ

১. জাহান্নাম (جهنم) وجيئ يومئذ بجهنم

২. লাযা (لظى) كلا انها لظى

৩. হুতামা (حطمة) كلا لينبذن فى الحطمة

৪. সায়ীর (سعير) بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا

৫. সাকার (سقر) ساصليه سقر وما ادرك ما سقر لا تبقى ولا تذر

৬. জাহীম (جحيم) وبرز ت الجحيم للغاوين

৭. হাবিয়া (هاوية) فامه هاوية وما ادرك ما هيه نار حامية

* জাহান্নামের অবস্থান এখন কোথায় এ ব্যাপারে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত হল জাহান্নাম যমীনের নীচে অবস্থিত। তবে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষ্য (نص صريح) পাওয়া যায়না বিধায় এর জ্ঞান আল্লাহ্‌র উপরই ন্যাস্ত করা শ্রেয়। (الاتحاف جـ ٢/)

মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) লিখেছেনঃ এ সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছেঃ যমীনের সপ্তম স্তরের নীচে জাহান্নাম রয়েছে। কিভাবে রয়েছে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। ইউরোপ থেকে একবার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, মাটি খুড়ে সরাসরি প্রাচ্যের সাথে একটা সংক্ষিপ্ত রাস্তা করা যায় কি-না। তারা চেষ্টা করে দেখল যমীন খুড়ে চার মাইল পর্যন্ত নীচে যাওয়া যায়, তার নীচে আর যাওয়া যায় না। তার নীচে আর তারা খুড়তে পারে না। তার নীচে এমন শক্ত পাথরের স্তর আসে, যা পৃথিবীর কোন শক্তিশালী মেশিন দিয়েও কাটা সম্ভব

১. এ ব্যাপারে ন্যাচারিয়া দলের মতবিরোধ রয়েছে। দেখুন "ন্যাচারিয়া দল" শিরোনাম, পৃঃ ৪৫০ ॥

২. এ ব্যাপারে জাহ্‌মিয়া ফিরকা- এর ভিন্ন মত রয়েছে। দেখুন ২৮৭ পৃ ঃ ॥

৩. شرح العقائد النسفيه ॥

www.iscalibrary.com

নয়। কয়েক জায়গায় এরকম খোড়ার চেষ্টা করে একই অবস্থা দেখা গেল। তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে- এর ভিতরে মারাত্মক ধরনের কোন দাহ্য পদার্থ রয়েছে, যা একটা কঠিন পাথরের আবরণ দিয়ে ঘেরা। হতে পারে এখানেই আল্লাহ পাক জাহান্নামকে রেখেছেন। কিংবা যদি এটা নাও হয়, তবুও যেভাবেই হোক জাহান্নামকে দুনিয়ার সপ্তম স্তরের নীচে রাখা হয়েছে।[১]

মে'রাজের ঘটনায় রাসূল (সাঃ) জাহান্নাম ও কবরের শাস্তিগুলো দেখেছিলেন আসমানে উঠার পূর্বে। কারণ কবর এবং জাহান্নামের শাস্তিগুলো হবে আসমানের নীচে। সপ্তম আসমানের নীচ পর্যন্ত সমগ্র এলাকা জাহান্নামে পরিণত হবে। এখনও জাহান্নাম আসমানের নীচে দুনিয়াতেই রয়েছে। দুনিয়ার কোন এক জায়গায় ক্ষুদ্র আকারে সংকুচিত অবস্থায় জাহান্নামকে রাখা হয়েছে। কিয়ামতের দিন এটাকে বিস্তৃত করে সপ্তম আসমানের নীচ পর্যন্ত পুরো স্থানকে জাহান্নামে পরিণত করে দেয়া হবে।

তবে জাহান্নাম এখন কোথায় আছে - এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন দলীল (نص صريح) পাওয়া যায়না বিধায় এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু না বলাই শ্রেয়।

৬. তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান

ষষ্ঠ মৌলিক যে বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়, তা হল তাকদীরের বিষয়ে ঈমান। "তাকদীর" (تقدير) শব্দটি قدر থেকে গঠিত। এর শাব্দিক অর্থ হল- পরিকল্পনা, নকশা, পরিমাণ, নির্ধারণ করা, ব্যবস্থাপনা করা ইত্যাদি। পরিভাষায় তাকদীরের সংজ্ঞা হল ঃ

هو تحديد كل مخلوق بحده الذى يوجد من حسن وقبح ونفع وضرر وما يحويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من ثواب وعقاب - (قواعد الفقه)

অর্থাৎ, সমুদয় সৃষ্টির ভাল-মন্দ, উপকার-ক্ষতি ইত্যাদি যাবতীয় সবকিছুর স্থান-কাল এবং এ সবের শুভ-অশুভের পরিমাণ ও পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত করা।

আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টি জগতের একটা নকশাও লিখে রেখেছেন, সবকিছুর পরিকল্পনাও লিখে রেখেছেন, এই নকশা ও পরিকল্পনাকেই বলা হয় তাকদীর। এই পরিকল্পনা এবং নকশা অনুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয় এবং হবে। অতএব ভাল মন্দ সবকিছুই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে পূবাহ্নেই নির্ধারিত এবং সেই নির্ধারণ বা তাকদীর অনুযায়ী সবকিছু সংঘটিত হয়- এই বিশ্বাস রাখতে হবে।[২] ভাল এবং মন্দ, ঈমান ও কুফ্‌র, হেদায়েত ও গোমরাহী, ফরমাবরদারী ও নাফরমানী সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ - এই বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

قل الله خالق كل شئ وهو الواحد القهار -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি একক, মহাপরাক্রমশালী। (সূরাঃ ১৩-রা'দঃ ১৬)

১. معارف القرآن ॥

২. কাদরিয়া ফিরকা তাকদীরকে অস্বীকার করে। তাদের সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন "কাদরিয়া" শিরোনাম ॥

www.iscalibrary.com

এর বিপরীত কেউ যদি ভাল বা 'সু'-র জন্য একজন সৃষ্টিকর্তা আর মন্দ বা "কু"-র জন্য অন্য একজন সৃষ্টিকর্তা মানে তাহলে সেটা ঈমানের পরিপন্থী কুফ্‌র ও শির্‌ক হয়ে যাবে। যেমন অগ্নিপূজারীগণ কল্যাণ ও 'সু'-র সৃষ্টিকর্তা "আহ্‌রমান" কে মানে। হিন্দুগণ 'সু'-র সৃষ্টিকর্তা লক্ষ্মীদেবী এবং 'কু'-র সৃষ্টিকর্তা শনি দেবতাকে মানে। এটা কুফ্‌র ও শির্‌ক।

এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, সবই যখন আল্লাহর পরিকল্পনা অনুসারে হয়, তখন আমলের প্রয়োজন কি, যা হওয়ার তা তো হবেই ? এ প্রশ্ন করা যাবে না এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা কর্ম জগতের নক্‌শায় লিখে রেখেছেন, যদি মানুষ ইচ্ছা করে তাহলে এরূপ হবে আর যদি ইচ্ছা না করে তাহলে এরূপ হবে। এমনি ভাবে আল্লাহ তা'আলা মন্দ-এর সৃষ্টিকর্তা হলেও তিনি দায়ী নন বরং মানুষ মন্দ করার জন্য দায়ী। এ কারণে যে, তাকে আল্লাহ ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, সে নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছা শক্তি মন্দের জন্য ব্যয় করল কেন ? এরপরও তাকদীর সম্পর্কে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে এবং মনে তাকদীর ও ভাগ্য সম্পর্কে নানান প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, এরূপ প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, কেননা তাকদীরের বিষয়টি এমন এক জটিল রহস্যময়, যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা মানব মেধার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা উদঘাটনের চেষ্টা করাও নিষিদ্ধ। আমাদের কর্তব্য তাকদীরে বিশ্বাস করা, আর আল্লাহ পাক আমলের দায়িত্ব দিয়েছেন তাই আমল করে যাওয়া।

তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান রাখার অর্থ হল নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে বিশ্বাস রাখা ঃ

১. সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা সবকিছু লিখে রেখেছেন। তিনি পূর্বাহ্নেই সবকিছুর নকশা করে রেখেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ما اصاب من مصيبة فى الارض ولا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير -

অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের উপর যে মুসীবত আসে তা সংঘটিত করার পূর্বেই কিতাবে (লওহে মাহ্‌ফূযে) লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্‌র পক্ষে তা খুবই সহজ। (সূরাঃ ৫৭-হাদীদঃ ২২)

২. সবকিছু ঘটার পূবেই আল্লাহ তা'আলার অনাদি-জ্ঞান সে সম্বন্ধে অবহিত এবং তাঁর জানা ও ইচ্ছা অনুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয়। তবে কোন পাপ করে তার দায় থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাকদীরের দোহাই দেয়া জায়েয নয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين -

অর্থাৎ, তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না; মাটির অন্ধকারে কোন শস্যকণা কিংবা কোন রসযুক্ত বা শুস্ক কোন কিছু সব সম্পর্কেই তিনি অবগত, সবই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহ্‌ফূযে) রয়েছে। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ৫৯)

www.iscalibrary.com

৩. তিনি ভাল ও মন্দ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তবে মন্দ সৃষ্টির জন্য তিনি দোষী নন বরং যে মাখলূক মন্দ উপার্জন করবে সে দোষী, কেননা মন্দ সৃষ্টি (خلق شر) মন্দ নয় বরং মন্দ উপার্জন (كسب شر) হল মন্দ। মন্দ সৃষ্টি এজন্য মন্দ নয় যে, তার মধ্যেও বহু রহস্য এবং বহু পরোক্ষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই ভাল কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং মন্দ কাজে তিনি অসন্তুষ্ট।

৪. আল্লাহ তা'আলা কলম দ্বারা লওহে মাহ্ফূযে (সংরক্ষিত ফলকে) তাকদীরের সবকিছু লিখে রেখেছেন। তাই লওহ, কলম ও লওহে যা কিছু লিখে রাখা হয়েছে সব কিছুতে বিশ্বাস রাখা তাকদীরে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

৫. মানুষ একদিকে নিজেকে অক্ষম ভেবে নিজেকে দায়িত্বহীন মনে করবে না এই বলে যে, আমার কিছুই করার নেই, তাকদীরে যা আছে তা-ই তো হবে! আবার তাকদীরকে এড়িয়ে মানুষ খোদার সৃষ্টির বাইরেও কিছু করে ফেলতে সক্ষম- এমনও মনে করবে না। মোটকথা তাকদীরের সাথে তাদবীর বা চেষ্টা-চরিত্রের কোন বিরোধ নেই।

يابنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنى عنكم من الله من شئ ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون -

অর্থাৎ, সে (ইয়া'কূব [আঃ]) বলল, 'হে আমার পুত্র! তোমরা এক দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবে না. ভিন্ন ভিন্ন দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহ্রই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি। এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা তাঁরই উপর নির্ভর করুক।' (সূরাঃ ১২-ইউসুফঃ ৬৭)

৬. মানুষের প্রতি আল্লাহর যত হুকুম ও আদেশ নিষেধ রয়েছে, তার কোনটি মানুষের সাধ্যের বাইরে নয়। কোন অসাধ্য বিষয়ে আল্লাহ কোন হুকুম ও বিধান দেননি।

قال الله تعالى : لا يكلف الله نفسا الا وسعها -

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে বিধান দেন না। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ২৮৬)

৭. আল্লাহ তা'আলার উপর কোন কিছু ওয়াজিব নয়,[১]

তিনি কাউকে কিছু দিতে বাধ্য নন, তাঁর উপর কারও কোন হুকুম চলেনা, যা কিছু তিনি দান করেন সব তাঁর রহমত ও মেহেরবানী মাত্র। ইরশাদ হয়েছে ঃ

لا يسأل عما يفعل وهم يسألون -

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, বরং তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরাঃ ২১-আম্বিয়াঃ ২৩)

৮. কোন অপরাধের দায় থেকে বাঁচার জন্য তাক্দীরকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো জায়েয নয়।

১. এ ব্যাপারে মু'তাযিলাদের ভিন্ন মত রয়েছে, দেখুন "মু'তাযিলা" শিরোনাম ॥

www.iscalibrary.com

৯. তাক্‌দীর সম্পর্কে বিতর্ক করা নিষেধ। রাসূল (সাঃ) তাক্‌দীর সম্পর্কে বিতর্ক করতে দেখলে প্রচন্ড রাগান্বিত হতেন। তাছাড়া হাদীছে আরও এসেছে তাক্‌দীর সম্বন্ধে বিতর্ক করলে কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।

من تكلم فى شئ من القدر سئل عنه يوم القيمة - (ابن ماجة)

অর্থাৎ, তাক্‌দীর সম্পর্কে কেউ বিতর্ক করলে কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে তাকে জবাবদিহী করতে হবে।

১০. তাক্‌দীর সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা হল এটা আল্লাহ্ তা'আলার এমন এক জটিল রহস্যময় বিষয় যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা মানব মেধার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা উদঘাটনের চেষ্টা করাও নিষিদ্ধ। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ

طريق مظلم فلا تسلكه بحر عميق فلا تلجه وسر الله قد خفى عليك فلا تفتشه - (مرقاة جـ/١)

অর্থাৎ, তাক্‌দীর হল এক আধাঁরাচ্ছন্ন পথ তাতে চল না, একটা গভীর সমুদ্র তাতে ডুব দিও না, সেটা হল আল্লাহ্‌র এক রহস্য যা তোমার কাছে প্রচ্ছন্ন, তুমি তা উদঘাটনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ো না।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত ফয়সালা হল কাযা (قضاء) ও কদর (قدر) সত্য। অণু পরিমাণ কোন কিছু এর আওতা বহির্ভূত নয়। কেউ এর অণু পরিমাণ কোন কিছুর ব্যতিক্রম ঘটাতে সক্ষম নয়। এই قضاء ও قدر এ ঈমান-বিশ্বাস রাখা ফরয। এ বিশ্বাস ব্যতীত ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

عن علىؓ قال قال رسول الله ﷺ : لا يؤمن عبد حتى يؤمن باربع يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله بعثنى بالحق و يؤمن بالموت والبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر - (مشكوة عن الترمذى وابن ماجة)

অর্থাৎ, চারটা বিষয়ে ঈমান আনা ব্যতীত কেউ মু'মিন হবে না। এ কথার সাক্ষ্য ব্যতীত যে, আল্লাহ এক ও আমি তাঁর রাসূল; তিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান সম্বন্ধে ঈমান ব্যতীত এবং তাক্‌দীর সম্বন্ধে ঈমান ব্যতীত।

কাযা (قضاء) ও কদর (قدر) -এর মাঝে পার্থক্য হল - কাযা শব্দের আভিধানিক অর্থ ফায়সালা করা, হুকুম দেয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় কাযা (قضاء) বলা হয় ঃ

الارادة الازلية المتعلقة بالموجودات الكائنة فيما لا يزال - (النبراس)

অর্থাৎ, অনাদিতে সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার যে ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ছিল তাকেই কাযা বলে। আর কদ্‌র হল ঐ সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার বিস্তারিত ও বাস্তব রূপ।

যেমন প্রথমে একটি ইমারত নির্মাণের পরিকল্পনা করা হল। নির্মাণের পূর্বে মনে মনে তার একটি চিত্র কল্পনা করা হল। তারপর সেই কল্পিত চিত্র অনুসারে বাস্তবে ইমারত তৈরি করা হল। এখানে প্রথমটি হল কাযা আর দ্বিতীয়টি হল কদ্‌র। হযরত কাছেম নানুতবী (রহঃ)-এর মতে সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার নাম কদ্‌র আর বিস্তারিত রূপের নাম কাযা।

www.iscalibrary.com

মুসলমানদের আরও কতিপয় আকীদা

মে'রাজ সম্বন্ধে আকীদা ঃ

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে আল্লাহ তা'আলা একদা রাত্রে জাগরিত অবস্থায় স্বশরীরে মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখান থেকে সাত আসমানের উপর এবং সেখান থেকেও আরও উপরে যতদূর আল্লাহর ইচ্ছা নিয়ে যান। সেখানে আল্লাহ্‌র সাথে রাসূল (সাঃ)-এর কথাবার্তা হয়। তখনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান দেয়া হয় এবং সেই রাতেই রাসূল (সাঃ) আবার দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। একে মে'রাজ বলে। মে'রাজ হক ও সত্য। কুরআন হাদীছ দ্বারা এটা প্রমাণিত। এ বিষয়ে উম্মতের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে।

মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গমনকে ইসরা (اسراء) বলা হয়। এটা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لنريه من ايتنا ـ

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহিমাময় ঐ সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায়; যার পরিবেশ আমি করেছি বরকতময়, তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ১)

মুসলিম শরীফের হাদীছে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن انس ؓ ان رسول الله ﷺ قال: اتيت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يقع حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى اتيت بيت المقدس . الحديث ـ

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত- রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ আমার কাছে আনা হল বোরাক। সেটি ছিল একটি প্রাণী সাদা, গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট। সেটি তার দৃষ্টির শেষ সীমানায় এক একটা পদক্ষেপ চালায়। তখন আমি তাতে আরোহন করলাম। এমনকি বায়তুল মুকাদ্দাস এলাম।

ইস্‌রা (اسراء) শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে রাত্রে চালানো বা রাতে নিয়ে যাওয়া। আর পরিভাষায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমনকে اسراء বলা হয়।

বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সপ্তম আসমানের উপর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমনকে মে'রাজ বলা হয়। হাদীছ (خبر واحد) দ্বারা এটা প্রমাণিত। মে'রাজ (معراج) শব্দের আভিধানিক অর্থ উর্ধ্বে আরোহন করা। মে'রাজ (معراج) শব্দটি عروج ধাতু থেকে উদগত। এর অর্থ উর্ধ্বে আরোহন করা। পরিভাষায় মসজিদে আকসা থেকে উর্ধ্ব জগতে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত রাসূল (সাঃ)-এর ভ্রমনকে মে'রাজ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন মে'রাজ শব্দের অর্থ সিড়ি। যেহেতু রাসূল (সাঃ)কে একটা চলন্ত সিড়িতে করে উর্ধ্বলোকে আরোহন করানো

www.iscalibrary.com

হয়েছিল, তাই এই ভ্রমনকে মে'রাজ বলে অভিহিত করা হয়। কখনো কখনো উভয় ভ্রমনকে ইস্‌রা ও মে'রাজ বলা হয়।

সাহাবা, তাবিয়ীন ও আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের গবেষক উলামায়ে কেরামের মতে মে'রাজ হয়েছিল রাসূল (সাঃ)-এর জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে। মে'রাজ সম্পর্কিত উপরোল্লেখিত আয়াত-এর بعبده শব্দটিও (যার অর্থ তাঁর বান্দাকে) শারীরিক মে'রাজকেই প্রমাণিত করে। তদুপরি কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (সাঃ)কে মে'রাজে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে আল্লাহ্‌র কুদরত প্রত্যক্ষ করানো। আর এটা স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় দেখানোকেই বোঝায়।

কারও কারও[১] ধারণা-এটা স্বপ্নের মাধ্যমে ঘটিত বিষয়। তাদের ধারণার ভিত্তি হল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وما جعلنا الرويا التى ارينک الا فتنة للنا س . الاية ـ

অর্থাৎ, আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের জন্য পরীক্ষা বানিয়েছি। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ৬০)

তারা বলতে চান এ আয়াতে الرويا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হল স্বপ্ন। কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা এ আয়াতে উল্লেখিত الرويا শব্দটি বদর যুদ্ধের সময়ের স্বপ্ন অথবা হুদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে দেখা স্বপ্ন কিংবা মক্কায় উমরা পালনের ব্যাপারে দেখা স্বপ্নের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। একান্তই এ আয়াতকে মে'রাজের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বললে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)এর ভাষ্যমতে এখানে الرويا শব্দটি رويت তথা দেখার অর্থে ব্যবহৃত হবে।

কেউ কেউ মে'রাজের ঘটনাকে আধ্যাত্মিক (روحانى) ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন। এ ধারণা ঠিক নয় এ কারণে যে, সেরূপ হলে এ ঘটনা শুনে মক্কার মুশরিকদের এত বিস্ময় বোধ করা এবং এটাকে নিয়ে তাদের এত হৈ চৈ করার কোন অবকাশ থাকত না। কেননা আধ্যাত্মিক উপায়ে এর চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাও একজন সাধারণ মানুষ থেকেও ঘটতে পারে।[২]

প্রাচীন দার্শনিকগণ মে'রাজকে অসম্ভব মনে করত। কেননা আসমান বিদীর্ণ হওয়া বা তাতে ছিদ্র করা আবার তাতে জোড়া লাগানো অসম্ভব। কিন্তু খোদার অস্তিত্বকে মেনে নিলে এ সব প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে না। খোদার পক্ষেতো সবই সম্ভব। তদুপরি আসমানের দরজা আছে বলে মেনে নিলে বিদীর্ণ হওয়া বা ছিদ্র করার প্রশ্নও উত্থাপিত হয়না। মে'রাজের বর্ণনা সম্বলিত হাদীছে প্রত্যেক আসমানে গিয়ে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরিচয় প্রদান এবং তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে মর্মে অবগতি প্রদানের পর খুলে দেওয়ার কথা (ففتح لنا) বর্ণিত আছে, যা আসমানের দরজা থাকার দিকে ইংগিত বহন করে।

১. হযরত মু'আবিয়া ও আয়েশা (রাঃ)-এর দিকে এ মতটির সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়॥

২. نشر الطيب، معارف القرآن ادريس كاندهلوى ও ইসলামী আকীদা থেকে গৃহীত॥

www.iscalibrary.com

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকেও মে'রাজ অসম্ভব মনে হতে পারে। কারণ ঃ

১. বিজ্ঞানে এখনও আসমানের অস্তিত্ব আছে বলে প্রমাণিত হয়নি।

২. এ পৃথিবীর উপরে যে বায়ুর স্তর আছে তার উচ্চতা মাত্র ৫২ মাইল। এর উপরে কোন বায়ুর স্তর নেই। অতএব সেখানে কোন প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

৩. প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে বায়ুর স্তরের উর্ধ্বে শ্বৈত্যমণ্ডল অবস্থিত। প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মতে আরও রয়েছে অগ্নিমণ্ডল। মে'রাজে যেতে হলে উল্লেখিত দুটি স্তর অতিক্রম করে যেতে হবে। অথচ এ স্তরে জড়দেহ বিশিষ্ট কোন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

৪. মধ্যাকর্ষণের যুক্তি দিয়েও কেউ কেউ মে'রাজে স্বশরীরে গমনকে অসম্ভব বলেছিল।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল ঃ আকাশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি বলেই তার অস্তিত্ব নেই বলা অবৈজ্ঞানিক। কোন কিছু দৃষ্টির অধিগম্য না হওয়ায় সেটার অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে মহা বিশ্বের অনেক কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হবে। এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা দেখতে পাই না।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর হল ঃ এখন উর্দ্ধ জগতে বিজ্ঞানীদেন গমন এসব প্রশ্নকে অবান্তর প্রমাণিত করেছে। এরপরও স্বশরীরে মে'রাজে গমনকে অস্বীকার করা হলে তা সত্য বিদ্বেষ বলেই প্রমাণিত হবে।[১]

আল্লাহ্‌র দীদার সম্বন্ধে আকীদা

দুই ধরনের দীদার প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে ঃ

১. মে'রাজে নবী (সাঃ)-এর দীদার ঃ

মে'রাজে রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করেছিলেন কিনা এ ব্যাপারে চারটি মত পাওয়া যায়।

১. দীদার হয়নি। এটা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মত। হযরত ইব্‌নে মাসউদ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ মতও এটাই। হযরত মাছরুক থেকে বর্ণিত ঃ

قال لعائشةؓ هل رأى محمد ربه ؟ قالت لقد قف شعرى مما قلت ، من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب- قال فاين قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى . الايات؟ قالت ذلك جبريل كان يأتيه فى صورة الرجل واتاه هذه المرة فى صورته التى هى صورته فسد الافق (رواه البخارى ومسلم)

অর্থাৎ, তিনি হযরত আয়শা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন- মুহাম্মাদ (সাঃ) কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন ? আয়শা (রাঃ) জওয়াবে বললেনঃ তোমার কথায় আমার লোম খাড়া হয়ে গিয়েছে। যে তোমাকে বলেছে, মুহাম্মাদ তাঁর রবের দর্শন লাভ করেছেন সে মিথ্যা বলেছে।। (বুখারী ও মুসলিম)

১. উপরোক্ত ৪টি প্রশ্নের বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক উত্তরের জন্য কবি গোলাম মোস্তফা রচিত বিশ্বনবী-র দ্বিতীয় খণ্ড দেখা যেতে পারে ॥

www.iscalibrary.com

২. আল্লাহর দীদার হয়েছে কল্‌ব দ্বারা। এটা হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি মত। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ

عن ابن عباسؓ يقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفواده - (رواه الطبرانى فى الاوسط ورجاله رجال الصحيح خلا جهور بن منصور الكوفى ، ذكره ابن حبان فى الثقات كذا فى مجمع الزوائد)

অর্থাৎ, রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন আমি তাকে দেখেছি আমার অন্তর দ্বারা । (ইব্‌ন জারীর)

৩. তিনি আল্লাহ্‌কে দেখেছেন স্বচক্ষে। এটা হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ মত। শায়খ আবুল হাসান আশআরীর মতও এই। আল্লামা নববী মুসলিম শরীফের শরাহ্‌-র মধ্যে বলেনঃ এটাই অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

৪. আল্লাহর দীদার হলেছিল কি-না এ ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা। এটা সাঈদ ইব্‌নে জুবায়ের (রহঃ)-এর মত। আল্লামা তাফতাযানী শরহে আকাইদ গ্রন্থে এ মতকেই চয়ন করেছেন। তার কারণ এই (১) হাদীছ দ্বারা এটা সমর্থিত, (২) হাদীছের কোন স্পষ্ট ভাষ্য চাক্ষুষ দেখার ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি সম্ভবত তার এজতেহাদ। আর যাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ -

رايت ربى مشا فهة لا شك فيه -

অর্থাৎ, আমি আমার রবকে সামনা সামনি দেখেছি এতে কোন সন্দেহ নেই। এ হাদীছের ছুবূতের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। গাউছুল আযম আব্দুল কাদের জিলানীর নামে প্রচলিত গুনিয়াতুত তালিবীন গ্রন্থের বর্ণনা দ্বারা ধোকায় পতিত হওয়া ঠিক নয়। এটি মূলতঃ গাউছুল আযমের লিখিত গ্রন্থ নয়। তাঁর প্রতি এর সম্বন্ধকরণ সহীহ নয়। এর মধ্যে প্রচুর মওযূ' (জাল) হাদীছ রয়েছে।[১]

২. পরকালে আল্লাহ্‌র দীদার ঃ

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট জান্নাতে আল্লাহ্‌র দীদার লাভ হবে। প্রত্যেকে তার আমল অনুযায়ী আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করবে। কেউ সর্বদা আল্লাহ্‌র জামাল ও সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করণে ডুবে থাকবে। আবার কেউ জীবনে একবার দীদার লাভ করবে। সহীহ মত অনুযায়ী নারীগণও দীদার লাভ করবে।[২] জান্নাতে আল্লাহ্‌র দীদার লাভ হওয়ার দলীল -

(১) কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة -

অর্থাৎ, সেদিন বহু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। (সূরাঃ ৭৫-কিয়ামাঃ ২২-২৩)

১. ماخوذ من النبراس وغيره - ২. ॥ عقائدالاسلام. عبدالحق حقانى ॥

www.iscalibrary.com

(২) বোখারী ও মুসলিমের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে- রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ

انكم سترون ربكم عيانا - (رواه الشيخان)

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে প্রকাশ্যভাবে।

মু'তাযিলাগণ আল্লাহ্র দীদার সম্ভব নয় বলে মত পোষণ করেন। তাদের আক্লী (যুক্তিগত) দলীল হল কোন কিছু দেখার জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি শর্ত রয়েছে ঃ

১. যা দেখা হবে তা কোন নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে হবে।

২. সেটা নির্দিষ্ট কোন দিকে থাকতে হবে।

৩. সেটা যে দেখবে তার সামনে থাকতে হবে।

৪. দ্রষ্টা ও দৃশ্য বস্তুর মধ্যে খুব বেশী দূরত্ব বা খুব বেশী নৈকট্য কোনটাই থাকতে পারবে না।

৫. দৃশ্য বস্তু পর্যন্ত দৃষ্টির জ্যোতি পৌঁছুতে হবে।

এ সমস্ত শর্ত আল্লাহ্কে দর্শনের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত বিধায় আল্লাহ্কে দেখা সম্ভব নয়। এর জওয়াব হলঃ দর্শনের এ সব শর্ত দৈহিক দর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ দৈহিক বিশেষণ থেকে পবিত্র। অতএব তাঁকে দর্শনের ক্ষেত্রে এসব শর্ত কার্যকরী নাও থাকতে পারে। তদুপরি জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এমন দৃষ্টিশক্তি দান করবেন যা এসব শর্ত ছাড়াও দেখতে সক্ষম হবে।

মু'তাযিলাদের প্রথম নক্লী (বর্ণনাজাত) দলীল হল ঃ

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير -

অর্থাৎ, তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন কিন্তু দৃষ্টি তাঁর অধিগম্য। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ১০৩)

এর জওয়াব হল- এখানে সব দৃষ্টির কথা বলা হয়নি, কিছু দৃষ্টি এর থেকে ব্যতিক্রম রয়েছে। কিংবা বলা হবে এখানে সব স্থান ও সব সময়ের কথা বলা হয়নি। কিংবা বলা হবে এখানে এদরাক (ادراک) অর্থাৎ, বেষ্টন করা বা সম্যক ভাবে দেখা না যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, মোটেই দেখা যায় না তা বলা হয়নি।

মু'তাযিলাদের দ্বিতীয় নক্লী দলীল হল ঃ

قال رب ارنى انظر اليک قال لن ترانى -

অর্থাৎ, সে (মূসা) বলল হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও,আমি তোমাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি কোনক্রমেই আমাকে দেখতে পাবে না। (সূরাঃ ৭-আ'রাফঃ ১৪৩)

এর জওয়াব হল মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় হটকারিতা পূর্বক আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে চেয়েছিল, তাই তাদেরকে দর্শন দেয়া হয়নি। তদুপরি মূসা (আঃ)-এর আবেদনই একথা বোঝায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন সম্ভব; নতুবা আল্লাহ্র নবী অসম্ভব জিনিসের আবেদন করতেন না বরং শুরু থেকেই বলে দিতেন যে, আল্লাহ্র দীদার সম্ভব নয়।

আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা

'আরশ' অর্থ চেয়ার বা আসন। আল্লাহ যেমন, তাঁর আরশ এবং কুরছীও তেমনই শানের হয়ে থাকবে। সপ্তম আসমানের উপর আরশ ও কুরছী অবস্থিত। হাদীছের বর্ণনা

www.iscalibrary.com

অনুযায়ী আরশ কুরছী এত বিশাল যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ পাক কোন মাখলূকের ন্যায় উঠা-বসা করেন না এবং তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নন। মাখলূকের কোন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে আল্লাহর কোন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের তুলনা বা সাদৃশ্য হয় না। তারপরও তাঁর আরশ কুরছী থাকার কি অর্থ, তা অনুধাবন করা মানব জ্ঞানের উর্ধ্বে। আমাদেরকে শুধু আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা বিশ্বাস রাখতে হবে।

সাহাবীদের সম্বন্ধে আকীদা

* সাহাবী বলা হয় ঃ

من لقى النبى ﷺ مسلما ومات على اسلامه - (تدريب الروای جـ٢/)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় নবী (সাঃ)-এর সাক্ষাত পেয়েছে এবং মুসলমান অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

* সমস্ত নবী রাসূলের পর উম্মতের মধ্যে খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের মর্যাদা অধিক।

* সকল সাহাবী আদিল অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, মুত্তাকী, পরহেযগার, ন্যায়পরায়ণ এবং ইসলাম ও উম্মতের স্বার্থকে উর্ধ্বে স্থান দানকারী। প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যে হেদায়েতের নূর এবং আলো রয়েছে- কারও মধ্যে অন্ধকার নেই।

* সাহাবীদের প্রতি মহব্বত ও ভক্তি শ্রদ্ধা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম শি'আর বা প্রতীক। সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসা নবী (সাঃ)কেই ভালবাসা। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

قال عليه الصلوة والسلام : الله الله فى اصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم . الحديث - (ترمذى)

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর! আমার পরে তোমরা তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। বস্তুতঃ যে তাঁদেরকে ভালবাসল, সে আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসল, আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখার কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল।

শায়েখ শিবলী বলেন ঃ

ما امن برسول من لم يوقر اصحابه - (عقائد الاسلام)

অর্থাৎ, যে রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীগণকে তা'জীম ও সম্মান করল না, সে প্রকৃতপক্ষে রাসুলের প্রতি ঈমান আনেনি।

* যেসব ক্ষেত্রে সাহাবীদের মধ্যে দ্বিমত বা বাহ্যিক বিরোধ দেখা দিয়েছে, সে সব ক্ষেত্রেও প্রত্যেক সাহাবী হক ছিলেন। তাঁদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সংঘর্ষের ক্ষেত্রে

www.iscalibrary.com

মানুষ হিসেবে কোন পক্ষের এজতেহাদী ভুল চুক থাকতে পারে, তবে তাঁরা সেটা ব্যক্তিগত হিংসা-বিদ্বেষ বা ব্যক্তি স্বার্থে করেননি বরং দ্বীনের খাতিরে এবং এখলাছের সাথেই করেছেন-এই আকীদা বিশ্বাস রাখতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রেও যে কোন একজন বা এক পক্ষের অনুসরণ করলে হেদায়েত, মুক্তি ও নাজাত পাওয়া যাবে। কিন্তু একজনের অনুসরণ করে অন্যজনের দোষ চর্চা করা যাবে না। দোষ চর্চা করা হারাম হবে।

* সাহাবীদের মর্যাদা সমস্ত ওলী আউলিয়াদের উর্ধ্বে। উম্মতের সবচেয়ে বড় ওলী (যিনি সাহাবী নন) তার মর্যাদাও একজন নিম্ন স্তরের সাহাবীর সমান হতে পারে না বরং সাহাবী আর সাহাবী নন-এমন দুই স্তরের মধ্যে মর্যাদার তুলনাই অবান্তর।

* সমস্ত সাহাবাদের মধ্যে চারজন সর্বোত্তম এবং তাদের মর্যাদা উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম (১) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং তিনি প্রথম খলীফা। তারপর (২) হযরত ওমর (রাঃ) এবং তিনি দ্বিতীয় খলীফা। তারপর (৩) হযরত উসমান গনী (রাঃ) এবং তিনি তৃতীয় খলীফা। তারপর (৪) হযরত আলী (রাঃ), তিনি চতুর্থ খলীফা।

* খলীফা হওয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত তারতীব হক ও যথার্থ।

* সকল সাহাবীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা চির সন্তুষ্টির খোশ-খবরী দান করেছেন। বিশেষভাবে একসাথে নবী (সাঃ)-এর দ্বারা দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ পূর্বক তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। উক্ত দশজনকে আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ্ (সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন) বলা হয়। তাঁরা হলেন (১) আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) (২) ওমর (রাঃ) (৩) উসমান (রাঃ) (৪) আলী (রাঃ) (৫) তাল্‌হা (রাঃ) (৬) যোবায়ের (রাঃ) (৭) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) (৮) সা'আদ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) (৯) সাঈদ ইব্‌নে যায়েদ (রাঃ) এবং (১০) আবূ উবায়দা ইব্‌নে জাররাহ (রাঃ)। এই দশ জনের মর্যাদা উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এর মধ্যে চার খলীফা ব্যতীত অপর ছয় জনের মর্যাদা চার খলীফার পর।

এছাড়াও রাসূল (সাঃ) আরও কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময় জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

* আশারায়ে মুবাশশারার পর বদরী সাহাবীদের মর্যাদা অধিক। যাদের সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

لعل الله اطلع على اهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم - (مسلم جـ٢/)

অর্থাৎ, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা বদরী সাহাবীদের ব্যাপারে অবগত আছেন, তাই তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

* বদরী সাহাবীদের পর ওহুদ যুদ্ধে শরীক হওয়া সাহাবীদের মর্যাদা। তারপর বাই'আতুর রিদওয়ানে শরীক হওয়া সাহাবীগণের মর্যাদা, যাদের সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

www.iscalibrary.com

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونک تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم الاية-
অর্থাৎ, মু'মিনরা যখন বৃক্ষ তলে তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের অন্তরস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন। (সূরাঃ ৪৮-ফাত্হঃ ১৮)

মর্যাদার ক্ষেত্রে উল্লেখিত সাহাবীগণের মধ্যকার উপরোক্ত তারতীব বা বিন্যাস উম্মতের সর্বসম্মত বিষয়।[১] অতপর সকল সাহাবীর মর্যাদা তাঁদের ইল্ম ও তাক্ওয়ার তারতম্য অনুসারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ان اكرمكم عند الله اتقاكم -
অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যে অধিক তাক্ওয়ার অধিকারী, সে আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানী। (সূরাঃ ৪৯-হুজুরাতঃ ১৩)

* প্রত্যেক সাহাবী সত্যের মাপকাঠি। ঈমান ও আমল সবক্ষেত্রে তাঁরা মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ঈমানের কষ্টিপাথর, যার নিরিখে অবশিষ্ট সকলের ঈমান পরীক্ষা করা হবে। আমল এবং দ্বীনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁরা মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরাম হকের মাপকাঠি, তাঁদের নিরিখে নির্ণিত হবে পরবর্তীদের হক বা বাতিল হওয়া।
ঈমানের ক্ষেত্রে তাঁদের মাপকাঠি হওয়ার দলীল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

امنوا كما امن الناس -
অর্থাৎ, তোমরা ঈমান আনয়ন কর এই লোকেরা (সাহাবীরা) যেমন ঈমান এনেছে। (সূরা ঃ ২-বাকারা ঃ ১৩) অন্য আর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فان امنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا -
অর্থাৎ, তাঁরা (সাহাবীগণ) যেমন ঈমান এনেছে, তারা যদি তদ্রূপ ঈমান আনে, তাহলে নিশ্চিত তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হল। (সূরা ঃ ২-বাকারা ঃ ১৩৭)
আমলের ক্ষেত্রে তাঁদের মাপকাঠি হওয়ার দলীল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

ومن يشاقق الرسول من بعد تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم -
অর্থাৎ, কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ পাওয়ার পর সে যদি এই রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং এই মু'মিনদের (সাহাবীদের) পথ (মাসলাক/আমল) ব্যতীত অন্য পথ (মাসলাক/আমল) অনুসরণ করে, তাহলে যেদিকে সে ফিরে যায়, সেদিকে তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। (সূরা ঃ ৪- নিসা ঃ ১১৫)

* আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল- সকল সাহাবী সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁদেরকে দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে মনে করা বিধেয়। তাঁদের ভাল আলোচনা করা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি। شرح الفقه الاكبر গ্রন্থে আছে ঃ

১. عقائد الاسلام. ادريس كاندهلوى- ॥

www.iscalibrary.com

اعتقاد اهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما اثنى الله تعالى ورسوله عليهم - (صفحـ٢١/-٢٠)

অর্থাৎ, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল-সকল সাহাবীর পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং তাঁদের প্রশংসা করা, যেমন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

* সাহাবীদের প্রতি মহব্বত রাখা ওয়াজিব। তাঁদের সমালোচনা করা, দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা গোমরাহী এবং সম্পূর্ণ অমার্জনীয় অপরাধ। সাহাবীদের সমালোচনাকারীগণ ফাসেক ফাজের ও গোমরাহ্।

বি ঃ দ্র ঃ সাহাবীগণের সত্যের মাপকাঠি হওয়া এবং তাঁদের সমালোচনার উর্ধ্বে হওয়া প্রসঙ্গে ২য় খণ্ডে "সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাঃ তাদের আদালত ও সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ" শিরোনামে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে। দেখুন পৃঃ ৩৯৪।

রাসূল (সাঃ)-এর বিবি ও আওলাদগণের সম্বন্ধে আকীদা

* নবীর আহ্‌লে বায়ত ও নবী (সাঃ)-এর বিবিগণের প্রতি আযমত ও মহব্বত ঈমানের দাবী।

* সাইয়্যেদা হযরত ফাতেমা (রাঃ) জান্নাতের সমস্ত মহিলাদের সর্দার।

* হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর পর হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) এবং তাঁরপর হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মর্যাদা। তারপর অন্যান্য সকল আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত সমস্ত দুনিয়ার নারীদের চেয়ে মর্যাদাবান।

* অন্যান্য সাহাবীদের স্ত্রীদের ব্যাপারে তাদের মর্যাদা অনুসারে বিশ্বাস রাখতে হবে।[১]

কিয়ামতের আলামত সম্বন্ধে আকীদা

কুরআন ও হাদীছ দ্বারা জানা যায়, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে দুই প্রকারের আলামত প্রকাশ পাবে। (১) علامت صغرى বা ছোট আলামত (২) علامت كبرى বা বড় আলামত। বড় আলামতগুলি কিয়ামতের খুবই কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ হবে। এগুলোকে اشراط ساعت বা কিয়ামতের আলামত বলে। এসব আলামতকে সত্য-সঠিক জানা এবং তার উপর ঈমান রাখা জরুরী।

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত দেখে বোঝা যাবে কিয়ামত তথা দুনিয়ার ধ্বংস হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এই সব আলামতের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. কিয়ামতের ছোট আলামতগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হল আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব। এ জন্যেই পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে নবী (সাঃ)-এর লকব বা উপাধি ছিল نبى الساعة অর্থাৎ, কিয়ামতের নবী।

২. তারপর রাসূল (সাঃ)-এর অব্যবহিত পর মুরতাদ হওয়ার ফিতনা فتنہ ارتداد। যা নবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পর সংঘটিত হয়েছিল। অতপর কিয়ামতের বহু ছোট ছোট আলামত প্রকাম পাবে। তার মধ্যে রয়েছে ঃ

১. عقائد الاسلام. ادريس كاندهلوى- ॥

www.iscalibrary.com

৩. ইল্‌ম উঠে যাওয়া।
৪. যেনা ও মদ্যপান বেড়ে যাওয়া। এমনকি প্রকাশ্যে জনসম্মুখে অশ্লিল কাজ হতে থাকবে।
৫. নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া। এমনকি পঞ্চাশজন নারীর তত্ত্বাবধান কারী হবে একজন পুরুষ।
৬. লোকেরা ওয়াক্‌ফ ইত্যাদি খোদায়ী মালকে নিজের মালের মত মনে করে ভোগ করতে থাকবে।
৭. যাকাত দেয়াকে দন্ড স্বরূপ মনে করবে।
৮. আমানতের মালকে নিজের মাল মনে করে তাতে হস্তক্ষেপ করবে।
৯. পুরুষ স্ত্রীর তাবেদারী করবে।
১০. মায়ের নাফরমানী করবে।
১১. পিতাকে পর মনে করবে।
১২. বন্ধু-বান্ধবকে আপন মনে করবে।
১৩. খারাপ ও বদ লোকেরা রাজত্ব ও সরদারী করবে।
১৪. অযোগ্য লোকেরা বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে।
১৫. লোকেরা যুলুমের ভয়ে যালেমের তা'যীম সম্মান করবে।
১৬. নাচ, গান ও বাদ্য বাজনার প্রচলন খুব বেশী হবে।

ইত্যাদি। নিম্নোক্ত একটি হাদীছের মধ্যে এ বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ : اذا اتخذ الفئ دولا والامانة مغنما والزكوة مغرما وتعلم لغير الدين واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات فى المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن اخر هذه الامة اولها فانتقوا عند ذالك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وايات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع - (رواه الترمذى)

কুরআন ও হাদীছে কিয়ামতের কিছু বড় বড় আলামত বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোকে "আলামতে কুবরা" (علامت كبرى) বা বড় বড় আলামত বলা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

১. হযরত মাহ্‌দীর আবির্ভাব,
২. দাজ্জালের-আবির্ভাব,
৩. আকাশ থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দুনিয়াতে অবতরণ,
৪. ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব,
৫. দাব্বাতুল আর্‌দ-এর বহিঃপ্রকাশ,
৬. দাব্বাতুল আর্‌দের বহিঃপ্রকাশের কিছুকাল পর একটা ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হওয়া।

www.iscalibrary.com

৭. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়,
৮. তিনটা বিরাটাকারের ভূমিধস,
৯. আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া প্রকাশ পাওয়া ও
১০. ইয়ামান থেকে (বা এডেনের এক গুহা থেকে) একটা বিশেষ আগুন প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি।

হযরত মাহ্দীর আবির্ভাবের পর থেকে কিয়ামতের উপরোক্ত বড় বড় আলামত জাহির হওয়া শুরু হবে। নিম্নের হাদীছে বিষদভাবে সেগুলোই বর্ণনা করা হয়েছে-

قال حذيفة بن اسيد الغفارى اطلع النبى ﷺ علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون فقلنا نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان ، والدجال ، والدابة وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب واخر ذالك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم وفى رواية نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر وفى رواية فى العاشرة وريح تلقى الناس فى البحر . الحديث - رواه مسلم - (مشكوة)

হযরত মাহ্দী সম্বন্ধে আকীদা

কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশিত বড় বড় আলামতের মধ্য হতে প্রথম আলামত ইমাম মাহ্দী এর আত্মপ্রকাশ। কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত প্রকাশিত হওয়ার পর একটা সময় এমন আসবে, যখন কাফেরদের প্রভাব খুব বেশী হবে, চতুর্দিকে নাসারাদের রাজত্ব কায়েম হবে, খায়বারের নিকট পর্যন্ত নাসারাদের আমলদারী হবে। এমন সময় মুসলমানগণ তাদের বাদশা বানানোর জন্য হযরত মাহ্দীকে তালাশ করবেন এবং এক পর্যায়ে কিছু সংখ্যক নেক লোক মক্কায় বায়তুল্লাহ শরীফে তওয়াফরত অবস্থায় হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে তাঁকে চিনতে পারবেন এবং তার হাতে বায়'আত করে তাঁকে খলীফা নিযুক্ত করবেন। এ সময় তাঁর রয়স হবে ৪০ বৎসর। ঐ সময় একটি গায়েবী আওয়াজ আসবে যে,

هذا خليفة الله المهدى فاستمعوا واطيعوا -

অর্থাৎ, "ইনিই আল্লাহর খলীফা-মাহ্দী। তোমরা তার কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর।"[১]

মাহ্দী শব্দের শাব্দিক অর্থ হেদায়েতপ্রাপ্ত। এ অর্থের দিক থেকে সকল হক্কানী আলেম ও পরহেযগার মুসলমানকেও মাহ্দী বলা যেতে পারে। কিন্তু যে মাহ্দীর আগমনের

১. عقائد الاسلام. عبدالحق حقانى ॥

www.iscalibrary.com

কথা রাসূল (সাঃ) বলে গেছেন তিনি হবেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সেই হযরত মাহ্দীর নাম হবে মুহাম্মাদ। তাঁর পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। তিনি ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশোদ্ভূত অর্থাৎ, সাইয়্যেদ বংশীয় হবেন। নিম্নোক্ত হাদীছে এ বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছেঃ

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ : لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطئ اسمه اسمى رواه الترمذى وفى رواية ابى داود يواطئ اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابى يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ـ

(مشكوة)

মদীনা তাঁর জন্ম স্থান হবে। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস হিজরত করবেন। তাঁর দৈহিক গঠন ও আখলাক-চরিত্র রাসূল (সাঃ)-এর অনুরূপ হবে। তিনি নবী হবেন-না, তাঁর উপর ওহীও নাযিল হবে না। মক্কায় তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। ইরাক ও সিরিয়ার ওলী-আবদাল তাঁর হাতে বায়'আত হবেন। এবং কাবা ঘরের নীচে যে সম্পদ সঞ্চিত ও রক্ষিত আছে তিনি তা বের করে মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করবেন। তিনি মুসলমানদের খলীফা হবেন। প্রথমে শুধু আরবের এবং পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বের খলীফা হবেন। সারা দুনিয়ায় ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন। অবশ্য তার পূর্বে দুনিয়া অন্যায়-অবিচারে, যুলুম-নির্যাতনে পিষ্ট হতে থাকবে। মুহাম্মাদী শরী'আত অনুযায়ী তার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। তিনি আধিপত্য বিস্তারকারী নাসারাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করবেন এবং তাদের দখল থেকে শাম, কনষ্ট্যান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) প্রভৃতি অঞ্চল জয় করবেন। তাঁর যুগেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।

হযরত মাহ্দীর শাসনামলেই একদিন হযরত ঈসা (আঃ) ফজরের নামাযের সময় দামেস্কের এক মসজিদের পূর্ব দিকের মিনারার নিকট আসমান থেকে অবতরণ করবেন। এবং হযরত মাহ্দী (আঃ)-এর পিছনে মুক্তাদি হয়ে নামায আদায় করবেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পর তিনি ইন্তেকাল করবেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত শেষ যামানায় হযরত মাহ্দীর আগমনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং এর উপর বিশ্বাস রাখা জরূরী মনে করে। কারণ, হযরত মাহ্দীর আগমনের বিষয়টি মুতাওয়াতির হাদীছ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যদিও বা কিছু বিবরণ خبرواحد দ্বারা প্রমাণিত। হযরত মাহ্দীর আগমনের বার্তা সাহাবা ও তাবেয়ীন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল প্রান্তে, সকল যুগে, সর্বস্তরের উলামা, সুলাহা, আম-খাছ মুসলমান বর্ণনা করে আসছেন!

শায়খ জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহঃ) হযরত মাহ্দী সম্বন্ধে একটি কিতাব রচনা করেন-যাতে এ বিষয়ের সমস্ত হাদীছ ও সাহাবীদের মতামত একত্রিত করেছেন। সে কিতাবের নাম العرف الوردى فى اخبارالمهدى। আল্লামা সাফারিনী (রহঃ) شرح عقيدة سفاريه কিতাবের ২য় খণ্ডের ৬৭ নং পৃষ্ঠায় উক্ত কিতাবের সমস্ত হাদীছের সংক্ষিপ্ত সার এক

www.iscalibrary.com

বিশেষ ধারায় বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আলামত সম্বলিত একটি পুস্তিকা লিখেছেন যাতে তিনি দুইশতের মত আলামত উল্লেখ করেছেন।

মিথ্যা মাহ্দী দাবীদারদের প্রসঙ্গ ঃ

হাদীছে প্রতিশ্রুত মাহ্দী এর পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য সবিস্তারে বর্ণিত হওয়া সত্বেও যুগে যুগে অসংখ্য প্রতারক নিজেদেরকে মাহদী দাবী করেছে। কিন্তু হাদীছে বর্ণিত মাহ্দীর একটি আলামতও তাদের মাঝে পাওয়া যায়নি। কোন কোন দাবীদার সে আলামতগুলোর মনগড়া ও কাল্পনিক ব্যাখ্যা করে বাস্তব ও সত্য আলামত ত্যাগ করে কাল্পনিক আলামত নিজের মাঝে ফিট করে দেখিয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার! এ তো সে মাহ্দী নয় যার আলামত বার্তা হাদীছে এসেছে। কারণ, এরূপ মাহ্দী দাবীদারদের মাঝে হাদীছে বর্ণিত আলামত গুলির একটি আলামতও বিদ্যমান নেই; বরং তারা মনগড়া-কাল্পনিক আলামতের আধিকারী স্বঘোষিত মাহ্দী।

এরূপ কাল্পনিক ও মনগড়া আলামত দ্বারা মাহ্দী হওয়ার দাবী যারা করেছে, তাদের মধ্যে একজন হল মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী। সে শুধু মাহ্দী নয় ঈসা হওয়ার দাবীও করেছিল। অতপর নিজের মাঝে ঈসা ও মাহ্দী (আঃ) হওয়ার কোন একটি আলামতও দেখাতে না পেরে সে দাবী করে বসল আমি ঈসা এর (مماثل فی مشابه) মত-উপমা। কিন্তু তার এ দাবীটিও সত্য প্রমাণ করতে পারেনি।

যুগে যুগে এরূপ আরও অনেকে মাহ্দী হওয়ার দাবী করেছে কিন্তু হাদীছে বর্ণিত মাহ্দীর একটি আলামতও তাদের মাঝে পাওয়া যায়নি। যার ফলে তারাও ভণ্ড এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে তারাও বোকা ও বিভ্রান্ত।

দাজ্জাল সম্বন্ধে আকীদা

দাজ্জাল শব্দটি আরবী دجل থেকে উদ্ভুত, যার অর্থ ধোঁকা ও প্রতারণা। অতএব দাজ্জাল (دجال) শব্দের অর্থ প্রতারক, ধোঁকাবাজ। আল্লাহ তা'আলা শেষ যামানায় লোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য একজন লোককে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করবেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী তার এক চোখ কানা আর এক চোখ টেরা থাকবে, চুল কোঁকড়া ও লাল বর্ণের হবে। সে খাটো দেহের অধিকারী হবে। তার কপালে লেখা থাকবে ك ف ر অর্থাৎ, কাফের। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মু'মিনই সে লেখা পড়তে পারবে।

عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ : الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه اعور وانه يجئ معه بمثل الجنة والنار فالتی يقول انها الجنة هی النار وانی انذركم كما انذر به نوح قومه - (متفق عليه) وفی رواية منهما مكتوب بين عينيه ك ف ر - وفی رواية مسلم مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب - كذا فی المشكوة -

www.iscalibrary.com

সে ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত হবে। ইরাক ও শাম দেশের মাঝখানে তার আবির্ভাব ঘটবে। এক বর্ণনা অনুযায়ী খোরাসানে তার আবির্ভাব হবে।[১] প্রথমে সে নবুওয়াতের দাবী করবে। তারপর ইস্পাহানে যাবে, সেখানে ৭০ হাজার ইয়াহূদী তার অনুগামী হবে, তখন খোদায়ী দাবী করবে। লোকেরা চাইলে সে বৃষ্টি বর্ষণ করে দেখাবে, মৃতকে পর্যন্ত জীবিত করে দেখাবে। কৃত্রিম বেহেশ্‌ত দোযখ তার সঙ্গে থাকবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বেহেশ্‌ত হবে দোযখ আর তার দোযখ হবে বেহেশ্‌ত। সে আরও অনেক অলৌকিক কান্ড দেখাতে পারবে, যা দেখে কাঁচা ঈমানের লোকেরা তার দলভুক্ত হয়ে জাহান্নামী হয়ে যাবে। এক ভীষণ ফেৎনা ও এক ভীষণ পরীক্ষা হবে সেটা। দাজ্জাল একটা গাধার উপর সওয়ার হয়ে ঝড়ের বেগে সমগ্র ভূখন্ডে বিচরণ করবে এবং চল্লিশ দিনের মধ্যে মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতীত (এসব এলাকায় সে প্রবেশ করতে পারবে না, ফেরেশতাগণ এসব এলাকার পাহারায় থাকবে।) সব স্থানে ফেৎনা বিস্তার করবে।

হযরত মাহ্‌দীর সময় তার আবির্ভাব হবে। সে সময় হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং তাঁরই হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। আবির্ভাবের পর দাজ্জাল সর্বমোট ৪০ দিন দুনিয়াতে থাকবে।

হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে আকীদা

দাজ্জালের বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাসের চতুর্দিক ঘিরে ফেলবে এবং মুসলমানগণ আবদ্ধ হয়ে পড়বে। ইত্যবসরে একদিন ফজরের নামাযের একামত হওয়ার পর হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে ফেরেশতাদের উপর ভর করে অবতরণ করবেন। মুসলিম শরীফের এক হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী দামেস্কের এক মসজিদের পূর্ব দিকের মিনারার নিকট তিনি অবতরণ করবেন এবং হযরত মাহ্‌দী উক্ত নামাযের ইমামতি করবেন। হযরত ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আঃ) হাতে ছোট একটা বর্শা নিয়ে বের হবেন। তাঁকে দেখেই দাজ্জাল পালায়ন করতে আরম্ভ করবে। হযরত ঈসা (আঃ) তার পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং "বাবে লুদ"[২] নামক স্থানে গিয়ে তাকে নাগালে পেয়ে বর্শার আঘাতে তাকে বধ করবেন।

মুসলমানদের আকীদা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন, তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণও করেননি কিংবা ইয়াহূদীরা তাঁকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যাও করতে পারেনি। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ـ

১. মূলতঃ এই দুই বর্ণনার মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। অভ্যুত্থানের পর সে বিভিন্ন স্থানে গমন করবে, সম্ভবতঃ এ হিসেবে বিভিন্ন স্থানকে তার আবির্ভাবের স্থান বলা হয়ে থাকবে ॥

২. বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উত্তর দিকে একটি স্থানের নাম "বাবে লুদ" ॥

www.iscalibrary.com

অর্থাৎ, তারা তাঁকে হত্যাও করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি, কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তাঁর সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চিতই এ ব্যাপারে সন্দেহে ছিল, এ সম্পর্কে অনুমান ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী। (সূরাঃ ৪-নিছাঃ ১৫৭)

হযরত ঈসা (আঃ) আকাশে জীবিত আছেন। দাজ্জালের আবির্ভাবের পর তিনি দুনিয়াতে আগমন করবেন, বিবাহ করবেন, তার সন্তান হবে এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ৭ বৎসর রাজত্ব পরিচালনা করার পর ইন্তেকাল করবেন। আর এক বর্ণনায় পৃথীবিতে অবতরণের পর হযরত ঈসা (আঃ)-এর ৪০ বৎসর অবস্থান করার কথা জানা যায়। হতে পারে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশে তুলে নেয়ার পূর্বের ৩৩ বৎসর ও পরের ৭ বৎসর সহ মোট ৪০ বৎসরকেই এখানে একত্রে বলা হয়েছে। আর এক বর্ণনায় ৪৫ বৎসরের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁকে আমাদের নবী (সাঃ)-এর রওযা শরীফের পার্শ্বেই (রাসূল [সাঃ] এবং আবূ বকর ও ওমরের মাঝে) দাফন করা হবে। নিম্নোক্ত হাদীছে এ বর্ণনাই প্রদান করা হয়েছে।

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ : ينزل عيسى بن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى فى قبرى فاقوم انا وعيسى ابن مريم فى قبر واحد بين ابى بكر وعمر - رواه ابن الجوزى فى كتاب الوفاء -(مشكوة المصابيح)

হযরত ঈসা (আঃ) নবী হিসেবে আগমন করবেন না বরং তিনি আমাদের নবী (সাঃ)-এর উম্মত হিসেবে আগমন করবেন এবং এই শরী'আত অনুযায়ীই তিনি জীবন যাপন ও খেলাফত পরিচালনা করবেন। হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ

ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقطع الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد - (مسلم جـ١)

অর্থাৎ, ঈসা ইব্নে মারইয়াম একজন ইনসাফগার শাসক হিসেবে অবতরণ করবেন। অতঃপর তিনি ক্রুশ চিহ্নকে ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকরকে বিনাশ করবেন আর জিয্য়াকে রহিত করবেন। তখন সম্পদের এরূপ প্রবাহ ঘটবে যে, কেই তা গ্রহণ করার মত থাকবে না।

ইয়া'জূজ মা'জূজ সম্বন্ধে আকীদা

দাজ্জালের ফেৎনা ও তার মৃত্যুর পর আসবে ইয়া'জূজ ও মা'জূজের ফেৎনা। হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবৃতরণ ও দাজ্জালের ধ্বংস হওয়ার কিছুকাল পর হযরত মাহ্দীর ইন্তেকাল হবে। তখন হযরত ঈসা (আঃ) রাজত্ব পরিচালনা করতে থাকবেন। এরই মধ্যে এক সময় ইয়া'জূজ মা'জুজের আবির্ভাব হবে। ইয়া'জূজ মা'জূজ অত্যন্ত অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের সংখ্যা অনেক বেশী হবে। তারা দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে

www.iscalibrary.com

পড়বে এবং ভীষণ উৎপাত শুরু করবে, হত্যা এবং লুটতরাজ চালাতে থাকবে।[১] তখন হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা তূর পর্বতে আশ্রয় নিবেন। হযরত ঈসা (আঃ) ও মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করবেন। আল্লাহ তা'আলা মহামারীর আকারে রোগ-ব্যাধি প্রেরণ করবেন। বর্ণিত আছে-সেই রোগের ফলে তাদের গর্দানে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি হবে, ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ইয়া'জূজ মা'জূজের গোষ্ঠী সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তাদের অসংখ্য মৃত দেহের দূর্গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তখন হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের দুআয় আল্লাহ তা'আলা এক ধরনের বিরাটকায় পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় উটের ঘাড়ের মত। তারা মৃতদেহগুলো উঠিয়ে নিয়ে সাগরে বা যেখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ফেলে দিবে। তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আকাশের এক ধরনের ধোঁয়া সম্বন্ধে আকীদা

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর কয়েকজন নেককার লোক ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজত্ব পরিচালনা করবেন। তারপর ক্রমান্বয়ে ধর্মের কথা কমে যাবে এবং চতুর্দিকে বে-দ্বীনী শুরু হবে। এ সময় আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া আসবে, যার ফলে মু'মিন মুসলমানের সর্দির মত ভাব হবে এবং কাফেররা বেহুশ হয়ে যাবে। ৪০ দিন পর ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে। কুরআন শরীফে এই ধোঁয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে ঃ

فارتقب يوم تاتى السماء بدخان مبين -

অর্থাৎ, অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে। (সূরাঃ ৪৪-দুখানঃ ১০)

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের আকীদা

তার কিছু দিন পর একদিন হটাৎ একটি রাত তিন রাতের পরিমাণ লম্বা হবে। মানুষ ঘুমাতে ঘুমাতে ত্যক্ত হয়ে যাবে। গবাদি পশু বাইরে যাওয়ার জন্য চিৎকার শুরু করবে। শিশুরাও চিৎকার শুরু করবে। মুসাফিরগণ ভয়াবহ কি ঘটতে যাচ্ছে ভেবে ঘাবড়ে যাবে।

১.তাদের সত্যিকার পরিচয় কি এবং বর্তমানে কোন দেশের কোথায় কিভাবে তারা অবস্থান করে তাদের বর্তমান পরিচয় কি -তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীগণ মাওলানা হেফজুর রহমান সিওহারবী রচিত "কাছাছুল কোরআন" পাঠ করতে পারেন। সংক্ষেপে এ সম্পর্কে অনেকগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত রয়েছে, যেমন (১) তারা এক বিঘত লম্বা আকৃতির এক অদ্ভুত মাখ্‌লূক। (২) তারা আদম ও হাওয়া উভয়ের বংশধর নয় বরং তারা শুধু হযরত আদম থেকে। তাই তারা হল এক ধরনের বরযখী সৃষ্টি (برزخى مخلوق)। (৩) তারা এমন এক অদ্ভুত প্রাণী, যাদের এক কান হয় উড়না আর এক কান হয় বিছানা। হযরত মাওলানা হেফজুর রহমান সাহেব বলেন ইত্যাদি অনেকগুলো মত দেখা যায়। এগুলো সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত, যা ভিত্তিহীন। মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের মতে ইয়া'জূজ ও মা'জূজ হল মঙ্গোলিয়ান তাতারীদের একটি জঙ্গলী গোত্র। মা'জূজ (ماجوج)-এর মূল নাম ছিল মগ (موگ), তা থেকে হয়েছে মেগাগ (ميگاگ), তা থেকে হয়েছে মা'জূজ (ماجوج)। আর ইয়া'জূজ (ياجوج)-এর মূল নাম ছিল ইউওয়াচী (يواچى), সেখান থেকে হয়েছে ইউয়াজী (يواژى), সেখান থেকে হয়েছে ইউগাগ (يوگاگ), সেখান থেকে হয়েছে ইয়া'জূজ (ياجوج) ॥

www.iscalibrary.com

তারপর সূর্য গ্রহণের সময়ের মত সামান্য আলো নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য মধ্য আকাশ পর্যন্ত এসে আবার আল্লাহর হুকুমে পশ্চিম দিকে গিয়েই অস্ত যাবে। তারপর আবার যথারীতি পূর্বের নিয়মে পূর্বদিক থেকে উদয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে থাকবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় কিয়ামতের বড় বড় আলামত সমূহের একটি অন্যতম আলামত। কুরআন শরীফে এই আলামত সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

هل ينظرون الا ان تاتيهم الملئكة او ياتى ربک او ياتى بعض ايات ربک

অর্থাৎ, তারা কি শুধু এরই অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট আসবে ফেরেশতা কিংবা আসবেন তোমার প্রতিপালক, অথবা আসবে তোমার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের একটি। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ১৫৮)

বোখারী মুসলিমসহ অন্য আরও কিতাবের সহীহ হাদীছ সমূহে উল্লেখিত হয়েছে যে, এখানে بعض ايات ربک (তোমার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের একটি) দ্বারা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়কে বোঝানো হয়েছে।

সহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর কোন কাফেরের ঈমান আনয়ন ও কোন ফাসেকের তওবা কবূল হবেনা। কুরআন শরীফেও এ বক্তব্য রয়েছে ঃ

يوم ياتى بعض ايات ربک لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت فى ايمانها خيرا ـ

অর্থাৎ, যেদিন আসবে "তোমার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের একটি" সেদিন ইতিপূর্বে যে ঈমান আনেনি বা ঈমান অবস্থায় কোন ভাল কাজ করেনি তার ঈমান তার কোন উপকারে আসবেনা। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ১৫৮) হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وعن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ : ثلث اذا خرجن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت فى ايمانها خيرا ـ طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض ـ رواه مسلم ـ (مشكوة المصابيح)

অর্থাৎ, তিনটি জিনিস যখন প্রকাশ পাবে, তখন ইতিপূর্বে যে ঈমান আনেনি বা ঈমান অবস্থায় কোন ভাল কাজ করেনি তার ঈমান তার কোন উপকারে আসবেনা। সে তিনটি জিনিস হল ঃ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, দাজ্জাল ও দাব্বাতুল আর্দ-এর আত্মপ্রকাশ।

দাব্বাতুল আর্দ সম্বন্ধে আকীদা

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের দিন বা একদিন পর[১] মক্কা শরীফের সাফা পাহাড় ফেটে অদ্ভুত আকৃতির এক জন্তু বের হবে। একে বলা হয় দাব্বাতুল আর্দ (ভূমির জন্তু)[২] এ প্রাণীটি মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। সে অতি দ্রুত বেগে সারা পৃথিবী ঘুরে আসবে। সে মু'মিনদের কপালে একটি নূরানী রেখা টেনে দিবে, ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে

১. عقائد الاسلام. ادريس كاندهلوى ـ ॥ ২. সাধারণ প্রজনন পদ্ধতির ব্যতিক্রম ভূমি থেকে এর জন্ম হওয়ার কারণে এরূপ নামকরণ হয়ে থাকবে ॥

www.iscalibrary.com

এবং বেঈমানদের নাকের অথবা গর্দানের উপর সীল মেরে দিবে, ফলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। সে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফেরকে চিনতে পারবে। এ জন্তুর আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত সমূহের অন্যতম। উপরোক্ত বর্ণনা ব্যতীত দাব্বাতুল আর্দের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ইবনে কাছীরে আরও বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআন শরীফে দাব্বাতুল আর্দের বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ

واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بايتنا لا يوقنون -

অর্থাৎ, যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে, তখন আমি ভূমি থেকে বের করব এক জীব; যা তাদের সাথে কথা বলবে এ জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে না। (সূরাঃ ২৭-নাম্‌লঃ ৮২)

হাদীছে দাব্বাতুল আর্দের বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে এসেছে ঃ

عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ : ثلث اذا خرجن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل اوكسبت فى ايمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض - رواه مسلم - (مشكوة المصابيح)

অর্থাৎ, তিনটি জিনিস যখন প্রকাশ পাবে, তখন ইতিপূর্বে যে ঈমান আনেনি বা ঈমান অবস্থায় কোন ভাল কাজ করেনি তার ঈমান তার কোন উপকারে আসবেনা। সে তিনটি জিনিস হল ঃ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, দাজ্জাল ও দাব্বাতুল আর্দ-এর আত্মপ্রকাশ।

এক ধরনের আগুনের বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে আকীদা

কিয়ামতের আলামত সমুহের মধ্যে সর্বশেষ আলামত হল মধ্য ইয়ামান থেকে একটা আগুন বের হবে। যার আলোতে শাম দেশ পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে। এই আগুন মানুষকে বেষ্টন করে হাশরের ময়দানের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে, অর্থাৎ, শাম দেশের দিকে নিয়ে যাবে। দিবা রাত্র কখনই এ আগুন মানুষ থেকে পৃথক হবে না। মুসলিম শরীফে হযরত হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে - রাসূল (সাঃ) কিয়ামতের দশটি আলামত বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে সর্বশেষ আলামত হল এটি। তিনি বলেন ঃ

نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم - وفى رواية نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر رواه مسلم - كذا فى المشكوة -

অর্থাৎ, একটা আগুন বের হবে ইয়ামান থেকে, যা মানুষকে তাদের হাশরের ময়দানের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে- এডেনের এক গুহা থেকে যে আগুন বের হয়ে লোকদেরকে ময়দানে হাশরের দিকে পরিচালিত করবে।